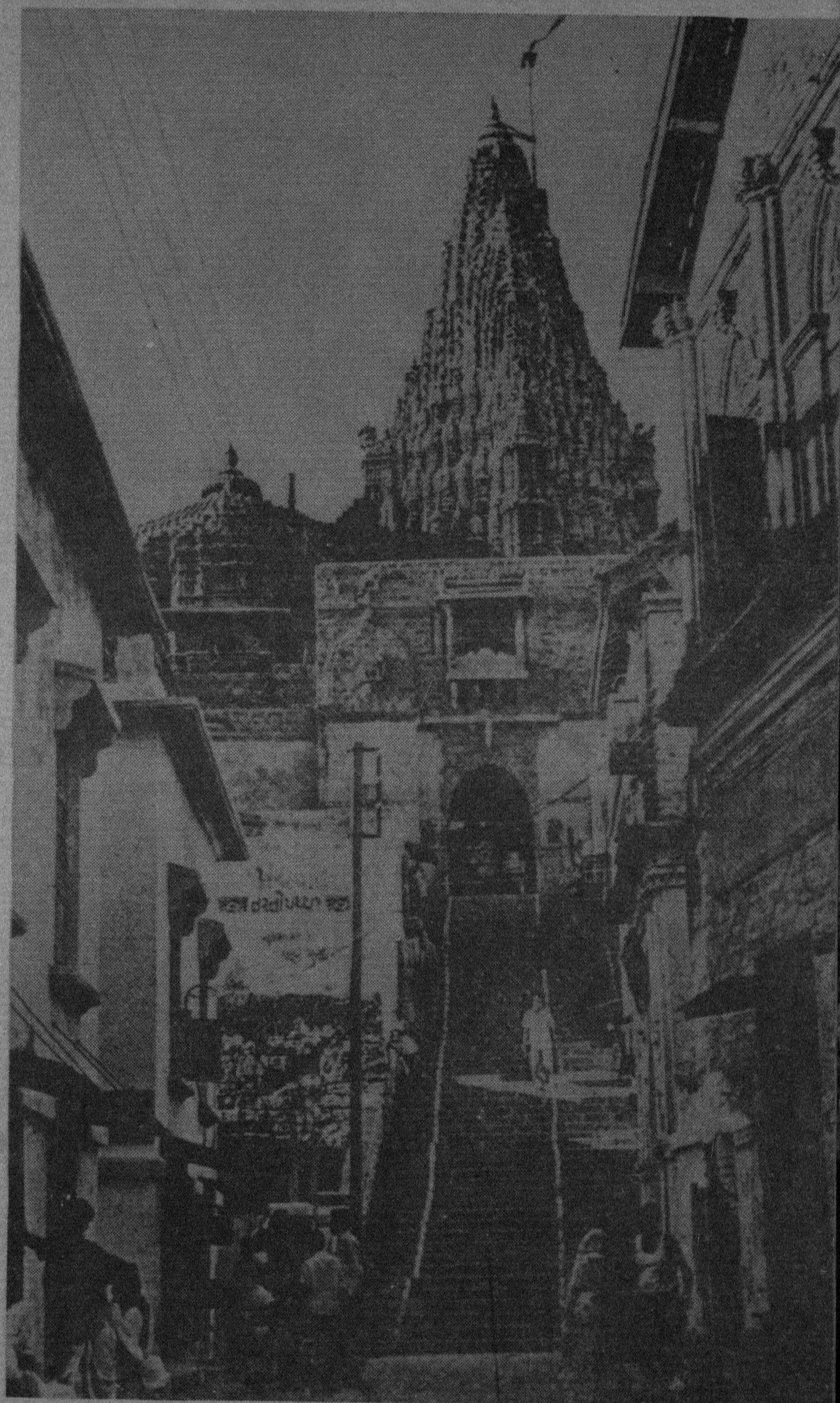
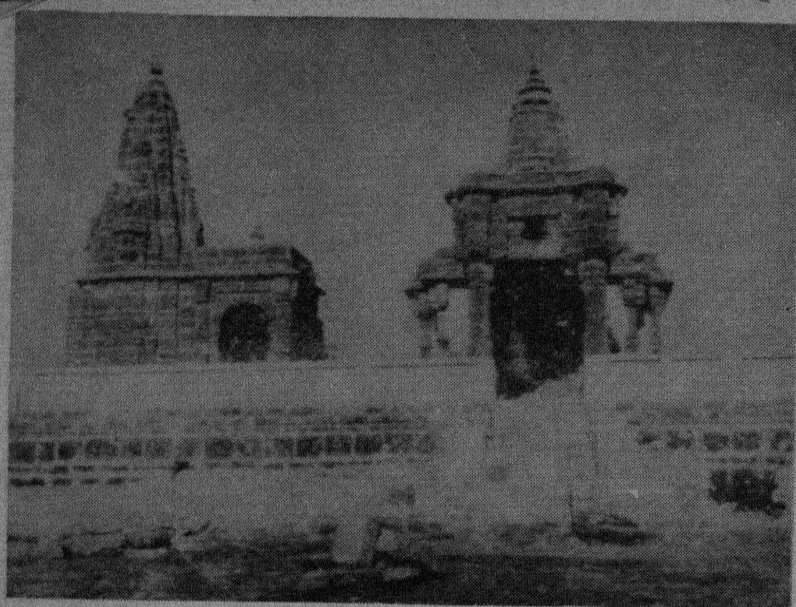
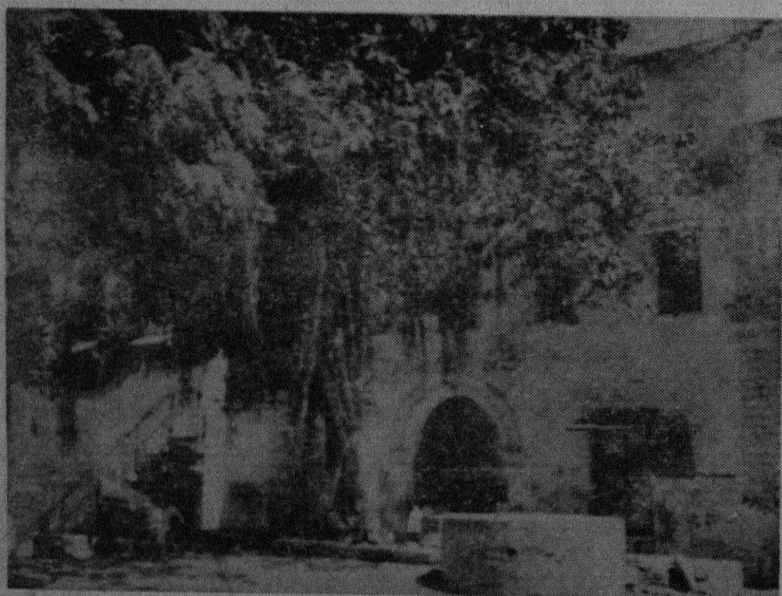




(উপরে) রুক্মিণীর মন্দির, দ্বারকা (নিচে) বেট দ্বারকার মন্দির



সোমনাথের প্রাচীন মন্দিরের ভিতর ও বাহির (সোমনাথ ট্রাস্টের সৌজ



সৌরাষ্ট্র পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Saurashtra Parva
(*A Bengali Travelogue*)
By Subodh Kumar Chakravarty.

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা

মুদ্রাকর
প্রিণ্ট-ও-গ্রাফ
৯-বি ভবানী দত্ত লেন
কলকাতা-৭৩

প্রতিদিন পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে সব কিছুর। আজ যা দেখে এলাম, কাল অন্য রকম দেখছি। আজকের কথা কাল পুরনো হয়ে যাচ্ছে। নতুন রেলপথ বসছে, নতুন রাজপথ তৈরি হচ্ছে, যানবাহন ও বাসস্থানেরও উন্নতি হচ্ছে অভাবনীয়। কিন্তু দর্শনীয় স্থানের ও বক্তব্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় নি। তথাপি এই গ্রন্থে বর্ণিত অঞ্চলগুলি একাধিকবার ভ্রমণ করে যথাসম্ভব আধুনিক উপকরণ পরিবেশনের যে চেষ্টা করেছি, সুধী পাঠক তা অনুমান করতে পারবেন।

রম্যাণি
বি. এফ. ৭৭ সল্টলেক সিটি,
কলিকাতা-৭০০০৬৪

গ্রন্থকার

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্
বী৺দং জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ
কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিমু নূ মনিষ্যে ॥
—ঋগ্বেদ, ৬।৯।৬

My ears open to hear, my eyes to see
This light within my spirit that shines beyond ;
My mind roams with its thoughts in the distance ;
What shall I speak, and what, verily, shall I think ?
—Rigveda, VI, 9-6.

উৎসর্গ

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

মনে হয় আকাশের শেষ আছে, কিন্তু সমুদ্রের নেই। মাথার উপরে যে আকাশের কূল দেখি না কোন দিকে, সমুদ্রের উপর তার অন্য রূপ দেখি। ধীরে ধীরে নেমে এসে সমুদ্রের জলে মিলে গেছে। সমুদ্র তার পরেও আছে, আরও একটু ফুলে আছে, আরও একটু গম্ভীর গর্বিত ভাবে। কিন্তু সেখানে তার ঢেউ দেখতে পাই নে, সেখানে নেই পারের মতো তরঙ্গভঙ্গ, নেই জলোচ্ছ্বাস আর গর্জন।

চলন্ত গাড়ির ভিতর স্বাতি কথা কইছে ফিস ফিস করে। বলল : গোপালদা, এমনি এক সমুদ্রের ধারে আমি সেই মন্দির দেখলাম। আধখানা মন্দির। ওপরের দিকটা যেন নেই, যেন কোন কালে ছিল না। তবু কী অপূর্ব! দুরন্ত সমুদ্র এসে পারের ওপর আছড়ে পড়ছে, ধুয়ে দিচ্ছে মন্দিরের অঙ্গন। ভিজে বারুদের মতো সমস্ত গর্জন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে, থাকছে শুধু দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ আর সাদা ফেনা। এ কোন্ মন্দির গোপালদা?

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলুম : সোমনাথের মন্দির।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল : কিন্তু আধখানা মন্দির কেন দেখলাম?

কেন জানি না, সোমনাথের নামে আমারও চোখের সামনে আধখানা মন্দির জেগে ওঠে। আজ না হয় সোমনাথের নতুন মন্দির এখনও অসম্পূর্ণ, কিন্তু স্বাতি কেন স্বপ্নে তা দেখবে! কেন সম্পূর্ণ দেখবে না সোমনাথকে? তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। বললুম : কটা লোক সোমনাথের সম্পূর্ণ মন্দির দেখেছে স্বাতি! প্রভাসপত্তনের মাটিতে বুঝি অভিশাপ আছে। মন্দির এখানে ভেঙে

পড়ে, ভেঙে যায়। মন্দির রক্ষা করতে জানে না প্রভাসের মানুষ, পারে না রক্ষা করতে। এক শতাব্দীর গৌরব ভেঙে পড়ে আর এক শতাব্দীতে। আমরা নতুন করে আবার মন্দির গড়ছি।

বাহিরের অন্ধকার আমরা দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ির ভিতর নীল বাতি জ্বলছে মিটমিট করে। মামা মামী অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। কাঠের দেওয়ালে হেলান দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। স্বাতি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এক হাতে শক্ত করে ধরেছে বাঙ্কের একটা কোণা। ট্রেনের শব্দ হচ্ছে একটানা। সেই শব্দের ভিতর আমাদের কণ্ঠস্বর ডুবে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক ভাবে স্বাতি বলল : বাবা-মাকে কেন দেখতে পেলাম না গোপালদা? দেখলাম শুধু তোমাকে!

এ কথার উত্তরে আমি হাসলুম।

হাসি নয় গোপালদা : স্বাতি আপত্তি জানাল : সত্যিই তাই দেখলাম। আর তোমাকেও ঠিক চেনা যাচ্ছে না। বাবার মতো বুড়ো দেখলাম তোমাকে।

হেসে বললুম : হয়তো মামাবাবুকেই দেখেছ।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না। যেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে, হয়তো শুনতেই পায় নি। আমি আমার ঘড়ি দেখলুম, ছটা বাজতে আর দেরি নেই। রাজকোটে আমাদের গাড়ি বদলাতে হবে। তার আর সময় কোথায়!

আমি একখানা জানলা খুলে দিলুম। বাহিরের অন্ধকার যেন লাফিয়ে এল ভিতরে। ঘন কালো গভীর অন্ধকার। আর কিছু দেখবার উপায় নেই।

জানালা খোলার শব্দে স্বাতির ধ্যান ভাঙল। বলল : এখনও সকাল হয় নি! ছটা বাজতে আর কত বাকি?

বললুম : কিন্তু সকাল হতে এখনও দেরি আছে। আমরা যে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, এই তার প্রথম প্রমাণ।

সকাল বেলায় মামা আমাদের ডেকে দেবেন, এই কথা ছিল।

তিনি নিজেই এ ভার নিয়েছিলেন। বলেছিলেন: তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। দায় যখন আমার, তখন আমিই তোমাদের ডেকে দেব।

এ তাঁর রাগের কথা। কিন্তু রাগটা যে সঙ্গত কারণে, মনে মনে আমি তা স্বীকার করেছিলুম। পর পর অনেকগুলো দুঃসংবাদ পেয়ে মেজাজ তাঁর বিগড়ে গিয়েছিল।

বাসে আবু পাহাড় উঠতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে, নামতে কিছু কম। মোটরে সময় আরও কিছু সংক্ষেপ করা সম্ভব। দিল্লী থেকে মেল আসে বিকাল পৌনে চারটেয়। কুড়ি মিনিট দাঁড়ালে কী হবে, মামার মতে গাড়িতে উঠবার জন্য এ সময় যথেষ্ট নয়। এটা তাঁর সাময়িক মত। গাড়িতে বসে এ মতের কথা বেমালুম ভুলে যান। কোন স্টেশনে দু মিনিট দাঁড়ালেই তখন বিরক্ত হন। স্বাতি তাঁর কাণ্ড দেখে হাসে, কিন্তু আমি হাসতে পারি নে। আমার অন্য কথা মনে হয়। কত স্বার্থপর আমরা। অন্যের প্রয়োজনের কথা আমরা কত সহজে ভুলি। পরের প্রয়োজনে কত নির্বিকার আমরা। যখন বিদেশী ছিল দেশের রাজা, তখন এই মনোবৃত্তি স্বাভাবিক ছিল। এখন দৃষ্টিকটু লাগে। প্রয়োজন কি শুধু আবু পাহাড়ের শৌখিন মানুষেরই! আশেপাশের গ্রামের লোকের সে প্রয়োজন নেই! মেল দাঁড়াবে না, এক্সপ্রেস দাঁড়াবে না। দূর দূর দেশ থেকে পায়ে হেঁটে এসে তারা প্যাসেঞ্জার ধরবে। দু মিনিটের বেশি সে ট্রেনও দাঁড়াবে না। জানোয়ারের মতো কোলে আর পিঠে গাদাগাদি হয়ে তারা যাবে। মেল-এক্সপ্রেসে চড়বার অবাধ অধিকার তাদের নেই। আবু রোডের বিশ মিনিটকে দশটা স্টেশনে ভাগ করে দেওয়া যায় না। সেখানেই আরও কিছু সময় দিলে কর্তৃপক্ষকে মামা ধন্যবাদ দিতেন।

পাহাড় থেকে নামবার সময় মামা বলেছিলেন: বাসে করে যারা নামছে, তাদের অবস্থা ভাব। সাড়ে তিনটেয় বাস পৌঁছবে আবু রোড স্টেশনে। এক মাথায় ট্রেন দাঁড়াবে, আর ক্লোকরুম হল

আর এক মাথায়। বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাল খালাস করা, তারপর বয়ে এনে গাড়িতে ওঠা—এ কখনও সম্ভব!

এ সব ভাবনা তাঁর নয়। আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবু মন্তব্য করবেন। কিন্তু উত্তরটা আমাকে দিতে হল না। মামী বললেন: তোমাদের মতো তাড়াহুড়োও কেউ করে না। এক জায়গায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই বলবে, চল।

সত্যি কথা। পয়সা খরচ করে যারা আবু পাহাড়ে আসবে, তারা তাদের মালপত্র স্টেশনের ক্লোকরূমে জমা করে উপরে উঠবে না। দু দশ দিন থাকতে এসেছে তারা। মালপত্র নিয়ে গিয়ে আশ মিটিয়ে তারা পাহাড় দেখবে।

প্রথম দুঃসংবাদ মামাকে আমিই দিয়েছিলুম। টিকিট কালেক্টরের অফিস থেকে খবর আনলুম যে দিল্লী আমাদের একখানা বার্থের ব্যবস্থা করেছে। চারখানা বার্থ চাইলে একখানা কম্পার্টমেণ্ট পাওয়া যাবে, এই আশায় জয়পুরে মামা চারখানা বার্থ চেয়েছিলেন জমিনগর কোচে। মেসানা থেকে দ্বারকার দিকে কোনও থ্রু গাড়ি যায় না, এ তাঁর পুরনো অভিযোগ। শোনা গেছে যে মেসানায় যখন দিল্লী-আমেদাবাদ মেল আসে, তার উল্টো দিকে একখানা বিরাট ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে। নাম তার কীর্তি এক্সপ্রেস। মহাত্মাজীর জন্মস্থান পোরবন্দর যায় সরাসরি। কিন্তু তার চারটে ভাগ। এক ভাগ ভাবনগর যাবে সুরেন্দ্রনগর জংসন থেকে, এক ভাগ ভেরাবল যাবে জেতলসর থেকে, বাকিটা পোরবন্দর। ওখার জন্য চতুর্থ ভাগ আছে—একখানা আপার ক্লাস জামনগর পর্যন্ত, আর একখানা থার্ড ক্লাস ওখা পর্যন্ত। আমাদের ভাগে কিছুই নেই, এই তাঁর রাগের কারণ। শেষ পর্যন্ত স্থির করা গেল, দিল্লী-জামনগর কোচে জামনগর পর্যন্ত যাব। তারপর সুবিধা মতো গাড়ি বদল করা যাবে জামনগরে। একই ট্রেনের এক গাড়ি থেকে আর এক গাড়ি, যে গাড়িখানা কেটে যাবে সেখানা থেকে কাটবে না এমন গাড়িতে। কিন্তু মামা ক্ষেপে

উঠে বললেন : কিন্তু এ কেমন ব্যবস্থা বল! এত বড় তীর্থস্থান হল দ্বারকা, সেখানে যাবারই এত অসুবিধে! আর সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই!

টিকিট কালেক্টর আমাকে দিল্লীর আশ্বাস শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আর তিনখানা বার্থের জন্যও তাঁরা চেষ্টা করবেন।

গাড়ি এলে দেখা গেল যে তুখানার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তুখানাই উপরে। নিচে যে তুজন ভদ্রলোক বিছানা বিছিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন, তাঁরা রাজকর্মচারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চলেছেন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী রাজকোটে সরকারী সফরে। এঁরা তাঁরই সঙ্গী। পাশের কামরায় মন্ত্রী মহাশয় একা যাচ্ছেন। শারীরিক ও মানসিক কারণে উড়োজাহাজে তিনি উড়তে চান নি। কাজেই জনসাধারণকে তার ফল ভুগতে হবে।

আমাদেব কী গতি হল, টিকিট কালেক্টর তা দেখতে এসেছিলেন। নিজেই দেখতে পেলেন যে ব্যবস্থা কিছুই হয় নি। কেননা, রাজকর্মচারীরা বয়সে নবীন হলেও নিচের বার্থ তুখানা ছেড়ে দেবার আশ্বাস দেন নি। বরং আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নিলেই যে খুশী হন, তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। টিকিট কালেক্টর বললেন : তাহলে আর তুখানা বার্থের জন্য মেসানায় 'তার' করে দিই?

মামা রুখে উঠে বললেন : তুখানা নয়, চারখানা এক গাড়িতে। আমরা এক সঙ্গে যাব।

মনে মনে আমি ভেবেছিলুম, তুখানা বার্থ পেলেও চলবে। এই তুই ভদ্রলোককে সেখানে ঠেলে দেওয়া যাবে। কিন্তু পরে দেখলুম, সে তুরাশা। তাঁরা মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গী, তাঁর পাশের গাড়িতে নাকি তাঁদের যেতেই হবে।

মেসানায় পৌঁছে দ্বিতীয় দফায় মামার মেজাজ বেগড়াল। রাত তখন বেশি হয় নি, সন্ধ্যেই বলা উচিত। মাত্র পৌনে সাতটা। কীর্তি এক্সপ্রেস পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চ জ্বেলে তার রিজার্ভেসনের

কার্ডগুলি দেখে নিলুম। মামার নামে দুখানা বার্থ, এক ক্যাপ্টেন শাহর বাকি দুখানা। জামনগর কোচের হাতল ধরে মামা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই সংবাদ দিতেই ফেটে পড়লেন, বললেন : সোজা কথাও কি লক্ষ্মীছাড়ারা বুঝতে পারে না ?

হয়তো পারে, কিন্তু উপায় ছিল না। বললুম : দেখি কী ব্যবস্থা করতে পারি।

মামা বললেন : তুমি কী ব্যবস্থা করবে ?

মামী বললেন : ব্যবস্থা না করলেই বা কী করে যাওয়া যায় বল।

যাওয়া কোন রকমে যায়। মামা মামী যেতে পারেন ক্যাপ্টেন শাহর সঙ্গে। মিসেস শাহকে একখানি নিচের বার্থ দিতে হলে মামাকে উপরে উঠতে হবে। তাতে মামার আপত্তি। মামীর আপত্তি স্বাতিকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিতে। রক্তের সম্বন্ধ নেই যে মামার সঙ্গে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে বেশি মাখামাখিটা তত ভাল নয়। লোকেই বা কী বলবে! কাজেই একটা সুব্যবস্থা করতেই হবে।

আমি আর দেরি করলুম না। ট্রেনের কণ্ডাক্টরকে খুঁজে বার করলুম। ভদ্রলোক আমাদের বিপদের কথা জানেন, সাহায্যেরও চেষ্টা করছিলেন। বললুম : এক দিকে মন্ত্রী, আর এক দিকে সেনাপতি। সাধারণ প্রজার কী ব্যবস্থা হবে বলুন!

ভদ্রলোক বললেন : সেই কথাই তো ভাবছি।

বললুম : দিন না মন্ত্রীর সঙ্গে সেনাপতিকে তুলে।

সেনাপতিকে ভয় পান বুঝি!

বলে হাসতে হাসতে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন : আমিই ক্যাপ্টেন শাহ। আপনার ব্যবস্থা আমি সানন্দে মেনে নিলুম।

বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমি একটু চমকে গিয়েছিলুম। তারপরেই হেসে করমর্দন করলুম।

সহাস্যে ভদ্রলোক বললেন : আপনাদেরই উপকার করলুম না, নিজেরও উপকার হল।

তাই কি!

ভদ্রলোক বললেন : আমরা জামনগরেই যাচ্ছি। ও গাড়িতে জায়গা পেলে শেষ রাতে রাজকোটে আমাদের গাড়ি বদল করতে হবে না।

বলে হাসতে লাগলেন।

ধন্যবাদ দিয়ে আমি চলে আসছিলুম। ভদ্রলোক একটা অনুরোধ করলেন, বললেন : জামনগরে এলে আমাদের অতিথি হতে হবে কিন্তু, কথা দিন।

কথা দিলুম। কিন্তু তাড়াতাড়িতে তাঁর ঠিক না নেওয়া হল না।

এক ট্রেন থেকে অন্য ট্রেন, এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়ি। মালপত্র নিয়ে আমরা নূতন গাড়িতে এলুম। একজন টিকিট কালেক্টর রিজার্ভেসনের কার্ডখানা বদলে দিতে এসেছিলেন। মামার ধমক খেয়ে ভদ্রলোক পালিয়ে বাঁচলেন। পরে তাড়া দেবার কারণ আমাদের বলেছিলেন : ঐ কাপ্তানের নামটা থাকলে রাস্তার লোকে জ্বালাতন কম করবে।

কিন্তু পরে তিনি নিজের ভুল বুঝেছিলেন। দেশের লোক জ্বালাতন করতে ভয় পায় না। দুবার তাঁকে উঠে বসতে হয়েছিল। একবার ভিরমগমে, আর একবার সুরেন্দ্রনগরে। দুটিই বড় জংসন। বম্বে থেকে বড় লাইনের সব ট্রেন ভিরমগমে আসে। ভবিষ্যতে কচ্ছের গান্ধীধাম পর্যন্ত যাবে। পরে ভিরমগমের ছোট লাইন। সুরেন্দ্রনগর এই ছোট লাইনের চৌরাস্তা। দ্বারকায় যাবে, পোরবন্দরে যাবে, সোমনাথে যাবে, যাও পশ্চিমে রাজকোটের। দিকে ভাবনগরে যাবে, পলিতানায় যাবে, যাও দক্ষিণে বোটাডের পথে। দিল্লী আর বম্বের জন্য যাও উত্তর-পূর্বে ভিরমগমে। উত্তর-পশ্চিমে এক অখ্যাত জায়গা হালভড।

মেসানার ওয়েটিং রুমে স্নান সেরে আর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে খেয়ে মামার মেজাজ যেটুকু প্রসন্ন হয়েছিল, ভিরমগমে পৌঁছেই তা নষ্ট হল। ট্রেন সোয়া আটটার পর ছেড়ে পৌনে এগারটায় সেখানে পৌঁছয়। খড়খড়ি এঁটে শোয়া হয়েছিল। তাই যাত্রীরা বাহির থেকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলল। কিন্তু মামার হুঙ্কার ছাপিয়ে গেল বাহিরের কোলাহল ও ধাকাধাকি। সুরেন্দ্রনগরেও ঠিক এমনি হল। গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাত একটা থেকে প্রায় পৌনে ছটো পর্যন্ত। মামা দরজা খোলেন নি, খুলেছেন মুখ। ইংরেজী ও বাঙলায় কোন গাল বাকি রাখেন নি। শেষ পর্যন্ত 'অসভ্য বর্বর দেশ' বলে ক্লান্ত শরীরে শুয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে নাক ডাকাচ্ছেন। ঘুম না ভাঙালে আমাদের জাগাবার কথা তাঁর মনে পড়বে না।

জানলা দিয়ে হাওয়া আসছিল অল্প অল্প। সেই শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতেই স্বাতি হেসে ফেলল।

বললুম: হাসলে যে!

বল তো কেন হাসলাম?

বেশ প্রশ্ন! তুমি কেন হাসলে তা আমি জানব কী করে!

স্বাতি একবার মামার দিকে একবার মামীর দিকে চেয়ে বলল: কাল বড় ভাবনায় পড়েছিলেন।

এর বেশি আর কিছু সে বলল না।

মনে হল, বাহিরের অন্ধকার ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হচ্ছে। ভিতরের অন্ধকারও এক সময় স্বচ্ছ হবে।

স্বাতি একবার চারি দিক দেখে নিয়ে বলল: তোমায় যখন ডেকে তুললাম, তুমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলে, তাই না গোপালদা?

খুব নয়, একটুখানি।

স্বাতি বলল: স্বপ্নের কথা আমি ভুলে যাই, সকাল বেলায় আর আমার মনে পড়ে না। তাইতেই তোমায় ডেকে তুললাম।

আমি আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারলুম না। বললুম : কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন!

স্বাতি বোধহয় লজ্জা পেল, বলল : তুমি ভুল বুঝবে তাই। অন্তত ভুল বুঝবার সুযোগ যে নেবে তাতে সন্দেহ নেই।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

বেশ।

বলে স্বাতি আবার বাঙ্কের উপর উঠে গেল।

আমি ঘড়ির দিকে আর একবার চেয়ে দেখলুম, একটু পরেই ছটা বাজবে। আর ঠিক ছটায় আমাদের ট্রেন পৌঁছবে রাজকোটে। দ্বারকার গাড়ি তার দশ মিনিট আগে আসবার কথা। সে গাড়ি ছটা কুড়ি মিনিটে ছাড়বে। কাজেই নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। মামাকে আমিই জাগিয়ে দিলুম।

২

সকাল ছটার কিছু পরেই রাজকোটে পৌঁছান গেল। অন্ধকার নেই। স্নিগ্ধ আলোয় চারি দিক ঝকঝক করছে। ওভারব্রিজের উপর দিয়ে অন্য প্ল্যাটফর্মে এসে দ্বারকার গাড়ি পাওয়া গেল। সে গাড়ি ভাবনগর থেকে এসে এখানে খালি হয়ে গেছে। প্রচুর জায়গা। প্রসন্ন মনে মামা নতুন গাড়িতে উঠলেন।

এইবারে তাহলে চায়ের চেষ্টা দেখি। বলে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মামা বললেন: বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার নেই গোপাল। সামনেই তো চায়ের স্টল দেখতে পাচ্ছি, ওখান থেকেই ব্যবস্থা কর।

বেশি খোঁজাখুঁজির পিছনে তাঁর কিছু উদ্বেগেরও আভাস আছে। আমাদের গাড়ি দেরিতে এসেছে বলে যে এই গাড়ি দেরিতে ছাড়বে তার নিশ্চয়তা নেই। দূরে গেলে পাছে রয়ে যাই, সেই ভয়। স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। আমি লক্ষ্মী ছেলের মতো চায়ের ব্যবস্থা করলুম সামনের স্টল থেকে।

রাত্রের গ্লানি যে সকালে আর লেগে নেই, তা বোঝা গেল মামার কথা শুনে। বললেন: গোপাল, ছেলেবেলায় একটা শ্লোক শুনেছিলুম বুড়োদের মুখে।

আমি তাঁর দিকে তাকালুম।

কথাটা সম্পূর্ণ করলেন মামা, বললেন: সংস্কৃত তো ভাল জানি নে, মনে রাখতে পারি নি।

বললুম: কথাটা মনে যখন পড়ছে, তার মানেটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে।

বলছি।

বলে মামা খানিকটা ভাবলেন। তারপর বললেন: অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু—

আমি হাসলুম।

হাসলে যে?

বললুম: সৌরাষ্ট্রে পৌঁছেই আপনার এই শ্লোকটা মনে পড়ে গেল!

স্বাতিও কিছু আশ্চর্য হল, বলল: কী আছে এই শ্লোকে?

বললুম: সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।

স্বাতি জানতে চাইল: তার মানে?

আমি তাকে পুরো শ্লোকটি শুনিয়ে দিলুম:

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

মানে, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র আর মগধে যদি যেতে হয় তো তীর্থ করতেই যেও। এ সব দেশে অন্য কারণে গেলে পুনর্জন্ম অবধারিত।

মামা বেশ পুলকিত হয়ে বললেন: দেখলে তো, সময় মতো ঠিক মনে পড়েছে।

বলে তাকালেন মামীর দিকে। কিন্তু স্বাতি বোধহয় সবটুকু বুঝতে পারে নি। তাই সে আমার দিকেই চেয়ে রইল। বললুম: কবি বলতে চাইছেন যে এ সব দেশ ভদ্রলোকের বেড়াবার জন্যে নয়।

মামা বললেন: মনে হয় যে সে সময়ে অনার্য লোকের বাস ছিল এই সব দেশে।

মামী বিরক্ত ভাবে বললেন: কী যে বল তার ঠিক নেই। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য দ্বারকায় ছিল অসুর!

মামা বেশ বিব্রত বোধ করলেন। তাই আমি বললুম: আপনি

ঠিকই বলেছেন মামীমা। সৌরাষ্ট্রের সে তো স্বর্ণযুগ। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করেছিলেন কুশ-স্থলীতে। তাই কৃষ্ণ এসেছিলেন এই দেশে। সমুদ্রতীরে শত যোজন জমি সংগ্রহ করে নাম দিয়েছিলেন দ্বারাবতী, রাজধানী নির্মাণের ভার দিয়েছিলেন বিশ্বকর্মাকে। কৈলাস থেকে কুবের পাঠিয়েছিলেন সাত লক্ষ যক্ষ, আর শঙ্কর পাঠিয়েছিলেন বেতাল। দেখতে দেখতে সেই সুন্দর নগরী দ্বারাবতী গড়ে উঠেছিল অমরা-বতীর মতো।

স্বাতি বলল : কুশস্থলী নাম্ন কখনও শুনি নি।

বললুম : রাজা আনর্তের নামও তাহলে শোন নি!

না।

বললুম : এ সব পৌরাণিক কাহিনী। আজকের মানুষের বিশ্বাস হয় না বলেই কেউ পড়ে না। আর কিছু দিন পরে পুরাণকে আমরা রূপকথার পর্যায়ে দেখব, কিংবা দেখতেই পাব না। খানিকটা ধর্মজ্ঞান এখনও আছে তো, তাই কৌশলে তাকে বর্জন করতে হয়। দিনে দিনে আমরা সভ্য হয়ে উঠছি, দেখতে পাচ্ছ না!

স্বাতি গম্ভীর হয়ে বলল : রাজা আনর্তের গল্প বল।

হেসে বললুম : পুরাকালে শর্যাতি নামে এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র, নাম উত্তানবর্হি ভূরিসেন ও আনর্ত। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অহংকারে রাজা শর্যাতি অন্ধ হয়েছিলেন। একদিন তাঁর পুত্রদের ডেকে প্রশ্ন করলেন, এ কার রাজ্য? উত্তানবর্হি ও ভূরিসেন বললেন, আপনার। কিন্তু আনর্ত বললেন, ভগবান বিষ্ণুর। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাজা শর্যাতি আনর্তকে নির্বাসন দিলেন। কিন্তু ভগবান হলেন ভক্তের। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বৈকুণ্ঠ থেকে শত যোজন জমি উৎপাটিত করে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর স্থাপন করলেন, নিচে থেকে ধারণ করে রইল তাঁর সুদর্শন চক্র। এরই নাম আনর্ত রাজ্য, কুশস্থলী তাঁর রাজধানী।

প্রচুর আগ্রহ নিয়ে মামী গল্প শুনছিলেন। আমি থামতেই বললেন: তারপর?

বললুম: আনর্তের এক পুত্র ছিল, তাঁর নাম রেবত। রেবত নাম থেকেই রৈবত গিরি।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি বলতে চাও, বৈকুণ্ঠের মাটি বলেই কৃষ্ণ তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কুশস্থলীতে!

বললুম: এ বিষয়ে আমার কোন মতামত নেই। সব জিনিস তো ভাল করে পড়ি নি, যতটুকু জানি ততটুকুই বলি। বাড়িয়ে বললে পাপ হবে।

হুঁ।

বলে মামা নীরব হলেন।

আমি বললুম: কৃষ্ণের দ্বারাবতী আজ নেই, সে স্থান এখন সমুদ্রগর্ভে।

মামা মামী এক সঙ্গে চমকে উঠলেন। মামা বললেন: বল কী!

বললুম: বিষ্ণুপুরাণে আছে, কৃষ্ণের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজধানী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই দ্বারাবতী কোথায় ছিল শুনলে আশ্চর্য হবেন। দ্বারকা বা বেটদ্বারকার কাছে নয়। পোরবন্দর বা সুদামাপুরীকে আমরা মূল দ্বারকা বলি, তারও কাছে নয়। সেখান থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে ছিল কৃষ্ণের দ্বারাবতী। পোরবন্দর থেকে প্রভাসের দূরত্ব হবে মাইল চল্লিশেক। কাজেই সেদিনের দ্বারাবতী ছিল প্রভাসের কাছেই। এই কথা বিশ্বাস হয় এইজন্যে যে যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণ ও বলরাম বানপ্রস্থে এসেছিলেন প্রভাসের নিকটবর্তী অরণ্যে। বলরাম দেহত্যাগ করেন প্রভাসে, আর সেখানেই মৃত্যু হয় কৃষ্ণের।

স্বাতি বলল: তবে আমরা দ্বারকায় যাচ্ছি কেন!

বললুম: দ্বারকায় আছে দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর বিখ্যাত মন্দির। বৈষ্ণবের পরম তীর্থ।

স্বাতি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল : কৃষ্ণের দ্বারকাই যদি সে না হল, তো তীর্থ হল কেমন করে!

আমি তার জবাব দিলুম অন্য কথায়, বললুম : সোমনাথ কেন তীর্থ হল! নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা তো রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ করলেন, কেষ্ট বিষ্টুর মতো কোন দেবতা তো নেই মন্দির ট্রাস্টে! সবাই তাঁরা আমাদের মতোই মানুষ।

স্বাতি তবু তাকিয়ে আছে দেখে বললুম : দেবতার মন্দির কে স্থাপন করল, কবে কোথায় করল, সে প্রশ্ন অবান্তর। বিশ্বাসে ভগবান মেলে। বিশ্বাস যত অন্ধ হয়, শ্রেয় লাভের সম্ভাবনা তত বেশি।

মামীর দৃষ্টি বুঝি সজল হল। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে মামা পাইপ ধরালেন। তারপরে বললেন : প্রথম কথা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গিয়েছি। সৌরাষ্ট্র কবে অনার্যের দেশ হল, সেই কথা বল।

সে বড় কঠিন কথা। খ্রীস্টের জন্মের আড়াই থেকে ছ হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল তিনটি বিখ্যাত নদীর অববাহিকায়—নীল, ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস ও সিন্ধু। মিশরে নীল নদের তীরে মেম্ফিস, মধ্য এশিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীদ্বয়ের উপত্যকায় বাবিলন, ইরেক, উর, এরিডু, নিনেভ, কিশ, লাগাশ ও সুসা এবং সিন্ধু নদের অববাহিকায় পত্তল মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা। বাণিজ্যপথে যুক্ত ছিল এই সব শহর। উর থেকে পশ্চিমে মেম্ফিস এবং পূর্বে সিন্ধুতীরে পত্তল ও মহেঞ্জোদারো। সেখান থেকে উত্তরে খাইবার গিরিদ্বারের ভিতর দিয়ে বামিয়ান ও বাল্খ হয়ে অকসাস নদীর উৎস পেরিয়ে চীনের কাশগর পর্যন্ত। সিন্ধুর মোহনা থেকে সৌরাষ্ট্রের দূরত্ব আর কতটুকু! সেখানে কি তবে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আলো পৌঁছায় নি! গুজরাতের লোথালেও তো এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভারতে আর্যের বসতি শুরু হয় খ্রীস্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে থেকে। প্রথম আটশো বছর এই বসতি সপ্তসিন্ধুর অববাহিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গঙ্গার অববাহিকায় নামতে আরও চারশো বছর লেগেছিল। তারপরে এসেছিল পূর্বে অঙ্গ বঙ্গ মগধে, এবং পশ্চিমে অবন্তী ও সুরাষ্ট্রে। অবন্তী ও উজ্জয়িনীর গৌরবের কথা আমাদের কাব্য ও ইতিহাস ভুলতে দেবে না।

স্বাতি বলে উঠল : কলিঙ্গের কথা বললে না ?

বললুম : কলিঙ্গে অনার্য অধিকার আরও অনেক দিন ছিল।

মামা বললেন : এ সমস্তই তো অনুমানের কথা !

যা অনুমান নয়, তাও বলি। খ্রীস্টের জন্মের পাঁচ শো বছর আগে থেকে আমরা ভারতের সঙ্গে প্রতীচ্যের একটা বাণিজ্যিক বন্ধন দেখতে পাই। রোমের নিকটবর্তী পুটিওলি বন্দর থেকে যে মাল চালান হত, তা মেম্ফিসের উপর দিয়ে দক্ষিণ ভারতের মুসিরিস বন্দরে নামত বর্তমান কোচিনের কাছে। ভূমধ্যসাগরের তীরে গাজা থেকে আর একটা পথ পারস্য উপসাগরের ভিতর দিয়ে সিন্ধু মোহনায় বারবারিকন বন্দর ছুঁয়ে সুরাষ্ট্রে শেষ হত। নিকটেই ভরুকচ্ছ, তার পৌরাণিক নাম ভৃগুকচ্ছ। আর সৌরাষ্ট্রকে তখন বলত সুরাষ্ট্র।

স্বাতি মুখ টিপে হাসছিল। বললুম হাসছ যে !

স্বাতি বলল : তোমাকে ভুলিয়ে রাখার মন্ত্রটা শিখে ফেলেছি।

আমি তার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না। তাই দেখে সকৌতুকে বলল : তোমাকে সঙ্গে নেবার দরকার থাকলে ইতিহাসের গল্প ফাঁদতে হবে।

এবারে আমি তার রহস্যটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেলুম। ট্রেন কখন ছেড়ে দিয়েছে টের পাই নি। পেরিয়ে এসেছি রাজকোট স্টেশন। ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে ট্রেন চলেছে দ্বারকার পথে।

মামীও হাসলেন।

স্বাতি বলল : চায়ের প্লেট পেয়ালা নামিয়ে নিল, পয়সা নিয়ে

গেল বাবার কাছ থেকে। ঘণ্টা পড়ল, বাঁশি বাজাল গার্ডসাহেব, ইঞ্জিনের বাঁশিও বাজল। কিন্তু গোপালদা কিছুই টের পেল না।

স্বাতির মজা লাগছে। মজা লাগবারই কথা। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে আমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে রইলুম। আবু রোডে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটই কেটেছিলুম। শুধু রাতের জন্য বদলি করে নিয়েছিলুম টিকিটখানা। বললুম: পরের স্টেশনেই নেমে যাব।

মামা বললেন: নামবে কেন!

মামার প্রশ্নটা সাবধানে এড়িয়ে গিয়ে বললুম: জান স্বাতি, মানুষকে যে ভোলাতে পারে, তার অসীম ক্ষমতা। মা ছেলেকে ভোলায়—

তারপরেই বলতে যাচ্ছিলুম, মুনির তপোভঙ্গ করে স্বর্গের অপ্সরা। কিন্তু তখনি মনে পড়ে গেল মামা মামীর উপস্থিতির কথা। তাই চুপ করে গেলুম।

স্বাতি বলল: থামলে কেন?

বললুম: আমায় ভোলায় ইতিহাস।

অতটা ভোলা ভাল নয়। ইতিহাসে পেলে তোমার মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

কেন থাকে না জান?

কী করে জানব!

তবে তোমায় এক প্রফেসরের গল্প বলি। তাঁর নাম করব না। তিনি খ্যাতিমান এবং এখনও জীবিত আছেন।

গল্প শোনবার জন্য স্বাতি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

বললুম: সেদিন আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতে এসে বললেন, চসারের যুগ পড়াব। বলেই বক্তৃতা শুরু করলেন সেই যুগের ওপর। কোন দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, চমৎকার বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কয়েক মিনিটেই ক্লাস ফাঁকা হয়ে গেল। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের বই আমি অনেক কখানা পড়েছি, কিন্তু তিনি

যা বললেন তা সবই নতুন কথা। ঘণ্টা শেষ হবার অনেকক্ষণ পরে একজন ঘরে এসে আমাদের দুজনকেই জাগিয়ে দিলেন। আমি প্রফেসারকে জিজ্ঞেস করলুম, এ সব কথা কোথায় পাব? তিনি যেন আকাশ থেকে পড়ে বললেন, তাইতো, এ সব কথা কেউ লিখেছে বলে তো শুনি নি। পরে জেনেছিলুম যে এ সমস্ত কথা তিনি নানা স্থান থেকে আহরণ করেছিলেন।

স্বাতি বলল: বুঝেছি। তুমি বলবে যে তোমার ইতিহাসও এই রকমের।

আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম: অহঙ্কার ভেবো না। আমিও কোন একটা বিশেষ বই-এ এ সব পড়ি নি। কোথায় কোন্ জিনিস পড়েছি, তাও বলতে পারব না। তবে পড়েছি বা শুনেছি নিশ্চয়ই, তা না হলে এ সব কথা জানব কোথা থেকে!

মনে হল, স্বাতি আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। বলল: এ সব যদি মৌলিক ভাব তো লেখ না কেন!

মৌলিক কেন ভাবব! এ তো অন্যের কথা। আর লিখি না তোমাদের ভয়েই। লেখাপড়া শিখেও তুমি শুনতে চাও না, তবে কার জন্যে লিখব!

মামা আমাকে সমর্থন করে বললেন: ঠিক কথাই বলেছ। লেখবার বিষয় আজকাল পালটে গেছে। মুখরোচক না হলে কেউ পড়বে না।

স্বাতিকে আমি চুপি চুপি বললুম: লুকিয়ে লিখি বৈকি!

ট্রেন তখন ছুটে চলেছে। সৌরাষ্ট্র দেখছি কালো মাটির দেশ। রাজস্থানের মতো ধুলো ও পাথরে রুক্ষ নয়। ভিজে ভিজে কালো মাটি, কুয়ো থেকে জল টেনে চাষ চলেছে। একটুখানি শ্যামলিমা দেখছি এ সময়। অন্য সময় নাকি দুধারের মাঠ খাঁ খাঁ করে. বৃষ্টির অভাব দেখা দেয় সব চেয়ে বড় অভাব হয়ে। জানালা দিয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে আমি মামার কথা ভাবতে লাগলুম। মামা বোধ হয়

ঠিকই বলেছেন যে লেখবার বিষয় আজকাল পালটে গেছে। বোধ হয় মানুষের রুচি পালটেছে আগে।

কিন্তু: মামা জানতে চাইলেন: কেন এমন হল বলতে পার?

বড় কঠিন প্রশ্ন। আমি এর কী জবাব দিতে পারি! তবু মামা আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন না, বললেন: তুমি নিশ্চয় কিছু ভেবেছ!

ভেবে কোন উত্তর পাই নি। তবে মনে হয়েছে যে সমস্ত অনর্থের মূলে আছে অর্থ। অর্থের বিনিময়ে মানুষ কোন দিনই জ্ঞান চায় নি, চেয়েছে আনন্দ। সেই আনন্দের সংজ্ঞা এখন দৈহিক সুখেই সীমাবদ্ধ। আত্মার স্বীকৃতি নেই, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

হুঁ।

বলে মামা পাইপের ছাই ঝাড়লেন জানলার বাহিরে। আমিও সে দিকে তাকিয়ে ছিলুম। সেই কালো মাটি, কালো মানুষ। এদের জীবনে আজও বোধ হয় কোন পরিবর্তন আসে নি। আজও তারা আকাশের দিকে চেয়ে নিজেদের ভাগ্য বিচার করে, যেমন তাদের পূর্বপুরুষরা করত। কিন্তু আমরা শহরের মানুষ আজ ভুলে গেছি আমাদের অতীতটাকে, বর্তমানকে নিয়েই মশগুল হয়ে আছি, আর স্বপ্ন দেখছি একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের!

পাইপটা পাশে রেখে মামা বললেন: কিন্তু আমরা কি ভুল পথে চলছি না?

সে কথা কে বলবে! কে বলতে পারে!

স্বাতি বলল: পৃথিবী তো তাকেই খুঁজছে।

কিন্তু ট্রেনের অবিচ্ছিন্ন ধ্বনিতে তার কথা বুঝি তলিয়ে গেল।

৩

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামতেই আমি নেমে গেলুম। মামা আপত্তি করেছিলেন, আর স্বাতি লজ্জিত হয়ে বলল : আমার কথাতেই তুমি নামছ তো! আমি মনে করিয়ে না দিলে হয়তো এক সঙ্গেই যেতে!

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

কোন্ দিকে যাব ভাবছি, দেখলুম গাড়ির এক প্রান্তে ক্যাপ্টেন শাহ্ দরজার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় তাকাতে দেখেই হাত নেড়ে ডাকলেন। ভাববার সময় ছিল না। ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমেই চলতে শুরু করে। কাজেই যা কিছু ভাববার, তা আগে-ভাগেই সেরে রাখতে হয়। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হলে আমাকে ইতস্তত করতে হত না, সাগ্রহে আমি নিজেই এগিয়ে যেতুম। দরকার হলে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে খুঁজেও বার করতুম। আমার দ্বিধা দেখে ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। এবারে বাধ্য হয়েই আমি তাঁর কামরায় গিয়ে উঠে পড়লুম।

ভদ্রলোক আমার পরে গাড়িতে উঠে বললেন : এত রাগ কেন বলুন তো!

বললুম : রাগ নয়, ভয়।

ভদ্রলোক হা হা করে অট্টহাসি হাসলেন অনেকক্ষণ ধরে। তাঁর স্ত্রীর কোলে শিশুপুত্রটি বোধ হয় ভয়ে চমকে উঠেছিল। ভদ্রমহিলা বিরক্ত ভাবে ছেলেকে সামলাবার চেষ্টা করলেন। আর আমি আশ্চর্য হয়ে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালুম।

ভদ্রলোক বললেন : বাঙলা দেশের মানুষ দেখছি জাত-ভীরু।

আমার এক বাঙালী বন্ধু আছেন সেনাদলে। তিনিও ঠিক আপনার মতোই লড়য়ের নাম শুনলে এখনও ভয়ে কাঁপেন।

জাতের নিন্দায় আমি খুশী হই নি ঠিকই, কিন্তু তর্ক করলুম না। বললুম : ভয় আপনাকে নয়, ভয় রেল কোম্পানির কালো কোটকে।

কেন?

বললুম : আমার পকেটে যে থার্ড ক্লাসের টিকিট!

ভদ্রলোক আর একবার হেসে উঠলেন। ছেলেটাও আবার চমকে উঠল। তাঁর স্ত্রী আরও বেশি বিরক্ত হলেন। হাসি থামলে ভদ্রলোক বললেন : বাঘা যতীনের দেশের লোক তো!

বাঘা যতীনের প্রতি শ্রদ্ধাও আছে দেখলুম। বললুম : কেন ডাকছিলেন তাই বলুন।

শাহ গম্ভীর হয়ে বললেন : গল্প করতে।

গল্প শুরু হবার আগেই গাড়ি ছেড়েছে। এখন অনেকক্ষণ এক সঙ্গে যেতে হবে। তাই গল্পে মনে দেওয়াই ভাল। বললুম : গল্প আপনি বলবেন তো!

শাহ সংক্ষেপে বললেন : না, আপনি বলবেন।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম : আমি দেখতে আর শুনতে বেরিয়েছি। যদি কিছু জানতে পারি তো দেশে গিয়ে বন্ধুবান্ধবকে বলব। প্রথমে আপনি বলুন।

বিব্রত ভাবে ভদ্রলোক বললেন : এবারে আপনি সেনাপতিকে বিপদে ফেলেছেন দেখছি। বাক্‌যুদ্ধের অভ্যাস তো আমাদের নেই।

যুদ্ধ থাক। আপনি আমার কথার জবাব দিন।

শাহ বললেন : তাল বেতালের প্রশ্ন নয় তো! কিংবা বকরূপী ধর্মের!

তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি হেসে বললুম : এ সব গল্প কোথায় শুনলেন?

ভদ্রলোকও জবাব দিলেন হেসে। বললেন : ভুলে যাচ্ছেন যে আমার বাঙালী বন্ধু আছে। আর এ সব তো ভারতবাসীর গল্প।

বুঝতে ভুল হল না যে ভদ্রলোক রসিক লোক। তাঁর সঙ্গে সময়টা ভাল কাটবে। বললুম : দেশরক্ষার দায়িত্ব আপনার। বাঙালীকে বন্ধু ভেবে ভুল করবেন না যেন। বড় সাংঘাতিক জাত।

শাহ গম্ভীর হয়ে বললেম : আমিও তাই ভাবি।

বললুম : এবারে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ভদ্রলোক আরও গম্ভীর হয়ে বললেন : নিজে বিপদে পড়ব না তো!

তারপরেই বললেন : বলুন আপনার বিপদের কথা।

আমি বললুম : ছেলেবেলায় ভূগোলে ফাঁকি দিয়েছি বেপরোয়াভাবে। তবু মানচিত্রটা ভুলতে পারি নি। পশ্চিম প্রান্তের যে অংশটা কিছুতেই আঁকতে পারতুম না, মনে হচ্ছে আমরা এখন সেই ভূখণ্ডের মাঝখানে।

এ বিষয়ে ভদ্রলোকের উৎসাহ আছে দেখলুম। বললেন : ঠিক ধরেছেন। কাথিয়াবাড়ের ঠিক মাঝখানে আমরা, একটু উত্তর ঘেঁষে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম : আবার বিপদে ফেললেন।

কেন বলুন তো!

সৌরাষ্ট্র আর গুজরাতকেই এতক্ষণ সামলাতে পাচ্ছি নে, আপনি আবার কাথিয়াবাড় যোগ করলেন। তারপর বোধ হয় কচ্ছ যোগ করে আমায় মুক্তকচ্ছ করবেন।

বাঙলা রসিকতা ইংরেজীতে তেমন জমে না। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই ভদ্রলোক আর এক দফা হেসে উঠলেন। এবারে আমি তাঁর স্ত্রীর দিকে চাইবার সাহস পেলুম না। ছেলেটি ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল। ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে কথা কইলেন খুব আস্তে আস্তে। বললেন : ভূগোলের জ্ঞান আমারও আপনার মতো। তবে এখানে দেখতে পাই যে দেশটাকে লোকে কাথিয়াবাড় ও মানুষগুলোকে কাথিয়াবাড়ী বলে। বই পুঁথিতে দেখি সৌরাষ্ট্র নাম। কিছু দিন থেকে এই নামটাই বেশি চলেছে।

তারপরেই বললেন : দাঁড়ান দাঁড়ান, কাথিয়াবাড় নাম বোধ হয় ভূগোলেও পড়েছি।

চোখ বুজে কপাল কুঁচকে ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন : মনে পড়েছে। ভারতবর্ষের উপদ্বীপ হল কচ্ছ কাথিয়াবাড় ও ডেকান। কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়ের মাঝখানে কচ্ছ উপসাগর। সেই সঙ্গে রন্ অব কচ্ছ্--উপরে গ্রেট রন্, নিচে লিট্‌ল্ রন্। বিখ্যাত লুনি নদী পড়ছে গ্রেট্ রনে, লিট্‌ল্-এ সরস্বতী আর একটা কী নদী তার নাম মনে পড়ছে না।

ভদ্রলোক চোখ বুজেই কথা কইছিলেন। এবারে বললেন : কাথিয়াবাড়ে পাহাড় হল মাণ্ডব আর গির্ণার, তিন হাজার ছশো তেষট্টি ফুট উঁচু হল গির্ণার পাহাড়। আর নদী ও উঁহুঁ, একটা নামও মনে পড়ছে না।

বলে ভদ্রলোক চোখ খুললেন

বললুম : আপনার দেশ কি সৌরাষ্ট্রে?

প্রায়।

প্রায় মানে?

বাপ মায়ে যদি বলে না যেতেন তো সে কথা জানবার উপায় ছিল না।

বুঝতে পারলুম না, এই মন্তব্যের আড়ালে কোন বেদনা আছে কিনা। অনেকেরই আজ এই অবস্থা। তাদের ছেলেমেয়েরাও ভবিষ্যতে ঠিক এই কথাই বলবে। প্রসঙ্গটা তাই পালটে নিলুম: বললুম : এবারে গুজরাতের কথা বলুন।

গুজরাত?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন : মুন্সী সাহেবের গুর্জর দেশ পড়ুন। এ নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করেছেন, লিখেছেনও অনেক। একখানি মাত্র ছোট বই পড়ে আপনি এ দেশের সব কিছু জানতে পারবেন।

তারপরেই সংশোধন করলেন নিজের বক্তব্য, বললেন : সব কিছু মানে সম্পূর্ণ ইতিহাস।

বললুম : ইতিহাস আমি পড়ে নেব, আপনি ভূগোল বলুন।

শাহ বললেন : একদা গুজরাতের নাম ছিল গুর্জর দেশ। এই নাম কোথা থেকে এল তা নিয়ে অনেক বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে। এখনও মতান্তর আছে, আপনাদের পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্রের মতো।

আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে বললেন : মজা লাগছে শুনতে, তাই না?

আমি সে কথা স্বীকার করে নিতেই বললেন: লাগবেই। আমারও লাগে।

বলে সেই তর্কের কথা আমাকে শোনালেন। বললেন : এক দল পণ্ডিত বলেন যে গুর্জর একটা জাত, হুনদের সঙ্গে তারাও ভারতে এসে বসতি স্থাপন করে। তাদেরই উপনিবেশের নাম হল গুর্জর দেশ। আর এক দল পণ্ডিত বলেন যে তা নয়, দেশটার নামই ছিল গুর্জর। বর্তমান গুজরাতে আজও তার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

বললুম : এবারে দু পক্ষের যুক্তি বলুন।

ভদ্রলোক তখনই উত্তর দিলেন, বললেন : আবার বিপদে ফেললেন। মুন্সী সাহেবের বই পড়েছিলাম শখ করে। আপনার কাছে স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে জানলে এ কথা অস্বীকার করে আত্মরক্ষা করতাম।

কিন্তু আমি এমন সুযোগ হারাবার পাত্র নই। বললুম : পরীক্ষা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি শুধু আনন্দ পরিবেশনের চেষ্টা করুন।

ভদ্রলোক আমার চোখের দিকে তাকালেন কিছু শ্রদ্ধা নিয়ে। বললেন : যুক্তি মন্দ নয়। পরীক্ষার নাম পালটে একই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। বেশ, তবে আপনাকেও আমি বিপদে ফেলব।

এ কথা শুনেই আমি বেঞ্চের উপরে পা তুলে বসলুম।

শাহ বললেন: হূনদের কথা আপনি জানেন। তারা শুধু রাজস্থানেই জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু গুর্জররা ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে বসল। আজও তাদের নাম দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে আছে। পাঞ্জাবে দেখুন গুজরণওয়ালা গুর্জরখান। কিছু দিন আগে সাহারাণপুরের নাম ছিল গুজরাত্। গোয়ালিয়রের এক জেলার নাম এখনও গুর্জরগড়। হাজার বছরের কিছু আগে রাজপুতানার উত্তর ও মধ্য ভাগের নাম ছিল গুর্জরাত্রা। এই সময়েই তারা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—বুন্দেলখণ্ড, নর্মদা উপত্যকা, এমন কি দক্ষিণ ভারতেও। পশ্চিম হিমালয় ও কাশ্মীরেও আছে গুর্জর নামে এক জাত।

তারপরেই বললেন: আরও অনেক কচকচি আছে, সে সব আমার মনে নেই। আপনারও ভাল লাগবে না।

বললুম: তাহলে অপর পক্ষের মত বলুন।

শাহ বললেন: সে আরও বিপজ্জনক। কবি বাণের হর্ষচরিত নাম শুনেছেন? তাতেই নাকি গুর্জর শব্দের প্রথম উল্লেখ আছে। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধনের বিশেষণ শুনুন।

বলে খানিকটা সংস্কৃত বলবার চেষ্টা করলেন: সিন্ধুরাজ জ্বরঃ গুর্জর প্রজাগরঃ গান্ধারধিপ গন্ধদ্বিপ কুটপাকলঃ—এর পর আর মনে নেই।

বলে দম নিতে লাগলেন ক্যাপ্টেন শাহ। তারপর বললেন: এই শ্লোকে নাকি বাণ গুর্জর শব্দ দিয়ে গুর্জর দেশের রাজাকে বুঝিয়েছেন। আরও প্রমাণ দেব?

উত্তর শাহ নিজেই দিলেন: শিলালিপি আর সংস্কৃত শ্লোকের তালিকা যদি মনে রাখতে পারতাম তো আজ আপনাকে পাগল করা কঠিন হত না।

বলে হাসতে লাগলেন।

বললুম : সে তালিকায় আমারও কাজ নেই। আপনি আমাকে গুজরাতের সীমানা বলুন।

শাহ বললেন : ভারতের মানচিত্রে একদিন গুজরাতের যে সীমানা ছিল, তার পরিবর্তন হয়েছে বার বার। স্বাধীন ভারতে তার অস্তিত্ব আজ নেই। গুজরাতের লোক বোম্বাই শহরটা দাবি করেছিল বলে গোটা দেশটাই তার গেল। গুজরাত এখন বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত হয়েছে।

সীমানা কমিশনের হাঙ্গামার কথা আমি জানি। তারপর বোম্বাই শহর নিয়ে বিবাদের কথা। শেষ পর্যন্ত বণ্টনের অসুবিধার জন্যই সরকার হার মানলেন। প্রদেশ ভাগ হল না। আজকের বোম্বাই প্রদেশ একটা বিরাট ব্যাপার। ভারতে এত বড় প্রদেশ আর নেই। কোন দিন ছিল না। কিন্তু বেশি দিন এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয় নি। বোম্বাই ভাগ হয়ে দুটি রাজ্য হয়েছিল—মহারাষ্ট্র ও গুজরাত। গান্ধীনগর গুজরাতের নূতন রাজধানী।

শাহ বললেন : আপনাদের কলকাতার কথা আমি শুনেছি। সেখানকার জাঁকজমক আজ অবাঙালীর পয়সায়, কিন্তু বাঙালীর আছে বুদ্ধির মূলধন। বাঙালীকে বাদ দিয়ে কোন দিন কলকাতা চলবে না।

তারপর একটু হেসে বললেন : বম্বের বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। পয়সা প্রধানত একটা জাতের, তারা গুজরাতী। বুদ্ধিও একটা জাতের, তারা মারাঠী। কাজেই দ্বন্দ্ব সেখানে গুজরাতী ও মারাঠীদের মধ্যে। কোন একজনকে তাড়াতে গেলে বম্বের অর্ধেক যাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাহ বললেন : সমুদ্রের ধারে এমন সুন্দর একটা জায়গা পেলে গুজরাতীরা নতুন বম্বে গড়তে পারত। আমেদাবাদ তার যোগ্য স্থান নয়।

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর

বললেন: আপনি গুজরাতের সীমানা জানতে চেয়েছিলেন, তাই না?

বললুম: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন: হিউয়েন চাঙ যখন এ দেশে এসেছিলেন, তখন গুর্জর দেশ ছিল বর্তমান গুজরাতের অনেক উত্তরে। দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হত লুনি নদী। হিউয়েন চাঙ উজ্জয়িনী থেকে এই গুর্জর দেশের দক্ষিণ প্রান্তে ভিল্লমাল ছুঁয়ে সৌরাষ্ট্রের উজ্জয়ন্ত পাহাড়ে এসেছিলেন। আর পাহাড়ের কোলে গিরিনগর। উজ্জয়ন্তের বর্তমান নাম গির্ণার আর শহরের নাম জুনাগড়।

শাহ থামলেন না, বললেন: এর পর প্রতিহারদের সময় গুজরাতের ব্যাপ্তি হল ঈর্ষার বস্তু। পূর্বে পৌঁছল মগধ ও কলিঙ্গ পর্যন্ত। শুধু বর্তমান গুজরাত নয়, সিন্ধু রাজপুতানা মধ্য ও উত্তর প্রদেশেরও নানা স্থান প্রতিহারদের রাজ্যভুক্ত হল। চালুক্যরা এ রাজ্য রক্ষা করতে পারল না। সব গিয়ে বর্তমান গুজরাত শুধু রইল, উত্তর ও পূর্বে কিছু বেশি। পরমারদের সময় কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রও হাতছাড়া হল, তার বদলে পূর্বে সামান্য কিছু বিস্তার হল।

ভদ্রলোক থামলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: বর্তমান গুজরাতের কথা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন! কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র তার হারাতে হয় নি। কেন হবে? এ দেশের মানুষের হৃদয়ে যে গুজরাত আছে, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র তো তার নিজের অঙ্গ। এক ভাষা, এক মানুষ। দেশ কেন আলাদা হবে!

ভদ্রলোক আরও কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর বললেন: কিছুদিন আগেও আবু পাহাড় এই গুজরাতের অন্তর্গত ছিল। আজ নেই। আবু আজ রাজপুতানার ভাগে পড়েছে। দক্ষিণে এর সীমানা নাসিক পর্যন্ত পৌঁছয় নি, মাইল চল্লিশ দক্ষিণে পড়েছে বম্বে শহর। বড় বড় শহরের নাম শুনবেন?

আমি তাঁর মুখের দিকের চেয়েছিলুম। বললুম: শুনব।

শাহ বললেন: শবরমতীর তীরে আমেদাবাদ, সুরাত তাপ্তীর তীরে, আর দেশীয় রাজার বরোদা। সৌরাষ্ট্রে আসুন। তীর্থস্থান দ্বারকা সোমনাথ আর জৈনদের জুনাগড় পলিতানা। মহাত্মাজীর পোরবন্দর। রাজকোট, জামনগর ও ভাবনগরও ভাল শহর। উত্তরে ওখা বন্দর, সেখান থেকে বেট দ্বারকার তীর্থ। দক্ষিণে একটুখানি পর্তুগীজ অধিকার, দিউ। দমনও পড়েছে গুজরাতের দক্ষিণে। বড় বড় জাতির কূটনৈতিক প্রয়োজনে বিদেশীরা এখনও ঐ মাটি কামড়ে পড়ে আছে।

এর পর ভদ্রলোক কচ্ছের কথা বললেন: ভুজ হল কচ্ছের প্রধান শহর। নতুন বন্দর হয়েছে কান্দ্‌লায়। তারই নিকটে গান্ধীধাম। ভারত সরকার ধীসা থেকে কান্দ্‌লা পর্যন্ত নতুন রেল-লাইন টেনে কচ্ছের উন্নতির চেষ্টা করছেন।

পরবর্তীকালে যে গান্ধীধাম বম্বের সঙ্গে বড় লাইনে যুক্ত হবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি। সৌরাষ্ট্র এক্সপ্রেস বম্বে থেকে ভিরমগমের উপর দিয়ে সরাসরি গান্ধীধামে আসছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়েই থেমে পড়লেন। আমি দেখলুম যে ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন, আর কাপ্তেন সাহেবের দিকে চেয়ে আছেন বড় বড় চোখ মেলে। ভদ্রলোক হঠাৎ তা দেখতে পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: দেখেছেন, মিসেস শাহর সঙ্গে আপনার পরিচয় করাতেই ভুলে গেছি।

আমি জানি যে তিনি নিজেই আমার পরিচয় জানেন না। কিন্তু সে জন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বললেন: মিস্টার গোস্বামী—

বাধা দিয়ে বললুম: ভুল হল। মিস্টার গোস্বামী আমার মামা, আমার নাম হল গোপাল।

ভদ্রমহিলা আমাকে নমস্কার করলেন। কিন্তু শাহ যেন খুশী

হলেন তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়াতে। বললেন: আমার স্ত্রী তাহলে ঠিকই বলেছেন।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: ভাগ্নে বলে আমায় চিনতে পেরেছিলেন? বলে আমি মিসেস শাহর দিকে তাকালুম।

ভদ্রমহিলা লজ্জা পেয়ে বললেন: না।

শাহ রুখে উঠলেন: না মানে! তুমি বল নি যে গোপালবাবু নিশ্চয়ই অন্য পরিবারের মানুষ!

ভদ্রমহিলাও দমবার পাত্রী নন, সেনাপতির উপযুক্ত অর্ধাঙ্গিনী। বললেন: অন্য পরিবারের মানে কি ভাগ্নে!

ঐ হল।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: এতখানি সন্দেহ করাও কঠিন ব্যাপার। যখন করেছেন, তখন আমি আরও একটু সংবাদ দেব। মামা ভাগ্নে সম্বন্ধটাও আমাদের পাতানো। আমার মা মিস্টার গোস্বামীর বোন নন।

এবারে দুজনেই বিস্ফারিত চোখে চাইলেন আমার দিকে। বললুম: কেন আশ্চর্য হচ্ছেন! বন্ধু কি আত্মীয় হতে পারে না! আত্মার সম্বন্ধ কি রক্তের সম্বন্ধের মতো দৃঢ় হয় না! তবে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন এমন গভীর হয় কেমন করে!

শাহ লজ্জিত ভাবে বললেন: না না, সে কথা আমরা ভাবছি না। বলে না দিলে এ কথা কি আমরা ভাবতে পারতাম!

মিসেস শাহর দৃষ্টিতে কৌতুক দেখলুম। তিনি বললেন: আমি পেরেছিলাম।

সত্যিই পেরেছিলেন। কিন্তু কী করে পারলেন, সেই কথা জানবার ইচ্ছা হল। বললুম: কেন সন্দেহ হল বলবেন?

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন: বলব, কিন্তু এখানে নয়। সবাই মিলে আমাদেব বাড়ি এলে কিছু গোপন করব না।

শাহ আগেই আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন মেসানার প্ল্যাটফর্মে।

এবারে গৃহিণীর নিমন্ত্রণ। সেবারে সময় ছিল না হাতে, তাই হাঁ বলে পরিত্রাণ পেয়েছিলুম। এবারে সত্যি কথাই বললুম: তা কি সম্ভব হবে!

ভদ্রমহিলা বললেন: সম্ভব না হলে আপনার জানাও হবে না।

কৌতুকে আরও উজ্জ্বল হল তাঁর দু চোখের দৃষ্টি। কেন জানি না, আমি লজ্জা পেলুম। কানের পাশ দুটো গরম হয়েছিল, বোধ হয় লালও হয়েছিল। সে দিকে চেয়ে ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন।

৪

ট্রেন একটা ছোট স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। নামব বলে উঠে দাঁড়িয়েও নামতে পারলুম না। পিছনে একটা আকর্ষণ বোধ করলুম। পা দুটো নড়তে চাইল না। শাহর বাধা তো একটা উপলক্ষ্য।

সে কি, উঠলেন যে!

আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলুম। বুঝতে পারছিলুম না, পিছনে আজ কিসের টান! এই দম্পতিকে আমার ভাল লেগেছে, না ভাল লাগছে এই দেশের কথা শুনতে! না, এ সমস্ত ছাপিয়ে আর কিছু!

মিসেস শাহ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: লজ্জা পাচ্ছেন কেন! এই কথা দিলাম, এ সম্বন্ধে আর আমরা কিছু বলব না।

সেনাপতি এবারে বলপ্রয়োগ করলেন, হাত ধরে টেনে তাঁর পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন: এবারে আপনি কথা বলুন।

জোর দিলেন আপনির উপরে।

আমি বললুম: সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়! বলতেই যদি পারব তো কেরানীগিরি কেন করি! দেশনেতা হলেই পারতুম!

প্রবল উদ্যমে শাহ হাসতে যাচ্ছিলেন।

মিসেস শাহ উঠে দাঁড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যে শাহর হাসির বেলুনটা নিমেষে ফেঁসে গেল। দম আটকানোর মতো কসরৎ করে শাহ বললেন: কী হল?

ছেলে জেগে যাবে।

শাহ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: তাও ভাল।

আমি ভাবলুম যে এই সুযোগ। এইবারে জামনগর সম্বন্ধে কিছু জেনে নিই। বললুম: আপনার দেশ তো জামনগর। কেমন শহর বলুন তো?

সাংঘাতিক মানুষ! একটার পর একটা প্রশ্ন তৈরি করেই রেখেছেন। ডেকে বিপদ বাধিয়েছি দেখছি।

আমাকে তো ডাকেন নি, ডেকেছেন বিপদ। এখন বিরক্ত হলে চলবে কেন?

শাহ যে বলতে ভালবাসেন তার প্রমাণ পেয়ে গেছি। আর একবার প্রমাণ পেলুম তাঁর এবারের কথায়। বললেন: জামনগর তো শহরের নাম, রাজ্যের নাম হল নবনগর। জানেন বোধ হয় যে স্বাধীনতার পর যে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ গঠিত হয়েছিল তাতে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল দুশো আঠারো, আর এই রাজ্যগুলো ছড়ানো ছিল চারশো বাহান্ন ভাগে।

এ কথা আমার জানা ছিল না। আমি সত্যিই ভারি আশ্চর্য হলুম। আর তা বুঝতে পেরে শাহ বললেন: ভাবছেন সৌরাষ্ট্র খুব ছোট দেশ, এতগুলো রাজ্য কী করে আঁটল!

শাহ নিজেই এ কথার উত্তর দিলেন: যত ছোট ভাবছেন, তত ছোট নয়। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র এক সঙ্গে আপনাদের পশ্চিম বাঙলার চেয়ে বড়ই হবে।

পশ্চিমবঙ্গ আর কতটুকু! শুধু নামটাই আছে। জমি নেই চাষের। ওধার থেকে তাড়া খেয়ে যারা চলে এল, তাদের পাঠাতে হচ্ছে বাঙলার বাইরে। বোধ হয় আর কোন দিন তারা বাঙলার মুখ দেখবে না। কী করে দেখবে! কালাপানির দেশ থেকে যেমন সমুদ্র সাঁতরে আসা যায় না, তেমনি ভারতের আর এক মাথা থেকেও আসা যায় না পায়ে হেঁটে। জাহাজে ওঠার স্বপ্ন তারা দেখে না, টিকিট কেটে ট্রেনে চাপবে সে ভরসাও নেই তাদের ভাঙা মনে। বাঙলা ভেঙে গেছে। সবাই আজ বাঙলার চেয়ে বড়। কখন আমার

দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল টের পাই নি, শাহ আমায় জাগিয়ে দিয়ে বললেন : বাঙলার নামে মন খারাপ হয়ে গেল বুঝি !

লজ্জা পেয়ে বললুম : আপনার গল্প শুনছি ।

শুনছেন না তো !

আমি মিথ্যা কথা বলতে পারলুম না, বললুম : এইবারে বলুন ।

আপনি জামনগরের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, তাই না ?

হ্যাঁ ।

জামনগর নাম আপনি কবে প্রথম শুনেছেন বলব ?

অদ্ভুত প্রশ্ন । তাই আগ্রহ প্রকাশ করে বললুম : বলুন তো !

স্কুলের ক্রিকেটের মাঠে ।

তিনি যে এই সন্দেহ করবেন আমি জানতুম । ক্রিকেটের মাঠে নামলেই জানা যায় যে একদা ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার ছিলেন জামসাহেব অব নবনগর । ইংলণ্ডের মাঠে এক সিজ্‌নে তিন হাজার রান করে পৃথিবীর লোককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন । তাঁর আগে এই ভেল্কি দেখাতে কেউই পারেন নি । সেদিন তাঁর খেলা দেখবার জন্য বিদেশের লোক ভেঙে পড়ত, পাগল হত । সেই রণজিৎ সিংজী হলেন নবনগরের জামসাহেব । কিন্তু খেলার মাঠে আমি তাঁর নাম শুনি নি । আমি ক্রিকেট খেলায় কাঁচা ছিলুম, পাগল হতুম ফুটবল নিয়ে । উত্তরে তাই আপত্তি জানালুম : হল না ।

হল না ?

না । আবার অনুমান করুন ।

ভদ্রলোক কিছু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । সামলে নিতে সময় লাগল । বললেন : অনুমান আর কী করব, নিজেই বলে ফেলুন ।

বলতে পারলেন না তো ! আমরা তাঁর নাম শুনেছিলুম পড়ার বই-এ । জামসাহেব অব নবনগর নামে একটা প্রবন্ধ আমাদের পড়তে হয়েছিল ।

ভদ্রলোক অদ্ভুত এক রকমের আনন্দ পেলেন, বললেন : বাঙলায় আপনারা জামসাহেবের জীবনী পড়েন!

বাধা দিলেন মিসেস শাহ। বললেন : গোপালবাবু আমাদের কাছে এলে কী কী তাঁকে দেখাবে, তাই বল।

শাহ উত্তর দিলেন : সবই দেখাব। সত্যিই, আসুন না দু দিনের জন্যে।

কী দেখাবেন বলুন, তারপর আর্জি পেশ করব মামাবাবুর দরবারে।

শাহ উৎসাহিত হয়ে বললেন : জামনগর একটা অদ্ভুত শহর। অতীতকে বর্জন করে নি, অথচ নবীনকে গ্রহণ করেছে সাগ্রহে। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের বিবাদ কোনখানে দেখতে পাবেন না। চওড়া রাস্তা ফুলের বাগান আর সাজানো বাজার আপনার ভাল লাগবেই।

তারপরেই বললেন : রাজপ্রাসাদ দেখবার লোভ যে আপনার নেই, তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

কী করে জানলেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : আপনার খদ্দর দেখে। কিংখাবের জাঁক আপনার বিরক্তি বাড়াবে। আর কীইবা দেখতে বলব! কিছু বিলিতি ছবি? নাই বা তা দেখলেন। তাতে জামনগর দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে না। তার চেয়ে দুটো পুরনো বাড়ি দেখুন —কোঠা বেস্টন আর লাকোঠা। শুধু শহরের মাঝখানে নয়, একটা সরোবরের মাঝখানেও। পুলের উপর দিয়ে জল পেরতে হয়। কোঠা বেস্টনের ভিতর যা আপনার আশ্চর্য লাগবে, সে হচ্ছে একটা অতি প্রাচীন কুয়ো। মেঝের একটা ছোট ফুটোর ভিতর ফুঁ দিয়ে জল পেতে হয়। আর লাকোঠায় হল জামনগরের জাদুঘর। নবম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা মূর্তি আছে এর ভিতর—ছবি মুদ্রা শিলালিপি সৌরাষ্ট্রের মৃৎশিল্প আর নর্মদার তীরে পাওয়া পাথরের জিনিস।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : সোলারিয়ামের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার ভেতর আপনাকে ঘুরিয়ে দেব, দেখিয়ে দেব নতুন আয়ুর্বেদ কলেজ আর রেডিয়াম ইনস্টিটিউট।

সোলারিয়ামের নামই শুধু শুনেছি, আর কিছুই শুনি নি তার সম্বন্ধে। বাঙলায় হয়তো সূর্যভবন বলা যায়, কিন্তু তাতে কি জানা যায় তার পরিচয়! অপরাধীর মতো শাহকে আমি বাধা দিয়ে বললুম : সোলারিয়াম সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন না?

শাহ বিস্মিত হয়ে বললেন : শোনেন নি কিছু!

নিজের অজ্ঞতা স্বীকারে আমার লজ্জা আসে না কোন দিন। আমার বাবা বলতেন যে জ্ঞানার্জনের চাবিকাঠি হল এই প্রণিপাত। জানি না এই কথাটি অসঙ্কোচে স্বীকার করতে হবে। সবাই কিছু জানে, সবাই কিছু শেখাতে পারে, মনে মনে বিশ্বাস করতে হবে এই সত্যটি। জ্ঞানের জগতের বিরাট দরজা তবেই তো খুলবে একটু একটু করে। কোন দ্বিধা না করে আমি বললাম : না।

ভদ্রলোক এই অজ্ঞানতা দেখে আমার নিন্দা করলেন না। বরং উৎসাহিত হয়ে সূর্যভবনের গল্প শোনালেন অনেকক্ষণ ধরে। বললেন : কিছু দিন আগেও সারা পৃথিবীতে মাত্র দুটি সোলারিয়াম ছিল। একটি ফ্রান্সে আর দ্বিতীয়টি সুইজারল্যাণ্ডে। সূর্যের রশ্মি দিয়ে যে চিকিৎসা হয়, তার নাম হেলিওথেরাপি। ক্যান্সার ও হাড়ের টি. বি. প্রভৃতি মারাত্মক রোগও এই চিকিৎসায় সারানো সম্ভব। কোন ওষুধ নেই, কোন অপারেশন নেই, অথচ অসুখ সেরে যায়। আশ্চর্য নয় কি!

তাতে আর সন্দেহ কী!

শাহ বললেন : জামনগরে মাত্র দশটি ঘর। সূর্যের দিকে মুখ, আর মোটা কাচের জানালা। তিনটি লাল কাচের, তিনটি নীল আর বাকি চারটি সাদা। এরই নাম সোলারিয়াম। পৃথিবীর তৃতীয় এটি।

একটু থেমে বললেন : এর প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। বিখ্যাত রণজিৎ সিংজী ছিলেন বর্তমান মহারাজা দিগ্বিজয় সিংজীর বাবা। থুড়ি, কথাটা ঠিক হল না। রণজিৎ সিংজী অবিবাহিত ছিলেন, দিগ্বিজয় তাঁর পোষ্যপুত্র। এক সময় রণজিৎ সিংজীর এই সূর্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল। দেশে সোলারিয়াম নেই বলে তিনি ফ্রান্সে চিকিৎসা করান। ফিরে এসে নিজের রাজ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রজাদের চিকিৎসার জন্যে।

আমার একটি পৌরাণিক কাহিনী মনে পড়ে গেল। কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল। নিরাময়ের জন্য তাঁকে যেতে হয়েছিল বর্তমান কোণারকের নিকট মৈত্রেয় বনে। চন্দ্রভাগায় অবগাহন আর সূর্যের তপস্যায় তিনি রোগমুক্ত হয়েছিলেন। তারপর মুক্তি স্নানের দিন চন্দ্রভাগার তটে পেলেন সূর্যের মনোহর মূর্তি। প্রতিষ্ঠা হল সূর্যের মন্দির, শুরু হল সূর্যের পূজা। প্রাচীন ভারতে এই কি প্রথম সোলারিয়াম নয়! প্রথম সূর্য চিকিৎসা! জবাকুসুমশঙ্কাশকে প্রণাম করে যে জাতির দি'নর শুরু হয়, তারা কি এই মহাদ্যুতিমানের সর্বপাপঘ্ন মূর্তি এর আগে দেখে নি!

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। শাহ আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন : কী ভাবছেন বলুন তো!

কী ভাবছি! তাড়াতাড়ি আমি উত্তর দিলুম : ভাবছি আর একজনের কথা।

শাহ-দম্পতি তাঁদের প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরলেন আমার মুখের উপর।

বললুম : দ্বাপরে এমনি সূর্য চিকিৎসার প্রযোজন হয়েছিল কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের। তাঁরাও এই দেশের রাজা ছিলেন।

শাহ যেন চমকে উঠলেন। বললেন : বলেন কি!

হেসে বললুম : শাম্ব বোকা ছিলেন। তাই চিকিৎসার ফল পেয়ে সূর্যের মন্দির তুলেছিলেন উড়িষ্যার মৈত্রেয় বনে। কিন্তু জামসাহেব

দেশে ফিরে হাসপাতাল গড়লেন নিজের রাজ্যের প্রজাদের উপকারে।

শাহর আগ্রহে শাম্বের গল্প তাঁদের শোনালুম। শাম্ব জাম্ববতীর পুত্র। কিন্তু নিজের পিতা কেন তাঁকে কুষ্ঠরোগ হবার শাপ দিয়েছিলেন, সে কথা বললুম না। মিসেস শাহর সামনে সে গল্প বলা শোভন হত না।

শাহ অভিভূত ভাবে বললেন: এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুশ্চ। জড় ও জগতের প্রাণ হল সূর্য।

আমি শাহর মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। শাহ হেসে বললেন: সোলারিয়ামে পড়েছি এই সংস্কৃত কথাটি।

মামীর কথা আমার মনে পড়ল। এ সব দেখতে তিনি জামনগরে নামবেন না। বললুম: সেখানে কোন মন্দির নেই?

শাহ উত্তর দিলেন: মন্দির! ছোট বড় মন্দিরের সংখ্যা কম করেও শ তিনেক। কাথিয়াবাড়ের কাশী বলে জামনগরকে।

মিসেস শাহ বললেন: শুনলে আশ্চর্য হবেন, মহারাণী ছদ্মবেশে আসেন মন্দিরে। সরকারী মন্দিরে দেবসেবা ঠিক হচ্ছে কিনা, নিজে তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

আশ্চর্য হবার মতো কথা।

শাহ বললেন: সাধুসন্তদেরও আমরা পূজা করি। বোধ হয় জানেন, পরনামা সম্প্রদায়ের জন্ম এই জামনগরে।

পরনামা সম্প্রদায়ের নাম আমি শুনি নি স্বীকার করতেই শাহ বললেন: এঁরা কৃষ্ণের কিরীটের পূজা করেন। এঁদের আচার্য নাকি কিরীটের অবতার ছিলেন। প্রায় চারশো বছর আগে আবির্ভাব হয়েছিল এঁদের আদিকর্তা প্রাণনাথ মহারাজের।

একটু থেমে বললেন: আসুন না জামনগরে। এঁদের প্রধান মঠ পরনামাধামও দেখিয়ে আনব। সেই সঙ্গে খিজ্‌ড়া মন্দির। এক জায়গায় অসংখ্য সাধু দেখবেন।

আমার সাধু দেখবার লোভ নেই মনে করে মিসেস শাহ বললেন: সুরসাগরে পিক্‌নিকের কথা বললে না?

শাহ বললেন: দুদিন থাকলে তো পিক্‌নিক। সত্যি গোপালবাবু, সুরসাগর একটি চমৎকার লেক। মোটরে করে ঘুরিয়ে আনব আপনাকে।

মিসেস শাহ বললেন: জামনগরের বাজারও চমৎকার। কিছু না নেবার মতলব থাকলেও আপনার খালি হাতে ফেরা হবে না। বন্ধান কাপড় সিল্ক আর জরির কাজ আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

শাহ বললেন: আর একটা কথা বোধ হয় জানেন না। জামনগর বন্দরও বটে। সেখানে মুক্তার চাষ আর নুনের পাহাড়।

জামনগর যে সমুদ্রের তীরে নয়, সে কথা আমি জানতুম। কিন্তু সমুদ্র কত দূরে, সে কথা জেনে নেওয়া হল না। তার আগেই একটা স্টেশনে পৌঁছে গেলুম।

এখানেও আমার নামা হল না। শাহ বাধা দিলেন। বললুম: থার্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। এ আমার অপরাধ হচ্ছে।

শাহ বললেন: আপনি তো শখ করে এই কাজ করেছেন। চেকার এলে না হয় টিকিটটা বদলে নেবেন।

বললুম: পয়সা কোথায়?

একটা চোখ ছোট করে ভদ্রলোক বললেন: মামা দেবেন।

মিসেস শাহ বললেন: ওঁদের ঐ একটি মাত্র মেয়ে, তাই না!

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। বললুম: আপনারা তো ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন!

মিসেস শাহ আমার উত্তরের আশা করছিলেন। তাই উত্তর দিলেন না। কথা কইলেন শাহ, বললেন: আরও একটু কাজ আছে।

এর পরে কোন প্রশ্ন করা সৌজন্য-বিরুদ্ধ হত। পরের পারিবারিক

ব্যাপারে নীরব থাকাই রীতি। তাই চুপ করে ছিলুম। শাহ বললেন: বোনের বিয়ের কথা চলছে। এইবারে ব্যবস্থা পাকা করব।

মিসেস শাহ হাসছিলেন মৃদু মৃদু। তাই দেখে শাহ বললেন: হাসছ যে!

ভদ্রমহিলা বললেন: তোমার কথা শুনেই হাসছি। গোপালবাবু নতুন মানুষ। তাঁর সামনে ফাঁস করে দেব কিনা বুঝতে পারছি না।

আমি বলে উঠলুম: এখনও আমি পুরনো হই নি কি

মিসেস শাহ একবার স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন কী বুঝলেন তিনিই জানেন, উত্তর দিলেন আমাকে। বললেন: এ আপনাদেরই মতো বিয়ে। ওঁর ব্যবস্থার অপেক্ষায় আর কিছুই নেই।

তাই নাকি!

মিসেস শাহ বললেন: আমাদের মতো মূর্খ নয় তো! লেখাপড়া জানা মেয়ে। নিজেরাই বিয়ে পাকা করে ফেলেছে।

শাহ যেন গর্জন করে উঠলেন: তাতে ক্ষতি কী হয়েছে শুনি!

হবে আর কী। তোমার অপেক্ষায় যে তাঁরা নেই, এই কথাটুকুই শুধু জানিয়ে দিলাম।

আমি সমর্থন জানিয়ে বললুম: আপনাদের কাজ কমিয়ে রেখেছেন, সে তো ভালই।

মিসেস শাহ বললেন: আমাদের দিনে কী কড়াকড়ি ছিল জানেন!

আমি কী করে জানব! তাই চুপ করে রইলুম।

তিনি নিজেই বললেন: বিয়ে স্থির করার অধিকার আমাদের বাপ-মায়েরও ছিল না।

সে কি!

সত্যি বলছি। আমাদের বিয়ে স্থির করতেন আমাদের কুলগুরু। কুষ্ঠি ঠিকুজী মিলোবার পরে অভিভাবকদের বলেছেন বিয়ে অনুমোদনের জন্যে এ দেশে এই নিয়ম ছিল।

শাহ বললেন : পাকা দেখা আমাদের একটা বড় অনুষ্ঠান। বিয়ের মতোই গম্ভীর। বর কনে সেদিন বাগ্‌দত্ত হবে ছেলের বাড়িতে।

বিয়ের গল্প স্বাতির ভাল লাগে। তাই বললুম : পাকা দেখা তো আমাদের মধ্যেও আছে। কোন কোন সমাজে লেখাপড়া হয় বলেও শুনেছি।

শাহ বললেন : ঠিক বলেছেন। লেখাপড়া আমাদের মধ্যে একটা অপরিহার্য জিনিস। সে দলিলে পাল্লার উল্লেখ থাকবে।

পাল্লা কী?

শাহ বললেন : স্ত্রী-ধনের পরিমাণ। পাঁচশো, হাজার, কখনও বেশিও হয়। এটা দেওয়া হয় সাধারণত অলঙ্কারে। তারপর যথারীতি তিলক আশীর্বাদ।

মিসেস শাহর বয়স এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু কথা কইছিলেন এমন ভঙ্গিতে যেন তিনি অন্য যুগের মানুষ। বললেন : আমাদের সময়ের কড়াকড়ির কথা আর বলবেন না। এঁকে আমি বাগ্‌দত্তা হবার আগেও দেখি নি, পরেও দেখি নি। দেখাশুনো একটা ভারি নিন্দার ব্যাপার ছিল।

আমার মনে হল যে মিসেস শাহর কাছে এ একটা পরম ক্ষোভের বিষয় হয়ে আছে। বিশেষত আজকের এই স্বাধীনতার দিনে তাঁর নিজের অতীতটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাবছিলুম তাঁকে সান্ত্বনা দেব। কিন্তু তার আগে শাহ বললেন : দেখ নি মানে! আমার মামার বাড়িতে যে দিন নিমন্ত্রণে এসেছিলে, সে দিন!

বলে শাহ তাঁর ঝকঝকে দাঁতের সারি নিঃশব্দে উন্মোচন করলেন, আর লজ্জা পেলেন মিসেস শাহ। সে ঘটনা আমার জানার কথা নয়, তবু বুঝতে পারলুম যে সেই মিলনের স্মৃতি এঁদের মনে অক্ষয় হয়ে আছে, থাকবেও।

আমার দিকে ফিরে শাহ বললেন : এও এ দেশের একটা রীতি।

বিয়ের আগে বরপক্ষের কোন আত্মীয়ের বাড়িতে কন্যাপক্ষকে নিমন্ত্রণ করা হয়। অবশ্য বাগ্‌দত্ত হবার পরে। আমার মামা প্রগতিপন্থী। তিনি আমাদের এই সুযোগটি করে দিয়েছিলেন।

বলে হাসতে লাগলেন।

মিসেস শাহ লজ্জা পেলেন না, বললেন : তুমিই তো মামার হাতে পায়ে ধরে এই ব্যবস্থা করেছিলে!

এর উত্তর শাহ আমায় দিলেন, বললেন : বুঝলেন গোপালবাবু, এ হল তর্কের কথা। আমাদের বাড়ি এলে আপনাকে মামার কাছে নিয়ে যাব, সেখানেই এর মীমাংসা সম্ভব।

মিসেস শাহ আপত্তি জানিয়ে বললেন : কী করে হবে! মামা তোমার, তিনি আমার পক্ষ কেন নেবেন!

গম্ভীর ভাবে শাহ বললেন : বুড়ো মানুষ যে মিথ্যে বলবেন না, এ ভরসা তোমার নেই!

তাঁর কথায় আমার আর একটি গল্প মনে পড়ল। সেবারে যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম, পথে যোগ দিয়েছিলেন কালীঘাটের হালদার মশাই। বোধ হয় গোদাবরী স্টেশনে আমাদের গাড়িতে উঠেছিলেন। তাঁর মুখে দক্ষিণ-ভারতীয় বিবাহের যে গল্প শুনেছি, তাতে আশ্চর্য হয়েছিলুম একটা সংবাদ জেনে। ও দেশে নাকি সম্পর্কে ভাইবোনের ভিতর বিবাহে বাধা নেই। বিয়ে হয় মামা-ভাগ্নীতেও। কী মনে করে সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা করলুম। শাহ জিভ কেটে বললেন : ছি-ছি, মামা ভাগ্নীর আবার বিয়ে হয় কী করে!

সেই সঙ্গেই স্বীকার করলেন যে অন্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে।

মিসেস শাহ বললেন : আমাদের বিয়েতে আবার অনেক কাজ। প্রথমে মাউশালা অনুষ্ঠান।

সে আবার কী!

উত্তর দিলেন শাহ। বললেন: মামার বারোটা বাজাবার ব্যবস্থা। নিজে যখন ভাগ্নে ছিলুম, তখন ভালই লেগেছিল। এখন মামা হয়ে দেখছি, এ কত বড় জ্বালা।

আমি অনেক আগ্রহ নিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

শাহ বললেন: বর কনে দুজনের মামারই সমান বিপদ। প্রচুর উপহার দিতে হয়। তারপর বরকে ঘোড়ায় আর কনেকে পাল্কিতে চড়িয়ে শোভাযাত্রা।

মিসেস শাহ বললেন: আজকাল মোটরে।

শাহ বললেন: মাউশালা হবে বিয়ের দু-তিন দিন আগে। তারপর পিথি। আগে গায়ে হলুদ। সেই সুগন্ধি হলুদও পাঠাবেন মামারা।

একটু থেমে বললেন: বিয়ের দিনেও রেহাই নেই। বরের মামা থাকবেন শোভাযাত্রার সামনে।

হেসে বললুম: এতে ভয় পাবার কী আছে?

ভয় পাবার নেই! উপহারের পর্বটা কি সোজা! আমাদের মতো চাকুরে লোকের সে মরণ যন্ত্রণা। ফাঁকি দেবার উপায় নেই সামাজিক মর্যাদার জন্যে।

মিসেস শাহ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের বিয়েয় নাকি গণেশ পুজো নেই?

বিয়েতে কেন গণেশ পুজো হবে! গণেশ তো দোকানের ঠাকুর।

উভয়েই আশ্চর্য হলেন। তাই দেখে আমি বললুম: আমাদের বিয়েতে হয় নারায়ণ পুজো।

শাহ বললেন: এ দেশে বিয়ের তিন দিন আগে গণেশ আসনে বসবেন। আর শেষ অনুষ্ঠান পর্যন্ত প্রতি দিন তাঁর পুজো।

আশ্চর্য ব্যাপার! প্রজাপতির নির্বন্ধে পুজো পাচ্ছেন কোথাও নারায়ণ, কোথাও গণেশ। অথচ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুজো নেই কোনখানে।

এর পরের গল্পটি শোনালেন মিসেস শাহ। সে প্রায় আমাদের দেশের বিয়ের মতোই। বর আসবে পীতাম্বর পরে, মাথায় পাগড়ি আর কোমরে তলোয়ার। ঘোড়ায় না চড়ে মোটরেই আসছে আজকাল। কনে পরবে পালেতর, মানে সাদা সিল্কের শাড়ি। স্ত্রী আচারের সময় কনেই পরাবে বরের গলায় ফুলের মালা। সম্প্রদান ও হোম আমাদেরই মতো। গাঁটছড়া বেঁধে সাতপাকের নাম মঙ্গল ফেরা। তবে হোমের আগুনকে এরা চারবার প্রদক্ষিণ করে। ঠিক এরই আগে কনসার নামে আর একটা অনুষ্ঠান আছে। তখন উপবাসী বর কনে মিষ্টিমুখ করায় একজন আর একজনের। এদের বিদায়ের পর্বটা নাকি আমাদের মতো মর্মন্তুদ নয়। ঢাক-ঢোলের বদলে গান-বাজনা দিয়ে চাপা দেয় কান্নার শব্দ।

শাহ বললেন: বিয়ে ঠিক হলে আপনাকে খবর দেব। নিজের চোখে সব দেখে যাবেন।

বাঙলা আর সৌরাষ্ট্রের দূরত্ব আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। বললুম: শখ তো আছে! আর শুধু আমারই নয়, আমাদের সবারই শখ আছে জানি। কিন্তু আবার এদিকে আসা সম্ভব হবে কিনা জানি না।

শাহ নিঃশব্দে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: তাহলে ফেরার পথে এক কাজ করবেন।

কী?

এবারের মতো গোটা রাজ্যটা ডিঙিয়ে ফিরে যাবেন না। দেখবার মতো অনেক সুন্দর জায়গা আপনারা না দেখেই চলে এসেছেন।

এ কথায় আমি বিস্মিত হয়েছি দেখে বললেন: পথে আবু পাহাড় নিশ্চয়ই দেখেছেন!

বললুম: দেখেছি।

কিন্তু অম্বাজীর মতো পবিত্র তীর্থ নিশ্চয়ই দেখেন নি।

আমি নিঃশব্দে মেনে নিলুম এই অভিযোগ।

শাহ বললেন: আবু রোড রেল স্টেশন থেকে বারো মাইল দূরে

অম্বাসুর পাহাড়ে একটি বিখ্যাত তীর্থ। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই, বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত দেওয়ালের এক স্থানে দেবীর পূজা হয়। তবে এই মন্দির দেখেই ফিরে আসবেন না। কিছু দূরে কুম্ভারিয়ার জৈন মন্দিরটিও দেখবেন। ত্রয়োদশ শতাব্দে বিমল শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের কারুকার্যও দিলওয়ারার মতো সুন্দর। আর এরই নিকটে সরস্বতী নদীর উৎসের কাছে বোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এ সবের খবর তো আমরা জানতাম না!

শাহ বললেন: টুরিস্টরা আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির দেখেই নেমে আসে। এই অঞ্চলের খোঁজ পায় না।

আমি বললুম: আগে জানলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এই অঞ্চলটা আমরা দেখে আসতে পারতুম। মামী খুশী হতেন অম্বাজী দর্শন করে।

শাহ বললেন: মেহসানার কাছেও দুটি দর্শনীয় স্থান আছে। সিধপুর আর তরঙ্গা।

এ সম্বন্ধে আরও কিছু শোনবার জন্য আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তাই দেখে তিনি বললেন: মেহসানা থেকে একুশ মাইল দূরে সিধপুরে দেখবেন একটি ভাঙা মন্দির। দশম শতাব্দে সোলাঙ্কি রাজা মুলরাজ সরস্বতী নদীর তীরে নির্মাণ করেছিলেন এই রুদ্রমল মন্দির। দুশো বছর পরে সিদ্ধরাজ জয়সিংহ এটি সংস্কার করেন আর ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষ দিকে আলাউদ্দীন খিলজী এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। মন্দিরের সামান্যই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তার থেকেই তার অসামান্য সৌন্দর্যের পরিচয় পেয়ে যাবেন। পরবর্তীকালে অনেক নতুন মন্দিরও এখানে নির্মিত হয়েছে।

আর তরঙ্গায়?

সেখানেও একটি প্রাচীন মন্দির আছে। দ্বাদশ শতাব্দে

কুমারপাল এটি নির্মাণ করেন। আর এর সংস্কার হয় আকবর বাদশাহর আমলে। এই মন্দিরের ছবি দেখলে আপনি সোমনাথের মন্দির বলে ভুল করবেন।

সত্যি!

শাহ বললেন: কোন টুরিস্ট বই-এ ছবি দেখলে আমার কথা আপনি মিলিয়ে দেখবেন।

আমি ভেবেছিলুম যে ক্যাপ্টেন শাহর গল্প বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলুম যে এখনও তাঁর বলার কথা অনেক আছে। তাই বললেন: আপনারা দ্বারকা থেকে তো সোমনাথে নিশ্চয়ই যাবেন।

বললুম: হ্যাঁ।

শাহ বললেন: তাহলে তো সোমনাথ দেখেই আপনারা আমেদাবাদে ফিরবেন। দিন কয়েক থাকবেন আমেদাবাদে, আর চারিধারে ঘুরে দেখবেন।

আমি বললুম: কী কী দেখতে হবে বলুন।

শাহ বললেন: আমি আপনাকে চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে লাল সরোবর নামে পাখির অভয়ারণ্য দেখতে বলব না। দেখতে বলব পঞ্চাশ মাইল উত্তরে গিয়ে লোথাল নামে একটি অতি প্রাচীন স্থান। মহেঞ্জোদারো ও লোথাল শব্দের একই অর্থ। ১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পায় যে সভ্যতা সহসা বিলুপ্ত হয়েছিল, লোথালে তাই বেঁচে ছিল আরও পাঁচশো বছর। ১৯৫৪ সালে মাটির নিচে থেকে এই সভ্যতার অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে।

সবিস্ময়ে আমি বললুম: আপনি গেছেন সেখানে?

শাহ বললেন: না। এখনও সে সুযোগ পাইনি। তবে যাবার ইচ্ছা আছে। শুনেছি, লোথাল সে যুগে সমুদ্রের তীরে একটি বন্দর ছিল। তার জাহাজঘাটা আবিষ্কৃত হয়েছে।

তারপর ?

আর একটি প্রাচীন মন্দির না দেখে ফিরবেন না। মধেরার সূর্য মন্দির, কিন্তু এখন তার ভগ্ন দশা। অনহিলওয়াড়া পাটনের সোলাঙ্কি রাজারা এটি নির্মাণ করেছিলেন। কোনারকের মতো অপরূপ তার স্থাপত্য শিল্প, একটি ঘাট বাঁধানো সরোবর তার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

প্রশ্ন করলুম : আমেদাবাদ থেকে কত দূরে এই মন্দির ?

শাহ বললেন : উত্তর-পশ্চিমে ষাট মাইল দূরে। কিন্তু সেখানে গেলে মাইল আঠারো দূরে পাটন নামে একটি হিন্দু রাজাদের প্রাচীন রাজধানীও দেখে আসবেন। মেহসানা থেকেও এই জায়গাটা দূরে নয়, মাইল পঁচিশের মতো বলে শুনেছি।

আমি বললুম : এক যাত্রায় কি এ সব দেখা সম্ভব ?

শাহ বললেন : আমেদাবাদে জেনে নেবেন।

বললুম : জেনে নিতেই হবে। এ সব না জানলে তো ভ্রমণ আমাদের সম্পূর্ণ হবে না !

শাহ বললেন : দেখে গেলে আনন্দও সম্পূর্ণ হবে।

সত্যি কথা। জানার চেয়ে দেখায় আনন্দ বেশি।

৫

জামনগরে গাড়ি পৌঁছল সকাল সাড়ে নটায়। এখানে ক্যাপ্টেন শাহর গাড়ি কাটবে। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে আমাকে ছুটতে হল মামার কাছে। দুপুরের আহার আমাদের এইখানেই সেরে নিতে হবে। সামনে আর কোন স্টেশনে রিফ্রেশমেন্ট রুম নেই। তাই খাবারের জন্য এখানেই অর্ডার দেওয়া আছে। শুধু মাংস ভাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও দেখা নেই। এত সকালে খেতে হবে বলে মামা বিরক্ত হয়েছিলেন। এখন বিরক্ত হলেন খাবার আসছে না দেখে। রেল কোম্পানিকেই দায়ী করলেন ডাইনিং কার না দেবার জন্য। বললেন: বুঝলে গোপাল, এ দেশ কোন দিন সভ্য হবে না।

বললুম: হবে মামাবাবু, দু বেলা পেট ভরে খেতে পেলেই সভ্যতা শিখবে।

মামা বুঝি আরও বিরক্ত হলেন। বললেন: পেট ভরে খাবার সঙ্গে সভ্যতার কী সম্পর্ক?

সম্পর্ক নেই! খালি পেটে কি সভ্য থাকা যায়! ক্ষিধে পেলেই যে চেঁচাতে ইচ্ছে করে।

হুঁ।

বলে মামা জানালার বাহিরে পাইপের ছাই ঝাড়তে লাগলেন।

বললুম: এত বড় ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে আপনারা কজন যাত্রী! সবাই তো থার্ড ক্লাসে চলেছে। তারা নিজের মোটঘাট নিজেরা বইছে, আর গামছায় বেঁধে শাক আর রুটি এনেছে রাত্তিরে সেঁকা। ডাইনিং কারে খাবে, এমন পয়সা কোথায় এই হতভাগাদের!

মামা আর একবার বললেন : হুঁ।

স্বাতি বলল : কাউকেই তো আসতে দেখছি নে গোপালদা।

মামী বললেন : দ্বারকায় পৌঁছবে কি বেলা দুটোর পরে ?

মামীকে হাঁ বলে আমি এগিয়ে গেলুম। রিফ্রেশমেন্ট রূমের সামনে পেলুম ম্যানেজারকে। তিনি বললেন, খাবার অর্ডার নাকি পান নি।

সর্বনাশ ! কিছুই পাব না তাহলে ?

কেন পাবেন না ! কী চাই বলুন !

প্রয়োজনটা আমার জানা আছে। তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক আশ্বাস দিয়ে বললেন : এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তখনই পাঠালেন না, পাঠালেন গাড়ি ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে। পরের স্টেশনেই বাসন নিতে আসবে। মামার গাড়িতেই আমি তাই রয়ে গেলুম।

মামী বললেন : রামখেলাওন কিছু খাচ্ছে তো !

এ কথার উত্তর দিল স্বাতি, বলল: না খেলেও ক্ষতি নেই। খাবার পয়সাটা বেঁচে গেলেই সে বেশী খুশি হবে।

এই পয়সা বাঁচানোর পিছনে যে ত্যাগ আছে, স্বাতি সে কথা জানে না। সে ভাবে, পয়সা বলেই এদের এত প্রিয় ; আত্মাকে কষ্ট দিয়েও এরা পয়সা জমাবে, যক্ষের মতো আগলাবে, মরবে হয়তো মাটির নিচে পুঁতে রেখে। এদের মনের কথা যদি সে জানত, তবে এমন ভাবতে পারত না। দেশে এর দুঃস্থ পরিবার, সেই পরিবারের দু মুঠো অন্নের জন্য এরা বিদেশে পড়ে আছে। কষ্টেসৃষ্টে এক হাল জমি কিনতে পারলে ছেলেটাকে বিদেশে যেতে হবে না। কিংবা শেষ বয়সটা দেশেই কাটাতে পারবে পরিবারের সঙ্গে। সেই আশায় তারা বুক বাঁধে, সেই স্বপ্নে তারা শক্তি পায়। এক পয়সার খইনি টিপে যদি সারা দিনটা কাটানো যায়, চার পয়সার চা তারা মুখে তুলবে না।

স্বাতি কী বুঝল সেই জানে, আমার দিকে চেয়ে বলল : তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে গোপালদা।

আমি এ কথা মেনে নিলুম না, বললুম : কই, না তো!

স্বাতি হেসে বলল : বুঝেছি।

বোঝাই তো দরকার। কিন্তু সত্যিই কি সে কিছু বুঝেছে!

পরের স্টেশনেই বেয়ারা এল এঁটো বাসনপত্র নামিয়ে নিতে। পকেট থেকে টাকা বার করে মামা বললেন : কত পয়সা?

বাসনপত্র গোছাতে গোছাতেই বেয়ারা বলল : পাঁচ টাকা।

এ অনেকদিন আগের ঘটনা। তখন পাঁচ টাকার মূল্য ছিল অনেক। তাই আমি বললুম : সে কি! তোমার বিল কোথায়?

বিলের নামে বেয়ারা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল : তাড়াতাড়িতে নেওয়া হয় নি।

রেলের এক ভদ্রলোকের কাছে সেবারে শুনেছিলুম যে বিল ছাড়া এক পট চা-ও বাহিরে যায় না। বিল না দেখে আমরা যেন পয়সা কিছুতেই না দিই। কথাটা মনে পড়তেই বললুম : বিল না দিলে তো পয়সা কিছুতেই পাবে না।

বেয়ারার জবাব ছিল তার ঠোঁটে। বলল : টাইম টেবলে তো লেখাই আছে, তাই দেখে দিয়ে দিন।

টাইম টেবল মামার অ্যাটাচিকেসের ভিতর, আর স্টেশন হল নগণ্য। এত কাণ্ড করতে গেলে গাড়িই ছেড়ে দেবে। মামা বললেন : মরুকগে, পাঁচ টাকাই দিয়ে দিচ্ছি।

বলে মামা একখানা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিলেন। আর কিছু দিলেন না। বললেন : বকশিসটা ওর মারা গেল।

বললুম : মারা কোথায় গেল! চার প্লেট মাংস ভাতের দাম তো তিন টাকা! দু টাকা ওর নিজের পকেটে গেল!

মামা চমকে উঠে বললেন : বল কী, এত ঠকাল লক্ষ্মীছাড়া!

মামী কথা বলতেই তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। এক রকমের

অদ্ভুত আনন্দ দেখলুম তাঁর দু চোখে। বললেন : লোকে তোমাকে তো এমনি করেই ঠকায়।

মামা বোধ হয় লজ্জিত হলেন, বললেন : দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি।

বলে টেবিলের উপর থেকে তামাকের পাইপ আর পাউচ সংগ্রহ করলেন।

মামী বললেন : কী মজা দেখাবে শুনি!

পাউচ থেকে তামাক বার করতে করতে মামা বললেন : দিল্লীতে ফিরে ওর কোম্পানিকে লিখব কড়া করে।

ট্রেন তখনও ছাড়ে নি। নিচে আরও দু-একজন বেয়ারাকে দেখলুম ছুটোছুটি করে বাসন নামাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে তাদের আমি ঘটনাটা বললুম। একজনকে লজ্জিত হতে দেখলুম। বলল : ম্যানেজারকে আমি বলে রাখব। ফেরার পথে দু টাকা আপনি ফেরত নিয়ে নেবেন।

খুশী হয়ে মামা বললেন : যাবে কোথায়!

আমি জানতুম যে ও টাকা গেছে। জামনগরে নামাও হবে না, চাওয়াও হবে না ও টাকা। তবু কোন প্রতিবাদ করলুম না। মামার তৃপ্তিটুকু নষ্ট হত তাতে। কিন্তু মামী চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন : কোথায় যাবে তা জানা আছে।

মানে?

মামা যেন রুখে উঠলেন।

শান্ত গলায় মামী বললেন : সেবারে দেখি নি! দশ টাকার নোট নিয়ে বেয়ারা সরে পড়ল। পারলে তার কিছু করতে!

তাচ্ছিল্যের স্বরে মামা বললেন : ছেড়ে দিলুম। সামান্য কটা টাকার জন্যে—

বাধা দিয়ে মামী বললেন : আজকের দু টাকাও তো সামান্য টাকা।

স্বাতি হাসছিল। মামা কোন উত্তর দিলেন না দেখে বলল :

সেবারে এমনি ট্রেনের বেয়ারা দশ টাকার চেঞ্জ আর ফেরত দিল না।

ততক্ষণে মামা তাঁর পাইপ ধরিয়ে ফেলেছিলেন। খানিকক্ষণ ধোঁয়া নেবার পরে বললেন: কেন এরা এমন হয় বলতে পার?

শুধু অভাবে, এ কথা বলতে পারলুম না। সে মিথ্যা হত। অভাব মানুষের স্বভাব কেন নষ্ট করবে! দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করাই তো এ দেশের ধর্ম। ঐশ্বর্যকে অবহেলা করেই তো এ দেশের মানুষ নমস্য হয়েছেন! এ আদর্শ কি আজ ডুবে যাবে! সভ্যতার নামে কি আমরা বন্য হব! চট করে আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না। মামা বললেন: আমার মনে হয় যে এ হল বিনে রক্তপাতে স্বাধীন হবার ফল।

হবেও বা।

মামা বোধ হয় আমার উত্তর চান নি। বললেন: স্বাধীন জাত বলে আজ যারা গর্ব করতে পারে, তারা স্বাধীনতা পেয়েছে বুকের রক্ত ঢেলে। স্বাধীনতার মর্ম তারা বোঝে। এমন হীন কাজ তারা কোন দিনও করবে না।

ভারতবর্ষের বাহিরে আমি কখনও যাই নি। কলকাতা থেকে এত দূরেও এই প্রথম আসছি। এসব বিষয়ে আমার জ্ঞান আর কতটুকু! আমি নীরব হয়ে রইলুম।

মামীর এ প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না। বললেন: দ্বারকায় আমরা কোথায় উঠব?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি তাকালুম স্বাতির দিকে। বড় বিমর্ষ দেখাল তাকে। বলল: দ্বারকায় কোন হোটেল নেই গোপালদা?

লজ আছে।

লজ মানে?

ভাল খেতে দেয় সেখানে। বোধ হয় থাকতেও দেয়।

স্বাতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল : ধর্মশালার চেয়ে সে কি ভাল হবে না ?

মাথা নেড়ে বললুম : বোধ হয় না।

পরিষ্কার দেখতে পেলুম যে স্বাতি বড় নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ধর্মশালাকে তার বড় ভয় হয়। ধর্মশালার কথা ভাবতে গেলেই তার কন্যাকুমারীর কথা মনে পড়ে। কেপ হোটেলের কাছে সেই ধর্মশালাটা সেদিন সত্যিই বড় বেয়াড়া মনে হয়েছিল।

মামারও বোধ হয় এমনি কিছু মনে হল। বললেন : এখানে রাত্রিবাস একটা বিভীষিকাই বটে।

আমি একটু ভরসা দেবার চেষ্টা করে বললুম : তোতাদ্রি মঠ ভালই মনে হচ্ছে।

বলে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করলুম। আজমীরের সদানন্দবাবু এই কাগজখানি দিয়ে বলেছিলেন বাঙালীদের আর কোন কষ্ট সেখানে নেই।

কিন্তু পুরনো ভ্রমণ-কাহিনীতে কষ্টের কথা পড়েছি। পড়েছি পাণ্ডাদের বাঙালী বিদ্বেষের কথাও। তাই নিজেও খুব নির্ভয় হতে পারছিলুম না। মামার অসুবিধার কথা আমি জানি। বাড়িতে স্প্রিঙের খাটে শোবার অভ্যাস। দিল্লীতে নেওয়ারের খাটেও তাঁর নাকি কষ্ট হয় না। কিন্তু ধর্মশালার চৌকিতে বা মাটিতে তাঁর ঘুম হয় না। স্বীকার না করলেও মামীরও এই কষ্ট, শক্ত মাটিতে তাঁরও শুতে কষ্ট হয়। কিন্তু তিনিই সাহস দিয়ে বললেন : একটা রাত কোন রকমে কেটে যাবে।

মামীর দুর্বলতার কথা আমি জানি। তাঁর জল চাই। ভাল করে স্নান করতে পারলেই তাঁর মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বললুম : তোতাদ্রি মঠে জলের অভাব আমাদের হবে না। শুনেছি ভাল স্নানের ঘরও একটা আছে।

বলে হাতের কাগজখানা থেকে খানিকটা পড়ে শোনালুম : 'বাঙালী

সাধুর দ্বারা প্রতিশ্রুত মঠ ও ধর্মশালা নির্মাণ হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। স্টেশন হইতে শহরে যাইবার মধ্যপথে এই মঠ অবস্থিত ; মঠ হইতে শ্রীশ্রীদ্বারকানাথের মন্দির অর্ধ মাইল মাত্র। শ্রীশ্রীদ্বারকা ধামে বহু জলকষ্ট আছে, কিন্তু আশ্রমের মধ্যে ছয়টি জলকূপ থাকাতে যাত্রীদের আদৌ জলাভাব হয় না।'

মামা বাধা দিয়ে বললেন : ব্যস বাস, ওতেই হবে। তোমার মামীর আর কিছু চাই না। ছ ছটা জলকূপ !

বলে হাসতে লাগলেন।

স্বাতি বলল : দ্বারকা শুনেছি গাইকোয়াড়ের বরোদা রাজ্যে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার মতো একটা ভাল হোটেল করে নি ?

কোন্ তীর্থে ভাল হোটেল আছে বল ! যেখানে আছে, তা তীর্থ বলে নয়, বেড়াবার ভাল জায়গা বলে।

স্বাতি বোধ হয় উপভোগ করল আমার কথা। বলল : তাই কি !

মামাও বললেন : কথাটা মন্দ বল নি।

ঘন ঘন কয়েকবার পাইপ টেনে বললেন : মসুরি নৈনিতাল রাণীক্ষেত আলমোড়ায় আছে অসংখ্য হোটেল, ভাল ভাল দেশী ও বিদেশী হোটেল। চটি আছে কেদার বদরীর পথে। কৈলাসের পথে শুনেছি তাও নেই।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম : অমন দুর্গম স্থানে কে হোটেল করবে বলুন, আর সেই হোটেল চলবেই বা কেন ! তার চেয়ে মাদুরা রামেশ্বরের কথা বলুন, বলুন দ্বারকা সোমনাথের কথা।

মামা উত্তর দিলেন না, কিন্তু কথা কইল স্বাতি। বলল : অর্থের সঙ্গে কি তীর্থের কোন শত্রুতা আছে গোপালদা ?

ভাববার কথা। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য বলেই তো মনে হয়। যাদের অর্থ আছে প্রচুর, তারা অবসর যাপনে যায় পাহাড়ে কিংবা সমুদ্র তীরে। যাদের অর্থ নেই, সামর্থ্যও কম, তারাই আসে তীর্থে।

হঠাৎ আমার মিশ্র সাহেবের মায়ের কথা মনে পড়ল। আশি বছরের উপর তাঁর বয়স, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বুড়ী তাঁর ছেলে বউ-এর সঙ্গে কেদার বদরী ঘুরে এলেন। ফিরে এসে মিশ্র সাহেব বললেন, অর্ধেক পথ বুড়ী হেঁটে উঠেছিলেন। কথাটা বিশ্বাস করেছিলুম অনেক দিন বুড়ীকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে স্বাতি বলল: ঠিক বলি নি গোপালদা?

চট করে তার কথাটা মেনে নিতে পারলুম না।

মামা বললেন: তীর্থের লোভ হয় বুড়ো বয়সে, ভোগের দিন ফুরিয়ে যাবার পর। ছোটখাট অসুবিধার কথা তখন আর মনে থাকে না।

মামী বললেন: হিন্দুর ভেতর ধর্মভাবটাই কমে যাচ্ছে। খ্রীষ্টানদের দেখ, হাজার কাজ থাকলেও রোববার সকালে সেজেগুজে তারা গির্জায় যাবেই। মোছলমানদেরও আছে একটা বার। কোন্ বারটা যেন?

জুম্মা শুক্রবার।

মামী বললেন: যখন আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কোচোয়ান আর সইসকে দেখতাম যখন-তখন নমাজ পড়ছে।

এ ব্যাপারে মুসলমানদের চেয়েও খ্রীষ্টানদের ব্যবস্থা ভাল। মুসলমান পুরুষরা যায় মসজিদে নমাজ পড়তে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা যায় মেয়েপুরুষে। সমস্ত বয়সের মেয়েপুরুষ এক সঙ্গে। অথচ জীবনে একবারও মন্দিরে যায় নি, এমন হিন্দুর অভাব নেই আজকের ভারতে। কাজেই প্রতিবাদ করবার উপায় নেই।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছিল। মামী একখানা চাদর নিয়ে শোবার উদ্যোগ করলেন। মামাও তাঁর তামাক শেষ করে এনেছেন।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। গাড়ি থামলেই নিজের কামরায় যাব। তৃতীয় শ্রেণীর কোন কামরা। মামা আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কোন আপত্তি করলেন না। খাতি যেন দেখতেই পায় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে বসে রইল।

গাড়ি থামতেই আমি নেমে গেলুম।

৬

ভাবছিলুম কোন্ গাড়িতে উঠব। ঠিক এমনি সময় হুঙ্কার শুনলুম এক বাঙালী ভদ্রলোকের: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভুল করেছেন, ব্রাহ্মণ হয়ে এই কথা আমি বিশ্বাস করব।

আমি আর অপেক্ষা করলুম না। ঠেলে-ঠুলে কোন মতে সেই গাড়িতেই উঠে পড়লুম। গাড়িতে জায়গা বেশি ছিল না। তবু একটু-খানি বসবার স্থান পেয়ে গেলুম। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক নিজে সঙ্কুচিত হয়ে আমায় বসতে দিলেন। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বসলুম।

এইবারে তিনি সেই উত্তেজিত ভদ্রলোকের উত্তর দিলেন, বললেন: আপনি অকারণে রাগ করছেন। আমি তো শ্লোকটি বললুম আপনাকে। আপনি এর অর্থ আমাকে বলে দিন।

আমি তাঁর দিকে চাইতেই আমাকে বললেন: কৃষ্ণের সময় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবত ও একাধিক পুরাণে আছে যে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর থেকেই কলি যুগের আরম্ভ।

বললুম: ঠিকই তো, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মানেই তো দ্বাপরের শেষ।

আমিও তো সেই কথাই বলছি।

বললেন সেই ভদ্রলোক, যাঁর হুঙ্কার শুনে আমি এই গাড়িতে উঠেছি।

আপনার কথার তো আমি প্রতিবাদ করছি নে মুখুজ্জে মশাই, কিন্তু আপনি আমাকে এই শ্লোকটির মানে বলুন।—

অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

জিজ্ঞাসা করলুম: এ কি মহাভারতের শ্লোক?

ভদ্রলোক বললেন : না। শ্লোক ব্রহ্মপুরাণের। আমি পড়েছি স্মার্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে।

মুখুজ্জে মশাইকে বড় বিপন্ন দেখাল। বললেন : লেখাপড়া শিখে এমন বেয়াড়া তর্ক করবেন না পরিতোষবাবু। এ দেশের ছোট ছেলেরাও জানে যে কৃষ্ণ দ্বাপরের মানুষ।

পরিতোষবাবু বললেন : সে কথা আমি তো অস্বীকার করছি না। আমি জানতে চাইছি যে এই শ্লোকটি আপনি অস্বীকার করছেন কোন্ যুক্তিতে।

মুখুজ্জে মশাই বললেন : যে যুক্তিতে বলি এক আর একে দুই হয়।

পরিতোষবাবু হাসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন : আপনি কী বলেন ?

বললুম : গোলমাল বাধছে এই কলৌ যুগে কথাটি নিয়ে। তাই না ?

খুশী হয়ে পরিতোষবাবু বললেন : ঠিক ধরেছেন। এই শ্লোক অনুসারে কৃষ্ণের জন্ম অষ্টাবিংশতিতম কলি যুগে।

বললুম : অষ্টাবিংশতিতম কলি যুগে কথাটাও যে বড় গোলমেলে !

মুখুজ্জে মশাই প্রসন্ন ভাবে জবাব দিলেন : দেখুন তাহলে।

কিন্তু আপত্তি জানালেন পরিতোষবাবু, বললেন : গোলমেলে কেন ? কলি যুগ কি একটা ! সাতাশটা কলির পর জন্মালেন কৃষ্ণ।

আমি বললুম : এই সাতাশ যুগ লৌকিক না দিব্য, তাও ভেবে দেখা দরকার।

দুজনে এক সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : শাস্ত্র বলে, লৌকিক চার যুগে এক দিব্য যুগ হয়। এই হিসেবে সাতাশ দিব্য যুগের পর অষ্টাবিংশতিতম কলি যুগে আমাদের হিসেবে দ্বাপর হয় না তো !

মুখুজ্জে মশাই নিজের হাঁটুর উপরেই একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলেন, বললেন : আলবৎ হয়।

পরিতোষবাবু কিন্তু উত্তেজিত হলেন না, বললেন : বেশ তো, তাই বুঝিয়ে দিন।

আমি জানি যে বোঝাতে পারব না। কেন না এ কথা আমি পড়ি নি কোথাও, ভাবিও নি কোন দিন। মুখুজ্জে মশাইও যে পারবেন, তা মনে হয় না। তাই বললুম : নিমিত্তে সপ্তমী হয় না ?

মুখুজ্জে মশাই উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই হয়।

বললুম : তাহলেই তো সব গণ্ডগোল মিটে গেল।

কেমন করে ?

বলে দুজনেই আবার বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাইলেন।

বললুম : নিমিত্তার্থে যদি ক্বচৌ হয়ে থাকে, তাহলে তার মানে হবে কলিপাপধ্বংসার্থং আবির্বভূব।

আমার বক্তব্য বোধ হয় তেমন স্পষ্ট হল না। তাই আরও বুঝিয়ে বললুম : কলি কালে পৃথিবী তো পাপে পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন কৃষ্ণের নাম কীর্তন করে উদ্ধার হবে যত পাপী তাপী।

অদ্ভুত !

বলে মুখুজ্জে মশাই যেন আনন্দে আত্মহারা হলেন এবং হাসলেন পরিতোষবাবু।

ভেবেছিলুম যে এবারে বোধ হয় অন্য কথা শুরু হবে। কিন্তু তা হল না। মুখুজ্জে মশাই বললেন : এবারে তাহলে কৃষ্ণের বয়স বলুন।

প্রশ্নটা আমাকে করেন নি, করেছিলেন পরিতোষবাবুকে। দেখলুম যে এঁদের কিছু পড়াশুনো আছে এ বিষয়ে। ভদ্রলোক উত্তর দিতে দেরি করলেন না, বললেন : এ আর এমন কি শক্ত প্রশ্ন ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তারিখ তো আমাদের জানা আছে, তা থেকেই কৃষ্ণের জন্ম-সময় বার করে নেওয়া যায়।

তাঁর কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তারিখ আমাদের জানা আছে।

আছে বৈকি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ১৪৩ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে।

মুখুজ্জে মশাই আপত্তি জানিয়ে বললেন: আপনার বিদেশী হিসেব রাখুন তো মশাই!

আমি সে কথায় কান না দিয়ে বললুম: কী করে এই হিসেব করলেন, আমায় বুঝিয়ে বলবেন কি?

কেন বলব না! খুব সোজা হিসেব। বুঝতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না।

মুখুজ্জে মশাই আর বাধা দিলেন না। পরিতোষবাবু বললেন: ঠিকই বলেছেন। বিদেশীদের জন্যেই তো আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হয়েছে। ৩২৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার এলেন ভারতে, এলেন মেগাস্থিনিস। বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বললেন, চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন ৩১৫ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে। জর্মন পণ্ডিত ম্যাকস্‌মুলারের মতে এই ঘটনা হল দি শীট অ্যাঙ্কর অব ইণ্ডিয়ান ক্রনলজি।

মুখুজ্জে মশাই বললেন: এই হল বিলিতি হিসেব! গাছের গোড়া থেকে না উঠে ডগা থেকে গোড়ায় নামছেন।

পরিতোষবাবু বিচলিত হলেন না। নির্বিকার ভাবে বললেন: ইতিহাসে নন্দ নামে এক মহারাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক নয়, অনেক। আমাদের কিন্তু একজনকে দরকার। তিনি বিষ্ণুপুরাণের নন্দ।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥

এক নিঃশ্বাসেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: এর মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন!

বললুম: ভাষাটা বাঙলা হলে পারতুম।

পরিতোষবাবু হেসে বললেন: পরীক্ষিতের জন্ম থেকে নন্দের অভিষেক পর্যন্ত মোট সময় হল এক হাজার পনর বছর। শ্রীমদ্ভাগবতে একটু তফাত লক্ষ্য করা যায়। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন:

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥

মানে, তোমার জন্ম থেকে নন্দের অভিষেকের সময় হবে এক হাজার একশো পনর বছর।

তাহলে উপায় ?

পরিতোষবাবু হেসে বললেন : শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, আর বিষ্ণুপুরাণ—

বলেই থেমে গেলেন। আমি জানি, বিষ্ণুপুরাণও রচনা করেছিলেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। তর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে বললুম : এখন তাহলে জানা দরকার, নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তর রাজ্যাভিষেকের দূরত্ব।

পরিতোষবাবু উত্তর দিলেন : ঠিক ধরেছেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে মতের পার্থক্য নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে : য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ। এঁর বংশধররা একশো বছর পৃথিবী ভোগ করবেন। আর বিষ্ণুপুরাণেও ঠিক এই কথাই আছে : তং পুত্রাশ্চ একং বর্ষ শতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি।

পরিতোষবাবু এর পর একটু দম নিয়ে বললেন : এইবারে হিসেব করুন। পরীক্ষিতের জন্ম থেকে খ্রীষ্টের জন্ম পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হল এক হাজার পনর যোগ একশো যোগ তিনশো পনর। মোট চোদ্দশো তিরিশ। পরীক্ষিতের জন্ম হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল হল ১৪৩০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ। আজ পর্যন্ত যোগ করে দেখুন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

এই আলোচনাটি আমার ভাল লাগল। বললুম : সাবাস !

কিন্তু আমার মন্তব্যে মুখুজ্জে মশাই হঠাৎ জ্বলে উঠলেন। বললেন : আপনি এ কথা মেনে নিচ্ছেন ?

বললুম : কেন মানব না বলুন ?

রাগত ভাবে মুখুজ্জে মশাই বললেন: আমাদের শাস্ত্র কি চুলোয় গেল!

পরিতোষবাবু বললেন: আমি কি আমাদের শাস্ত্র-প্রমাণ আপনাদের দিলুম না?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মুখুজ্জে মশাই বললেন: যুধিষ্ঠির কি এ যুগের মানুষ! তাঁর কাল পাঁচ হাজার বছরের একটা দিনও কম হবে না।

বললুম: আমিও যেন শুনেছিলুম যে কলি যুগের পাঁচ হাজার বছর গত হয়েছে।

মুখুজ্জে মশাই একটা কিল মারলেন নিজের হাঁটুর উপরে। বললেন: ঠিক বলেছেন। দ্বাপর যুগ ছিল বার লক্ষ ছিয়ানব্বুই হাজার বছর, আর কলির কেটেছে মাত্র পাঁচ হাজার।

গম্ভীর ভাবে পরিতোষবাবু বললেন: শাস্ত্র-প্রমাণ দিলেই আমরা তা মেনে নেব।

শাস্ত্র-প্রমাণ সম্বল থাকলে যে মুখুজ্জে মশাই অনেক আগেই তা পেশ করতেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। তবু তিনি নিরস্ত না হয়ে বললেন: এ সব তর্কের জিনিস নয় পরিতোষবাবু, এ হল বিশ্বাসের জিনিস।

পরিতোষবাবু প্রতিবাদ করে বললেন: প্রত্যেক বিশ্বাসের একটা ভিত্তি থাকে মুখুজ্জে মশাই, আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিও জেনে রাখা দরকার।

মুখুজ্জে মশাই চটে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। পরিতোষবাবু বললেন: মহাকবি কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জুনমেদিনীবিভুর্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ॥

মানে, যুধিষ্ঠির বিক্রমাদিত্য শালিবাহন বিজয়াভিনন্দন নাগার্জুন ও বলি, ভারতের এই ছজন রাজা শকাব্দ প্রবর্তন করেন।

পরিতোষবাবু বললেন : তারপরে দেখুন—যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪ কলম্ববিশ্বে ১৩৫ ···শালিবাহনের শকাব্দ আজ ১৮৭৯। যোগ করে দেখুন, পাঁচ হাজার আটান্ন বছর হচ্ছে।

মুখুজ্জে মশাইকে কিছু অভিভূত দেখাল। আমি বললুম : এত সব অঙ্কের হিসেব আপনি কোথায় পেলেন ?

পরিতোষবাবু বললেন : নানা জায়গায়।

বললুম : আমিও যে কৌতূহলী হয়ে উঠছি !

পরিতোষবাবু আমার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বললেন : সব তো মনে নেই। তবে দুর্গাদাসবাবুর পৃথিবীর ইতিহাসখানা পড়বেন। তাতে যা আছে, তাই হজম করা শক্ত।

এই পৃথিবীর ইতিহাসের আটখানি খণ্ড আমি দেখেছি। কিন্তু তেমন মনোযোগ দিয়ে পড়ি নি। মনে মনে স্থির করে ফেললুম যে এবারে দেশে ফিরে নিশ্চয়ই সব পড়ে ফেলব।

মুখুজ্জে মশাই বললেন : এ সব যদি জানতেনই তো এতক্ষণ এমন তর্ক করছিলেন কেন ?

পরিতোষবাবু বললেন: এ যে তর্কেরই কথা। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও এ তর্ক তুলেছিলেন।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন কৃষ্ণচরিত্র। তাতে এই প্রসঙ্গ আছে। পরিতোষবাবু বললেন : তিনি আমাদের প্রথম মতটারই সমর্থন করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ১৪৩০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ, নানা যুক্তি দিয়ে এই কথা প্রমাণ করবার পর বলেছেন যে এর পরে আর কেউ বোধ হয় বলবেন না যে 'মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে পাঁচ হাজার বছর আগে হয়েছিল।

ভুল, সর্বৈব ভুল।

বলে মুখুজ্জে মশাই হুঙ্কার দিলেন। পরিতোষবাবু হাসলেন আমার দিকে চেয়ে।

আমার আর একটি নিবন্ধের কথা মনে পড়ে গেল। অনেক

দিন আগে ভারতবর্ষ পত্রিকায় এক অধ্যাপক মহাশয় এই আলোচনা করেছিলেন। তিনি মহাভারতের উক্তি থেকেই প্রমাণ করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল ১৪৯৬ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর যুক্তি আজ আমার মনে নেই।

ট্রেন কত স্টেশনে দাঁড়াল, আর কত পথ পেরিয়ে এল, তার খেয়াল করি নি। এবারে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম দুপুর দুটো বাজতে আর বেশি দেরি নেই। দুটোর কিছু পরেই আমরা দ্বারকা পৌঁছব। তারপর কে কোথায় ছিটকে যাব জানি নে। দেশে ফিরেও এঁদের দেখা পাব কি না, তাই বা কে বলতে পারে! এ গাড়িতে আর বাঙালী যাত্রী নেই। বাকি সবাই এ দেশের মানুষ। তারাও কলরব করে চলেছে। সে তাদের নিজেদেব ভাষায়। আমাদের কাছে তা দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষার মতো। মনে হল, ভারতে এক ভাষা শুধু কাগজেই হওয়া সম্ভব। যেমন ইংরেজী হয়েছে।

এক সময় পরিতোষবাবু বললেন: কী ভাবছেন?

আমি?

অন্যমনস্ক ভাবে এই অবান্তর প্রশ্নটি আমি করলুম।

পরিতোষবাবু হেসে বললেন: আমি আপনার কথাই জানতে চাইছি।

সামলে নিয়ে বললুম: ভাবছি আপনাদের কথা। দেশে ফিরে আবার দেখা হবে তো?

ভদ্রলোক বললেন: আমাদের দেশ কি এক জায়গায়?

বললুম: আমি কলকাতার কাছে থাকি। বেসরকারী অফিসের কেরানী।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন: আমরা স্কুল মাস্টার। রেলের স্কুল বলে পাসে এত দূর আসতে পারলুম।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন আমি বুঝতে পেরেছি। বললুম: আমি যাচ্ছি বড়লোক মামার সঙ্গে।

এই তো ভারত। মানুষের সামর্থ্য এ দেশে সীমিত। প্রতি পদক্ষেপে জীবনকে মেনে চলতে হয় অভাবের অনুশাসন। স্কুলের শিক্ষকের নিকট ভ্রমণ যে বিলাসিতা, সে সম্বন্ধে এঁরা সুচেতন ছিলেন। তাই রেলের পাসের কথা বলেছেন একই নিঃশ্বাসে। আমি কেরানী শুনে আমার কাছেও কৈফিয়তের প্রত্যাশা করেছিলেন। এই দায় থেকে কোন দিন আমরা মুক্ত হতে পারব কি!

গাড়ির নিচে থেকে চাকার শব্দ উঠছে অবিশ্রান্ত ভাবে। মনে হল যেন অগণিত মানুষের অবিরাম আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।



দ্বারকায় পৌঁছেই ছুটলুম মামার গাড়ির দিকে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বাতি দেখছিল। আমাক দেখতে পেয়েই আড়াল হয়ে গেল।

কাছে গিয়ে দেখলুম যে মামা নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রথম কথাতেই তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বললেন: এক গাড়িতে চলতে তোমার আপত্তি যে কিসের তা বুঝি নে গোপাল!

তাঁর আপত্তির কারণ আমি জানি। যদি হারিয়ে যাই, যদি রয়ে যাই, এই আশঙ্কা! যদি ফিরে যাই অতর্কিতে, সে ভয়ও আছে। জবাব না দিয়ে আমি তাই হাসলুম।

মামা খুশী হলেন না, বললেন: হাসি নয় গোপাল, তোমার আর আলাদা চলা চলবে না।

আমি তখন কুলির অন্বেষণে লেগে গেছি। কিন্তু স্টেশনে কুলি নেই, সেই লালকোর্তা পরিহিত সেনাবাহিনী, যারা আমাদের হাওড়া স্টেশনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানায়। প্ল্যাটফর্মের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেন না থামা পর্যন্ত একজনও নড়ে না, যেন পাথরের মূর্তি। তারপর? তারপরের ঘটনা সকলের জানা। ট্রেন থামলেই গাড়ির দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিজয়ী সেনা যেন শত্রুর ধনরত্ন যথেচ্ছ লুণ্ঠন করবে

স্বাতি বলল: কুলি কই গোপালদা?

বললুম: ওদেরই তো খুঁজছি।

কতক্ষণ গাড়ি দাঁড়াবে জানি না। তাই মামাকে তাড়া দিয়ে বললুম: আপনারা নেমে আসুন, আমি সব নামিয়ে নিচ্ছি।

তু হাতে হাতল ধরে কোন রকমে মামা নেমে পড়লেন। বললেন : এত মাল তুমি একা নামাবে কী করে ? রামখেলাওন কোথায় ?

রামখেলাওন এগিয়ে আসছিল। তাকে দেখতে পেয়ে বললুম : ঐ তো সে আসছে।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বাতি চেঁচিয়ে উঠল, বলল : এদের কাণ্ড দেখ গোপালদা। এরাই যে মালপত্র নিয়ে টানাটানি করছে !

প্রথম শ্রেণীতে যাত্রী আর নেই। জনকয়েক স্ত্রীলোক চেঁচামেচি করছে তৃতীয় শ্রেণীর সামনে। কেউ কেউ বিছানা বাক্সও তুলে নিয়েছে মাথার উপরে। রেলের একজন কর্মচারী যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে সংবাদ পেলুম যে এই স্ত্রীলোকেরাই কুলির কাজ করে। তাদের আর ডাকতে হল না। ছোটখাটো একটি দল এসে এক একটি জিনিস এক একজনে দখল করে ফেলল।

মামী বললেন : এত জন কী করবে।

কারও মাথায় বিছানা, কারও কাঁকালে বেতের ঝুড়ি, বাক্স নিয়ে যাচ্ছে তুজনে ধরাধরি করে। লক্ষ্য করে দেখলুম যে ছড়ি হাতে একটা পুরুষ মানুষ তাদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বাতি হাসছিল। মামা চেঁচিয়ে উঠলেন : কোথায় যাচ্ছে এরা ?

কথা না বলে আমি তাদের সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

তারা একটা টাঙ্গার উপরে মাল রাখছিল। সেই ছড়ি-হাতে লোকটি দেখলুম টাঙ্গাওয়ালা, নিজের টাঙ্গাতেই মাল রাখাল। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল : তোতাদ্রি মঠেই যাবেন তো ?

চলনসই হিন্দী। বললুম : হ্যাঁ।

সেই সঙ্গে যোগ করে দিলুম : কী করে জানলে ?

লোকটা গম্ভীর ভাবে বলল : বাঙালী বাবুরা ঐখানেই যায় কিনা, আমিই নিয়ে যাই।

জিনিসপত্রেই তুখানা টাঙ্গা প্রায় ভরে গেল। বসবার জায়গা কম। আর একখানা টাঙ্গা ধরবার আগেই সব গাড়িগুলো যাত্রী

নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মামা চিন্তিত ভাবে বললেন : এবারে কী উপায় হবে।

উপায়।

টাঙ্গাওয়ালা দেখলুম বাঙলাও বোঝে। বলল : তার জন্যে ভাবনা কী! আমিই আর এক খেপ দেব। মঠ তো বেশি দূরে নয়!

ততক্ষণে সে মামী আর স্বাতিকে বসিয়ে নিয়েছে নিজের টাঙ্গায়। আর মামাকে সাহায্য করছে আর একখানা টাঙ্গায় উঠতে। আমি বললুম : তবে আর ভাবনা কী! হেঁটেই আমরা পৌঁছে যাব।

টাঙ্গাওয়ালা বলল : সে যুক্তিও মন্দ নয়। এই তো সামনেই বড় রাস্তার উপরে আপনাদের মঠ!

কিন্তু মামা উঠে বসতেই সে আমাকে ডাকল।

পিছনে সঙ্কীর্ণ স্থান। সামনে বোঝাই মালপত্র। বললুম : তোমরা এগোও। আমি আর রামখেলাওন হেঁটে যাচ্ছি।

মামী বললেন : সে কি কথা!

টাঙ্গাওয়ালা আমার উত্তরের অপেক্ষা করল না। ঘোড়ার লাগাম টেনে ছুটতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে টাঙ্গার উপরে লাফিয়ে উঠল।

এতগুলো স্ত্রীলোককে কী দিতে হবে, তা নিয়ে মামা ভাবনায় পড়েছিলেন। টাঙ্গাওয়ালা তাঁকেও উদ্ধার করে গেল। বলে গেল, অন্য স্টেশনে যা দিয়েছেন, তাই দিলেই চলবে। ওরা ভাগ করে নেবে।

জন তিনেক কুলি লাগে। মামা একটা গোটা টাকাই দিলেন। ওরা আরও কিছু বকশিশ চাইছিল। কিন্তু তার আগে এ টাঙ্গাও ছুটে বেরিয়ে গেল। রামখেলাওন আর আমি হাঁটতে শুরু করলুম।

সূর্য ঠিক মাথার উপরে নয়, পশ্চিমের দিকে কিছু হেলেছে। কিন্তু উত্তাপ কমে নি। রুক্ষ পথ, রুক্ষ প্রান্তর। অনাবৃষ্টির চিহ্ন বড় স্পষ্ট।

হঠাৎ মনে হল খানিকটা দূরে আমাদের টাঙ্গা দুখানা থেমে

পড়েছে। রাস্তার ধারে একটা অফিস, সেখান থেকে লোক এসে মামার সঙ্গে কথা কইছে। কী যেন বার করেও দিলেন মামা!

আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। দেখতে পেলুম যে একটা লোক খানকয়েক কাগজ এনে মামার হাতে দিতেই টাঙ্গা ছেড়ে দিল। সামনের টাঙ্গা থেকে পরিচিত লোকটা তার হাতের চাবুক ঘুরিয়ে আমাকে কিছু সঙ্কেত করে গেল। মনে হল, এ বোধ হয় তীর্থস্থানের মাশুল আদায়।

সেই অফিসের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে সব খবর পেলুম। মাথা পিছু চার আনা ট্যাক্স। আমাদের ট্যাক্স মামা দিয়ে গেছেন।

তোতাদ্রি মঠ বেশি দূরে নয়। রাস্তার উপর আমাদের গাড়ি দুখানা দেখতে পেয়েই বুঝতে পারলুম যে ঐ আমাদের মঠ। সামনে সাইনবোর্ডও আছে। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলুম: জায়গা নেই?

মামা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন: সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।

আমাদের টাঙ্গাওয়ালা কোথায়?

ভেতরে গেছে, একটা বাক্সও নিয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে কেউই নামেন নি দেখে বললুম: জায়গা নেই কেন মনে করছেন?

মামা বললেন: গাড়ির শব্দ পেয়ে এক সন্ন্যাসী বাইরে এসেছিলেন। বলে গেলেন, তাই তো!

আশান্বিত হয়ে আমি বললুম: তবে ব্যবস্থা একটা হবে।

বলেই দ্বিতীয় টাঙ্গাওয়ালাকে বললুম: চল, ভেতরে চল।

স্বাতি উসখুস করছিল, আমার কথা শুনেই নেমে পড়ল। মামীও নামলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঠিক এই সময় ফিরে এলেন। নগ্ন গা, নগ্ন পা। কোমরে এক ফালি কাপড়, তার গেরুয়া রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। প্রসন্ন মুখে বললেন: ভেতরে আসুন।

পরিষ্কার বাঙলা কথা। এঁরা সবাই যে বাঙালী, খানিক পরেই তা জেনে গেলুম।

মামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে কৃতজ্ঞতায় তিনি গদগদ হয়ে উঠেছেন, তাঁর বুকের উপর থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নেমে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন কসরৎ করে। তার পরেই বললেন : বাঁচালেন।

মঠের ভিতরের পরিবেশটি বড় শান্ত সমাহিত। অনেকখানি জমির উপর কয়েকখানি বাড়ি। গাছপালাও আছে, বাহিরের পথের মতো রৌদ্রদগ্ধ রুক্ষ প্রান্তর নয়। স্নিগ্ধ শ্যামল আশ্রমটি যেন ঘুমিয়ে আছে। বেশ ভাল লাগল।

সন্ন্যাসী আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। মস্ত বড় ঘর। বললেন : এই ঘরটি শুধু খালি আছে।

তাড়াতাড়ি মামা বললেন : এতেই আমাদের বেশ চলবে।

মামী বললেন : মেঝেটা একবার মুছে নিতে হবে।

সন্ন্যাসী বললেন : ভাল করে পরিষ্কার করা আছে। না মুছলেও কোন ক্ষতি নেই।

মামী অপেক্ষা করলেন না। দৃষ্টি দিয়েই রামখেলাওনকে তাঁর আদেশ জানিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসী বললেন : খাবার জল আমি এনে দিচ্ছি। অন্য সব কাজ কুয়োর জলেই হতে পারবে।

মামা বললেন : এখানে কি কুয়োর জল লোকে খায় না ?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন : নোন্‌তা জল।

স্বাতি বলে উঠল : ধনুষ্কোডিতেও তো আমরা নোন্‌তা জল দেখেছি।

সন্ন্যাসী বললেন : এখানে কিন্তু রেল কোম্পানি জলের ট্যাঙ্ক আনে না। খাবার জলের ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হয়।

আমরা সেই ব্যবস্থার কথা বুঝতে পারলুম না। সন্ন্যাসী বললেন: দেখবেন?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল দেখে বললুম: দেখাবেন?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

মামা বোধ হয় ক্লান্ত বোধ করছিলেন। বললেন: একটু পরেই তো আবার বেরতে হবে, তোমরাই দেখে এস।

মামীও রয়ে গেলেন মামার সঙ্গে।

সন্ন্যাসী আমাদের মন্দিরের ভিতর নিয়ে গেলেন। সাধারণ মন্দিরের মতো এ মন্দিরের চূড়া নেই। সমতল ছাদের একখানি পাকা বাড়ি। মঠের উপাসনা মন্দির। দেবতার নিত্য পূজা হয়। সন্ন্যাসী আমাদের একটা ধারে আনলেন। একটা ঢাকনা তুলে বললেন: এই দেখুন।

ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। কিন্তু মনে হল যে জলের একটা প্রশস্ত ট্যাঙ্ক আছে নিচে। সন্ন্যাসী বললেন: সমস্তটাই একটা ট্যাঙ্ক। বর্ষার সময় বৃষ্টির জল আমরা ধরে রাখি।

জল ধরার বিচিত্র উপায়ের কথাও আমাদের বললেন। বৃষ্টির সময় ছাদে যে জল জমে, নালা দিয়ে সেই জল আসে এই ট্যাঙ্কে। সময় মতো ঝাঁট দিয়ে ছাদটিকে তকতকে করে রাখতে হয়। প্রথম পসলা বৃষ্টিতে ছাদটা ধুয়ে ফেলেই জল ধরতে হয়। সন্ন্যাসী বললেন: এবারে আমরা তারও সুযোগ পাই নি। বৃষ্টি এবারে হয় নি বললেও চলে। জলের জন্যে দ্বারকা এবারে মরে যাচ্ছে।

তারপরে গর্বিত ভাবে বললেন: আমাদের জলের অভাব হবে না। এমন যে হবে, আমরা তা আগেই অনুমান করেছিলাম। সেই জন্যে প্রথম পসলা বৃষ্টিও ধরে রেখেছি।

বিস্মিত ভাবে স্বাতি বলল: জল এক বছর ধরা থাকে, নষ্ট হয় না!

সন্ন্যাসী বললেন: এ হল স্থান মাহাত্ম্য। গঙ্গার জলে যেমন

পোকা হয় না কোন দিন, দ্বারকার জলও তেমনি। খেলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা।

স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে আমি দেখলুম, তার কেমন অপ্রবৃত্তি হচ্ছে এই কথায়। দ্বারকার জল খেয়ে সে বোধ হয় আর তৃপ্তি পাবে না।

ফেরার পথে তিনি আমাদের ইঁদারা ও স্নানের ঘর দেখালেন। বালতি করে জল তুলে একটা ট্যাঙ্ক ভরতে হয়। স্নানের ঘরে সেই ট্যাঙ্কের জল পাওয়া যায়। যাত্রীরা নিজেরাই-এ সব কাজ করে নেন।

পরে শুনেছি, দ্বারকায় আর কোন জলকষ্ট নেই। কল থেকে প্রচুর মিষ্টি জল পাওয়া যায়। রেল স্টেশনের বাইরে রিটায়ারিং রুম তৈরি হয়েছে ট্রেনের যাত্রীদের জন্য। ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থাও বোধ হয় হয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন: কখন বেরবেন আপনারা?

বললুম: সেই কথাই তো ভাবছি।

গাড়ির কথা বলে রেখেছেন তো?

স্বীকার করলুম: তা বলি নি।

সাধুজী আমায় সাহস দিয়ে বললেন: তার জন্যে ভাবতে হবে না, কেউ না কেউ এখুনি এসে পড়বে।

আমরা আমাদের ঘরের সামনে পৌঁছতেই স্বাতি ভিতরে চলে গেল। আমি বসলুম বাহিরে একখানা সিমেন্টের বেঞ্চে। মাথার উপরে পত্রবহুল গাছ। তার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো আসছে অল্প অল্প, উত্তাপ একেবারেই আসছে না। সাধুজী আমার পাশে বসলেন না, সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললুম: আপনি বসবেন না?

তিনি বললেন: সারা দিন তো বসেই আছি!

মনে মনে আমি ভাবছিলুম দ্বারকা পরিক্রমার কথা। আমাকেই তো গাইডের কাজ করতে হবে! সাধুজীকে আমি সেই কথা

বললুম : আপনি বসলে আমি দ্বারকার কথা জিজ্ঞেস করতুম। কী দেখবার আছে, কত সময় লাগবে দেখতে, এই সব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সাধুজী উত্তর দিলেন : যা দেখবার আছে তা এক বেলাতেই দেখা যায়। আবার সারা জীবন ধরে দেখেও আশ মেটে নি, এমন মানুষও আছে শুনেছি।

এ হল হেঁয়ালির কথা। বললুম : তাহলে আমরা এক বেলাতেই সব দেখে নিতে পারব ?

সরু একখানা ছড়ি হাতে একজন টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে আসছিল। তাকে লক্ষ্য করে সাধুজী বললেন : এক বেলায় সব দেখাতে পারবে না রতনদাস ?

রতনদাস বিনীত ভাবে নমস্কার করে বলল : কেন পারব না, কালই তো একদল বাঙালী বাবুকে সব দেখিয়ে আনলাম !

সাধুজীর প্রশ্ন প্রায় বাঙলা, রতনদাসের উত্তর প্রায় হিন্দী। কিন্তু বুঝতে কারও কষ্ট হল না, আমারও না। বুঝিয়ে বলল যে তার টাঙ্গায় করে ভদ্রকালী মন্দির রুক্মিণী মন্দির সিদ্ধনাথ শিব মন্দির দেখিয়ে সমুদ্রের তীরে আনবে, আরতির সময় রণছোড়জীর মন্দিরে।

দ্বারকানাথের নাম এখানে রণছোড়জী। রণছোড়জীর জন্যই দ্বারকা। তাঁরই জন্য এখানে আসা।

সাধুজী বললেন : আপনারা কি এখানে রেঁধে বেড়ে খাবেন ?

আমি বললুম : হোটেল নেই ?

লজ আছে। পাঁচ সিকে পয়সায় ভালই খেতে দেয়, ভাত রুটি যা চাইবেন।

তবে আমরা লজেই খাব।

সাধুজী তাকালেন রতনদাসের দিকে, বললেন : তাহলে একেবারে লজে খাইয়ে এখানে এনো ! কিন্তু আপনাদের তো একটা গাড়িতে হবে না !

না।

রত্তনদাস বলল : তার জন্তে ভাবনা নেই। আমি আর একখানা গাড়ি ধরে আনব।

ভাবনা হল গাড়িতে উঠবার সময়। টাঙ্গার সামনে ওজন বেশি চাই। অথচ মামা মামী বা স্বাতি কেউই সামনে বসবেন না। আমি একা মানুষ, দুখানা গাড়ির সামনে কী করে বসি। মামা বললেন : ভাড়া তো তিন টাকা করে ঠিক করেছ, আর একখানা গাড়ি নাও। পেছনে একজন করেই বসা যাবে। তুমি বস আমার গাড়ির সামনে।

রত্তনদাস বলল : ঠিক আছে। বাবুজী একা আমার গাড়িতে বসুন। আমিও ভারী মানুষ, চালিয়ে নেব।

রামখেলাওনের কথা আমার মনে ছিল। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই সাধুজী বললেন : চাকরটাকে সঙ্গে নিন, সব গোলমাল মিটে যাবে।

মামা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

৮

আমরা উঠেছিলুম রতনদাসের টাঙ্গায়। আমি সামনে, মামী ও স্বাতি পিছনে। সুন্দর বাঁধানো রাস্তায় খট খট শব্দ করে গাড়ি চলছে।

একটুখানি এগিয়েই স্বাতি বলল : কৃষ্ণ তো মথুরার মানুষ, মথুরা ছেড়ে দ্বারকা এলেন কেন গোপালদা ?

গম্ভীর ভাবে বললুম : পালিয়ে।

পালিয়ে !

মামী আশ্চর্য হলেন বেশি।

বললুম : মথুরা থেকে দ্বারকায় তো কৃষ্ণ পালিয়ে এসেছিলেন। কংস বধ করবার সময় কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রবলপরাক্রম জরাসন্ধ তাঁকে দেশছাড়া করবে !

মহাভারতের গল্প বোধ হয় স্বাতি ভুলে গিয়েছিল, বলল : গল্পটা সংক্ষেপে বল না !

বললুম : গল্পটা ছোটই। কংস যে কৃষ্ণের মামা তা নিশ্চয়ই মনে আছে ! চন্দ্রবংশে আহুকের দুই ছেলে—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত মেয়ে, তাদের বিয়ে হয় কৃষ্ণের বাবা বসুদেবের সঙ্গে। এই সাতটি মেয়ের দুজনের নাম আমাদের জানা। বলরামের মা রোহিণী ও কৃষ্ণের মা দেবকী। ও দিকে উগ্রসেনের বড় ছেলের নাম হল কংস। কাজেই কংস হলেন কৃষ্ণের মামা। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণ তাঁকে সংহার করবে। সেই ভয়ে তিনি বোন ও ভগ্নীপতিকে কারাগারে বন্ধ করে রাখেন ও তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই হত্যার ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণকেও

তিনি হত্যার নানা চেষ্টা করেছিলেন। এই সব পাপের জন্যে কৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞে কংসকে বধ করেন। তার ফল এই হল যে জরাসন্ধ তাঁর চিরশত্রু হলেন। জরাসন্ধের দুই মেয়ে অস্তি ও প্রাপ্তির বিয়ে হয়েছিল কংসের সঙ্গে। জামাইএর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মগধরাজ জরাসন্ধ আঠারো বার মথুরা আক্রমণ করেছিলেন ও তাঁর রাজধানী গিরিব্রজ থেকে গদা নিক্ষেপ করেছিলেন মথুরার ওপর।

হেসে বললুম: মথুরায় গদাবসান ক্ষেত্র দেখ নি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে স্বাতি বলল: তবে তো কৃষ্ণকে পালাতেই হবে।

আমাদের টাঙ্গাওয়ালা রতনদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে গল্প শুনছিল। এইবারে একটু ইতস্তত করে বলল: আমি একটা কথা বলব বাবুজী?

হিন্দীতেই বলল। কিন্তু আমি বাঙলায় বললুম: বল।

বুঝতে পেরেছিলুম যে লোকটা বাঙলা কথা বুঝতে পারছে এবং এই প্রসঙ্গেই কিছু বলতে চায়। বাঙলা বুঝতে পারা যে বিচিত্র নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। তীর্থের আকর্ষণ বাঙালীর কম নয়, বিশেষত বাঙালী বৈষ্ণবের। যখন রেলগাড়ি ছিল না এ দেশে, তখন বম্বে থেকে জাহাজে চড়ে তারা পোরবন্দরে আসত, তারপর সেখান থেকে দ্বারকা। তবু তারা এসেছে। এখনও দলে দলে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে নিয়ে আসে। পাণ্ডারা দেখে, দেখে টাঙ্গাওয়ালারা। কথা শোনে, কথা শেখে। রতনদাসও শিখেছে। বলল: কৃষ্ণ পালিয়ে এসেছেন আমরা বলি না, বলি চলে এসেছেন। তিনি যুদ্ধবিরোধী শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তাই অকারণ সৈন্য ক্ষয় এড়াতে যাদবদের সরিয়ে এনেছিলেন। তাই আমরা তাঁকে রণছোড়জী বলে পূজো করি।

মামী খুশী হলেন এই মন্তব্য শুনে। কৃষ্ণ কাপুরুষ ছিলেন ভাবতে তাঁর সংস্কারে বাধছিল। কিন্তু আশ্চর্য হল স্বাতি। বোধ হয় টাঙ্গাওয়ালার মুখে এমন তত্ত্ব কথা শোনবার আশা করে নি। বলল: তবেই দেখ, পালিয়ে আসা বলা তোমার অন্যায় হয়েছে।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম : কৃষ্ণ যদি জরাসন্ধকে নিজে বধ করতেন, তাহলে আমিও কৃষ্ণকে রণছোড়জী বলে সম্মান করতুম। জরাসন্ধ-বধের গল্প তোমার মনে নেই!

স্বাতি উত্তর দিল না। বুঝতে পারলুম যে তার এ গল্পও মনে নেই। এমনিই হয়। আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে শৈশবে আমরা মেতে থাকি। কী আগ্রহ, কী কৌতূহল! সে সব দিনের কথা আজও আমার মনে আছে। কিন্তু তারপর? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবই বুঝি ভুলে যাই। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা যেমন মনে থাকে না, তেমনি মনে থাকে না রামায়ণ ও মহাভারতের খুঁটিনাটি কথা। জীবনে আর একবার এ সব পড়বার প্রয়োজন হয়। সে নাতি-নাতনীর প্রয়োজনে। পড়তে শিখবার আগে তারা শুনে শিখবে। কিন্তু নূতন সমাজ-জীবনে সে প্রয়োজন বোধ হয় ফুরিয়ে এল। পিতা পুত্র আজকাল আর একত্র থাকে না। নাতি-নাতনী মানুষ হয় না ঠাকুর্দা ঠাকুমার স্নেহ যত্নে। বিলাতি কায়দায় তারা বোর্ডিঙে যায়। তাই শৈশবের বই আর দ্বিতীয়বার আমাদের পড়তে হয় না।

জরাসন্ধের গল্প মামীর মনে ছিল। বললেন : ভীমের হাতে জরাসন্ধ বধ হয়েছিল। ভীম তাকে—

মামী থামতেই আমি পিছন ফিরে দেখলুম যে ভয়ে তিনি দু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। তাঁর চোখের সামনে বোধ হয় সেই বীভৎস দৃশ্য ভেসে উঠেছে। ভীম জরাসন্ধের দু পা ধরে চিরে ফেলেছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। জরাসন্ধের জন্ম-বৃত্তান্ত তাঁর জানা ছিল। মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র জন্মাল খণ্ডিত দেহের। রাণী সেই খণ্ড দুটি বাহিরে ফেলে দিলেন। জরা রাক্ষসী তা দেখতে পেয়ে দুটি খণ্ডকে জুড়ে 'বেঁচে ওঠ' বলতেই সেই দেহে প্রাণসঞ্চার হয়ে গেল। এই শিশুই জরাসন্ধ। অমিত বিক্রম। তাঁর দুর্বল স্থানের কথা জানা না থাকলে যুদ্ধে তাঁকে বধ করা মানুষের অসাধ্য ছিল।

আর দশটা তীর্থস্থানের মতো দ্বারকাতেও আছে নানা দেবদেবীর ছোট ছোট অনেক মন্দির। এই সব মন্দিরের উপরে কোনও ধনীর কৃপা দৃষ্টি প্রসারিত হয় নি। ধূলায় ও অবহেলায় দেবতারা কোন মতে বেঁচে আছেন। দরিদ্র পূজারী তাঁর নিজের সংসারের স্বার্থেই বুঝি আজও দেবসেবা চালিয়ে যাচ্ছেন। দূর-দূরান্ত থেকে যে সব যাত্রী আসেন তীর্থ মানসে বহু পরিশ্রমে বহু অর্থ ব্যয় করে, দ্বারকায় তাঁরা বিশ্রামও করেন। আর তাঁরাই তাঁদের অবকাশের সময়ে এই সব মন্দিরে আসেন পাণ্ডার সঙ্গে। টাঙ্গাওয়ালারাও জানে যে যাত্রীরা সবই দেখবেন। তাই স্থানে স্থানে থামিয়ে বলে, এখানে সিদ্ধেশ্বর শিব, এখানে ভদ্রকালী দেবী ও সত্যনারায়ণ, আর এই হল রুক্মিণী দেবীর মন্দির।

যে রাজপথ দ্বারকা থেকে ওখা গেছে উত্তরে, রুক্মিণী দেবীর মন্দির সেই পথের উপরেই, শহর থেকে মাইল খানেক দূরে। অনেক পরিবার দেখা গেল পায়ে হেঁটে এই পথে চলেছেন। আমাদের মতো যাঁদের তাড়া নেই, তাঁরা কেন হেঁটে যাবেন না!

রুক্মিণী দেবীর মন্দিরের নিকটে আমরা থেমে পড়লুম। চারি দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই স্বাতি বলল: অদ্ভুত জায়গা! তাই না মা?

মামা তখনও এসে পৌছন নি। তাঁর টাঙ্গা আসছে ধীরে ধীরে। মামী অপেক্ষা করতে লাগলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

স্বাতির মতো আমিও ভাবছিলুম, জায়গাটা অদ্ভুতই বটে। পশ্চিম থেকে সমুদ্রের জল এসে চারি দিক যেন থই থই করছে। পাশাপাশি দুটি মন্দির, জীর্ণ ভগ্নপ্রায়। কাছে কোথাও লোকালয়ের চিহ্ন নেই। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলুম যে খানিকটা এগিয়ে একটা পুল দেখা যাচ্ছে। তার নিচে দিয়েই জল আসছে। উল্টো দিকে অনেকটা দূরে ছোট ছোট বহু ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর গোটা দুই বিরাট চিমনি দিয়ে অপর্যাপ্ত ধোঁয়া বেরচ্ছে। মাঝখানের মাঠখানা আছে

জলে ডুবে। জল যে গভীর নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বন্যার জলের মতো অগভীর!

আমি কিছু বলবার আগেই মামা এসে পৌঁছে গেলেন। বললেন: এত জল কিসের?

আমাদের টাঙ্গাওয়ালা বুঝি এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। বলল: এ সবই সমুদ্রের জল। আর ঐ যে ধোঁয়া দেখছেন, ও হচ্ছে এখানকার সিমেণ্ট কারখানা। ঐগুলি কর্মচারীদের থাকবার বাড়ি।

বলে হাতের চাবুক দিয়ে বাড়িগুলি দেখিয়ে দিল।

দ্বারকার সিমেণ্ট কারখানার কথা আমি আগেই শুনেছিলুম। বোধ হয় কোন ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছি। সেখানে বাঙালী কর্মচারী আছেন, এ কথাও যেন কেউ লিখেছেন মনে পড়ল। এই কোম্পানির আরও অনেক কারখানা আছে ভারতের নানা স্থানে। কিন্তু রতনদাস প্রশংসা করল কোম্পানির মালিকের। এ দেশের লোকের খেয়ে পরে বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এই জন্যই প্রশংসা।

রতনদাস আমাকে জিজ্ঞাসা করল: এক দিন দেখবেন কি কারখানার ভিতরটা?

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই স্বাতি বলল: তেমন কিছু কি দেখবার আছে?

দেখবার যে অনেক কিছু আছে, রতনদাস তাই বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মামার উত্তর শুনেই থেমে গেল। মামা বললেন: দেখবার থাকলেই কি কোন উপায় আছে! কাল সকালেই তো আমাদের বেরতে হবে।

মামীর মন ছিল অন্য দিকে, তিনি বললেন: কৃষ্ণের তো ষোল হাজার রাণী ছিল। কিন্তু মন্দির কেন রুক্মিণী দেবীর!

মামা আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জিত ভাবে বললুম: রুক্মিণী দ্বারকাত্যাজ্ঞ রাধা বৃন্দাবনে বনে।

মামা বোধ হয় মানেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তাই বুঝিয়ে বললুম : বৃন্দাবনে যেমন রাধা, তেমনি রুক্মিণী দ্বারকায়।

সকৌতুকে মামা বললেন : পুরাণ কি তুমি গুলে খেয়েছ গোপাল?

বললুম : আমার বাবা যে ইস্কুল মাস্টার ছিলেন মামাবাবু!

মন্দির থেকে ব্রাহ্মণেরা বেরিয়ে এসেছিলেন। আগ্রহ করে পথ দেখালেন মামীকে। রাস্তার দিকে মন্দিরের পিছন, দরজা উল্টো দিকে। সিঁড়িও সেই দিকে। যাত্রী যে বেশি হয় না, তার পরিচয় সর্বত্র। মন্দির সংস্কারে অমনোযোগ নিশ্চয়ই অভাবজনিত। মনকে পীড়া দেয়।

মামা ও মামী মন্দিরের ভিতরে ঢুকলেন। আমরা দরজা থেকেই প্রণামটা সেরে নিলুম। তারপর মন্দিরের কারুকার্য দেখতে লাগলুম মনোযোগ দিয়ে। স্বাতি হঠাৎ মুখ নামিয়ে সরে গেল। তাই দেখে বললুম : কী হল?

যাই, ভেতরটা একবার দেখে আসি।

বলে সে সত্যিই মামা মামীর কাছে গিয়ে হাজির হল।

আবার আমি মন্দিরের দিকে তাকালুম। ভালো করে দৃষ্টি দিতেই বুঝতে পারলুম, স্বাতি কেন পালিয়ে গেল। বন্ধকাম মূর্তি দেখেছে পাথরে উৎকীর্ণ করা। লজ্জাই করে, বিশেষ করে সঙ্গে কেউ সঙ্গী থাকলে। সঙ্গী পুরুষ হলে নারীর লজ্জা আরও বেশি। কেউ না থাকলেও লজ্জা। আমিও সরে গেলুম।

আমার মনে পড়ল, উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে এমন মূর্তি আছে অগণিত। পুরী ভুবনেশ্বর ও কোনার্কে। এই সব মূর্তির প্রচলন নিয়ে নানা বাক্-বিতণ্ডা আছে, নানা রকমের মন্তব্য। বিদেশীরা আমাদের অসভ্য বলতেও দ্বিধা করে নি। আবার অনেক পণ্ডিত একে সমর্থন করতেও সঙ্কোচ বোধ করেন নি। এই সব মূর্তি দেখে মনে যে অশ্লীল ভাব জাগে সেটি জাগানোই নাকি এর উদ্দেশ্য। নগ্ন কামনা যে সর্বতো ভাবে বর্জনীয়, মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে এই মূর্তিগুলি তা মনে

করিয়ে দেয়। এই ধাক্কাতেই মনের প্রবাহ বদলে যায়, মন অন্তর্মুখী হয়, আধ্যাত্মিক ভাবনায় দেবতার প্রতি হয় শ্রদ্ধাশীল। একবার এক কথক ঠাকুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এ সব যাত্রীদের জন্য। সব বাসনা কামনা যে মন্দিরের বাহিরে রেখে আসতে হবে, এ তারই নির্দেশ। কিন্তু এ নির্দেশ এমন বীভৎস ভাবে দেবার কি দরকার ছিল!

সামনের কোন ছুটিতে উড়িষ্যা ভ্রমণের সংকল্প আছে। তখন এ নিয়ে পড়াশুনা করব।

ফেরার পথেও আমরা রতনদাসের টাঙ্গায় বসলুম। বললুম: এবারে কোথায় যাবে রতনদাস?

স্বাতি বলল: সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের ধারে থাকব।

রতনদাস উত্তর না দিয়ে পিছনে ফিরে মামীর মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম: মন্দির কি এখুনি দেখবেন, না আরতির সময়?

আমি জানতুম না যে মামী আমার কথায় দুঃখ পাবেন। বললেন: খেয়েদেয়ে পুজো তো আজ হবে না, কাল সকালেও শুনছি সময় নেই। আরতিই দেখব।

রতনদাস কিছু বুঝতে পেরেছে। বলল: প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায়। পুজোর ব্যবস্থাও হয়।

আরও খানিকটা পথ চলার পরে বলল: এই বেলা তাহলে শহরটা দেখে নিন। তারপর সমুদ্রের ধার দেখিয়ে মন্দিরে আনব।

বড় রুক্ষ শহর। বড় খটখটে। ঘোড়ার খুরে অল্প অল্প ধুলো উড়ছে, আর শব্দ উঠছে পাথর ভাঙার মতো। কঠিন পথ। রতনদাস আমাদের শহর দেখাল যত্ন করে। বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের শহর। লাইট হাউস, সেনানিবাস, সরকারী কর্মচারীদের বাসগৃহ।

সেই সঙ্গে হাসপাতাল, স্কুল ও লাইব্রেরি। পুরুষ ও মহিলার জন্য লাইব্রেরির বিশেষ ব্যবস্থা। রতনদাসকে আমি শিব মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। অনুমানেই মনে হল, মামী খুশী হয়েছেন এই প্রশ্ন শুনে। রতনদাস বলল: দ্বারকায় আছেন সিদ্ধেশ্বর শিব।

খানিকটা পথ অতিক্রম করেই শিব মন্দিরে পৌঁছে গেলুম। একে মন্দির বলব না। অনেক গৃহস্থের গৃহেও এর চেয়ে ভাল মন্দির দেখেছি। তীর্থস্থানে মন্দিরের এমন দুরবস্থা কোথাও দেখি নি। দেশে কি ধনী নেই!

মামীও বুঝি দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু এ দুঃখ নিতান্ত সাময়িক। দেবতার কী মহিমা জানি নে, ঐ শান্ত সমাহিত পরিবেশের ভিতর দেবতার দর্শন পেতেই সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায়। অদৃশ্য ঐশ্বর্যে মন প্রাণ ভরে ওঠে। কারও মুখে কোন কথা যোগাল না।

ফেরার পথে ব্রাহ্মণেরা বিদায় চাইলেন। যেন ভিক্ষা চাইছেন। বড় দরিদ্র, বড় অসহায় এই ব্রাহ্মণেরা। মামা তাড়া দিলেন তাদের হ্যাংলামি দেখে। কিন্তু লুকিয়ে কী দিলেন তা দেখতে পেলুম না। দু হাত তুলে তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। মামার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, যেন দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছেন তিনি। প্রসন্ন চিত্তে তাঁর নিজের টাঙ্গার উপরে উঠে বসলেন। অদ্ভুত মানুষ!

অল্প একটুখানি পথ পেরিয়ে সন্ন্যাসীদের ধর্মশালার পাশ দিয়ে আমরা গোমতী গঙ্গার তীরে এলুম। গোমতী এখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এ নদীর উৎস কোথায় জানি না, সমুদ্রের খাঁড়ি বলেই এখন মনে হবে।

কঠিন পথের উপর থেকে আমরা সমুদ্র বেলায় নেমে এলুম। স্বাতির যেন আনন্দ আর ধরে না। বালির উপর চটি জোড়া খুলে রেখেই জলে নেমে পড়ল। নদীর উজানের দিকে গেল না, গেল সমুদ্রের দিকে। খানিকটা জল পেরিয়ে একটুখানি চর, তারপর আবার জল। ঢেউ আসছে মাথা নুয়ে নুয়ে। এ যেন ঢেউই নয়

তার উপর বেলাশেষের লাল আলো। খানিকটা তেজ এখনও আছে বলে অল্প অল্প চিকমিক করছে।

মামা মামী প্রথমে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। দৃষ্টি প্রথমে ঐ দিকেই যায়। ডান দিকে একটি পুরনো মন্দির, এই সঙ্গমে প্রহরীর মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। নির্জন মন্দির। কোন্ দেবতার, রতনদাস তা বলতে পারল না।

তরতর করে স্বাতি এগিয়ে যাচ্ছিল। মামী ভয় পেয়ে বললেন: দেখ মেয়ের কাণ্ড!

মামা আমার দিকে তাকাতেই বললুম: আমি দেখছি।

বলে এগিয়ে গেলুম স্বাতির দিকে। বেশ লাগল। কলকল ছলছল করে সমুদ্রের জল বইছে। মাথার উপর ঢেউ ভেঙে পড়বার ভয় নেই। ভয় হল না অকূলের টানে চলে যাবার। এ তো বঙ্গোপসাগর নয়, নয় ভারত মহাসাগর এ আরব সাগর, শৌখিন মানুষের সমুদ্র-স্নানের জন্য নির্ভয়। বম্বের জুহুতে এই সাগর বেলায় অর্ধনগ্ন নারী পুরুষের মত্ততা নাকি দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে।

আমাকে আসতে দেখে স্বাতি বলল: আসতেই তো হল, শুধু কেন দাঁড়িয়ে দেখছিলে!

গম্ভীর ভাবে জবাব দিলুম: তোমাকে রক্ষার জন্যে মামাবাবু আমায় পাঠালেন।

কৌতুকে স্বাতির মুখ উজ্জ্বল হল। বলল: পেটে পেটে এত বুদ্ধিও রাখ!

বুদ্ধির কী দেখলে?

বুদ্ধি নয়। তুমি নিজে যা করতে চাইবে, গুরুজনরা তোমাকে সেই আদেশ করবেন—এ বুদ্ধির কথা নয়!

আমি হাসছিলুম।

স্বাতি বলল: আমি তো নিজের ইচ্ছাতেই চলে এলাম। আমাকে তো তাঁরা আসতে বললেন না! আর তুমি এলে সনদ নিয়ে।

খোসামোদ কেন বল তো! শক্ত কিছু করতে হবে বুঝি?

স্বাতি এবারে হাসল, বলল: পশ্চিমের আকাশটা দেখ!

দেখবার মতো আকাশ বটে। আরও রক্তিম আরও মায়াময় হয়েছে। স্বর্গের শিল্পীর ভাণ্ডারে এত রঙও আছে।

সূর্যের দিকে তাকাতে আর কষ্ট হয় না। বড় স্নিগ্ধ আলো, স্নিগ্ধ প্রতিবিম্ব। নিজেকে যেন ভুলে গেলুম।

স্বাতি বলল: ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, ঐ বালির ওপরে গিয়ে বসব। ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাতি কিছু বলবার অবকাশ দিল না। তরতর করে তীরের দিকে ফিরে গেল। মামা মামী যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছেন সে দিকে নয়, গেল মন্দিরের দিকে। তারপর মন্দিরের পাশ দিয়ে আড়াল হয়ে গেল পশ্চিমের সমুদ্র বেলায়।

পিছন ফিরে আমি দ্বারকার এক নূতন দৃশ্য দেখলুম। গোমতীর তীরে দ্বারকার প্রাচীন শহর। দ্বারকাপতি রণছোড়জীর মন্দিরচূড়াও দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে নিশান উড়ছে পতপত করে। আমি মামা মামীর কাছে ফিরে এলুম।

মামী বললেন: স্বাতি কোথায় গেল?

বললুম: ওধার থেকে সূর্যাস্ত দেখবে।

রতনদাস দাঁড়িয়ে ছিল নিকটেই। বলল: তার তো এখনও অনেক বাকি!

বললুম: ছবিও নাকি নেবে।

মামা বললেন: টাঙ্গাওয়ালা বলছে, খানিকটা এগিয়েই গোমতীর স্নানের ঘাট, মাশুল দিয়ে স্নান করতে হয়। সেখান থেকে ছাপ্পান্নটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে মন্দিরের স্বর্গদ্বার। শহরের দিকে সিংহ-দ্বারের নাম মোক্ষদ্বার। এই পথটা হেঁটে গিয়ে আমাদের মন্দিরে ঢুকতে বলছে। বেরব মোক্ষদ্বার দিয়ে। ওরা টাঙ্গা নিয়ে অপেক্ষা করবে সেখানে।

বললুম : বেশ তো, তাই করা যাবে।

মামা ক্ষেপে উঠে বললেন : বেশ তো মানে! অন্ধকারে ছাপ্পান্নটি সিঁড়ি ভাঙা কি মুখের কথা!

মামী বললেন : অন্ধকার কোথায় ?

সূর্যাস্তের পরেও কি এমনি আলো থাকবে ভাবছ!

বুঝতে পারলুম যে শুধু সিঁড়ি ভাঙার ভাবনা নয়, স্বাতির জন্ম ভাবনাও আছে। বললুম : তাহলে আমরা ধীরে ধীরে এগোই, স্বাতি আমাদের ধরে ফেলবে।

চিন্তিত ভাবে মামী বললেন : এমন নির্জন জায়গায় ওকে একা ফেলে যাব!

মামা ও চিন্তিত হয়েছিলেন। তারপরে বললেন : গোপাল এখানে থাকো না! তুমি ওকে নিয়ে আসবে।

মামী খুব খুশী হলেন না এই ব্যবস্থায়। তবু বললেন : তাই কর, কিন্তু বেশি দেরি কোরো না যেন।

মামীর ভাবনা বুঝে মনে মনে আমি হাসলুম।

৯

মামা ও মামী মন্দিরের দিকে এগোলেন, সঙ্গে রামখেলাওন। আমি ফিরে এলুম স্বাতির কাছে। স্বাতি আমার পায়ের শব্দ শুনে পিছনে তাকাল। বলল: ব্যবস্থা হল?

না হয়ে আর উপায় কি বল।

স্বাতি হাসল।

বললুম: ওঁরা মন্দিরে গেলেন। বেশি দেরি করা আমাদের চলবে না।

সমুদ্রের জল থেকে স্বাতি খানিকটা দূরে বসেছিল। শুকনো বালির উপর। পায়ের কাছে জলের দাগ, সাদা সাদা ফেনাও লেগে আছে। আমি তার পাশে এসে বসলুম। স্বাতি কিছু বলবার আগেই একটা জলোচ্ছ্বাস এল। জামাকাপড় বুঝি ভিজিয়ে দেবে। হাতের উপরে ভর দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলুম।

জামাকাপড় ভিজল না, ভিজল শুধু পায়ের পাতা দুটো। স্বাতির ফর্সা পায়ের উপরে জলের সাদা ফেনা লেগে রইল। খুশির মতো সাদা ফেনা। আমার চোখের দিকে চেয়ে স্বাতি বুঝি লজ্জা পেল। বলল: কী দেখছ?

দেখবার জিনিসের কি অভাব এখানে!

স্বাতি এবারে অন্য প্রশ্ন করল: মা কী বললেন?

বললেন, তাঁর মেয়েই তাঁকে ডোবাবে।

মা এ কথা কিছুতেই বলবেন না। অন্তত তোমার কাছে।

না কেন?

তোমায় ভদ্রলোক ভাবলে তো বলবেন!

আমি খুব আহত হবার ভান করে বললুম: তোমরা কি আমায় মানুষ ভাব না?

এ প্রশ্নের জন্য স্বাতি প্রস্তুত ছিল না। কিছু অন্যমনস্কও ছিল। তাই চমকে উঠে নিতান্ত লজ্জিত ভাবে বলল: ছি ছি, এ কী বলছ!

তুমিই তো বললে!

আমি অন্য কথা বলেছি। সব কথা তোমায় বলা যায় না, তাই বলেছি।

আমি তার লজ্জা দেখে হেসে ফেললুম। স্বাতি রেগে গেল। আমার ছল বুঝতে পেরে বলল: তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না।

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম: তোমার মন এবারে কথা কইবে।

স্বাতি সত্যিই অনেকক্ষণ কথা কইল না। আমি ভাবতে লাগলুম। আমাদের অতীতটা মনে এল কোন দুর্বল মুহূর্তে। স্বাতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। চিরদিনই মনে থাকবে। সেও এমনি ছুটির কথা। সেদিন শেষ আপিস হয়ে পুজার ছুটি হয়ে গেল। কিন্তু আপিস পালিয়েও চারটে কুড়ির লোকাল ট্রেনটা ধরতে পারলুম না। উত্তরপাড়ায় বাড়ি ফেরবার জন্য চারটে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে হবে। কী ভেবে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলুম মাদ্রাজ মেল দেখবার জন্য। সেখানেই মামাবাবুকে দেখলুম দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাচ্ছেন। অনাত্মীয় বড়লোক মামা ভিড়ের ভিতর চিনতে পেরেছেন বলে সেদিন আনন্দ হয়েছিল। তাঁর নিজের বাড়িতে তো এক দিন চিনতেই পারেন নি। ভাগনে গরিব হলে আপন মামাই চিনতে পারেন না, তো পাতানো বোনের ছেলেকে চিনবেন, এমন আশা করাই আমাদের অন্যায়!

স্বাতিকে সেদিন আমি প্রথম দেখেছিলুম। রামখেলাওন হারিয়ে গিয়েছিল ভিড়ের ভিতর। তাই শুনে আমি বলেছিলুম, খুঁজে দেখি।

দরজায় দাঁড়িয়ে এই তন্বী মেয়েটি সেদিন আমার কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল, আপনি খুঁজে দেখবেন মানে! চিনবেন কী করে?

রামখেলাওনকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। মামী বলেছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পার না? আর মামা আমার হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন। বড় অসহায় মনে হয়েছিল মামাকে। জানালার ভিতর মামীর চোখ দুটোও দেখেছিলুম ছলছল করছে বেদনায়। আর দরজায় দাঁড়িয়ে স্বাতি তার বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে ছিল আমার উত্তরের প্রতীক্ষায়।

আমি জাত-বাউণ্ডুলে। বাহিরের আকাশ আমাকে টানে। সেই টানে ঘরে আমার মন বসে না। কেউ নেইও দুনিয়ায়, যার অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে। চলন্তি ট্রেনেই আমি তাই উঠে পড়েছিলুম। তারপর এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল গভীর।

মাস কয়েক আগে দিল্লীতে কিছু দিন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। লোকে আত্মীয় বলে ভুল করেছে। দিনে দিনে এই ভুলের পরিমাণ আরও বাড়বে।

এক সময় স্বাতি আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলল: কী ভাবছ?

চট করে কথার উত্তর দিতে আমি পারলুম না। একটু ভেবে বললুম: লোকে আমাদের ভুল করে কেন, বলতে পার?

স্বাতি বলল: তুমি কি রাণাবাবুর কথা বলছ?

মনে পড়ল, রাণাও আমাদের ভুল বোঝে। আর তার ভুলটাই সব চেয়ে মারাত্মক। স্বাতিকে তার ভাল লেগেছিল। তাই সে ভাবতে পারে না যে স্বাতিরও আর কাউকে ভাল লাগতে পারে। তার মতে ভাল লাগালাগির একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে। অনিবার্য ভাবে সেটা রেসিপ্রোকাল। একের অপরকে ভাল লাগলে অপরেরও তাকে ভাল লাগবে। কাজেই সে কতকটা অন্ধ। বললুম: শুধু রাণা কেন, সবাই আমাদের ভুল বোঝে।

স্বাতি বলল : সবাই বোঝে না। বাবা-মা ঠিকই বোঝেন। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

মেনে নিতে পারেন নি বলেই মা এত ভাবনা ভাবেন।

আর মামাবাবু ?

বাবা !

স্বাতি হাসল। এই হাসিতেই আমি তার মনের কথা বুঝি জেনে গেলুম।

আমাদের দৃষ্টি ছিল আকাশের দিকে। সূর্য ক্রমেই যেন একটি কলসের মতো আকার ধারণ করেছে। বড় অদ্ভুত দৃশ্য। এমন দৃশ্য আমরা কোথাও বুঝি দেখি নি। স্বাতি তার ক্যামেরা খুলতে খুলতে বলল : এই দৃশ্যটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করি।

কিন্তু ধরতে পারল না। ছবি নেবার আগেই সূর্যের রূপ বদলে গেল। সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিলেছে, সেই দিগন্তের ঠিক উপরেই এই খেলা। অস্ত যাবার আগে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য সূর্য এই খেলা দেখিয়ে গেল।

পিছন ফিরে দেখলুম, অন্ধকার আমাদের দেহ পর্যন্ত নেমে এসেছে। সামনে মুখ ফেরাতেই সেই অন্ধকার দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেল। স্বাতি অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবু কোন কথা কইল না। বুঝতে পারলুম যে তার মন আজ ভারাক্রান্ত হয়েছে অন্য চিন্তায়।

আমি তার চিন্তার ধারা কিছুটা যেন অনুমান করতে পারছি। সে হয়তো এখন সামাজিক বৈষম্যের কথা ভাবছে। সমাজে বৈষম্য কেন থাকবে! আর থাকবেই যদি তো সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার কেন অন্তরায় হবে! কেন আমরা মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারি না! মনুষ্যত্বকে স্বীকার করতে কেন আমাদের আপত্তি! স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল : তুমি কী ভাবছ আমি জানি।

এ কথা আমিই বলব ভাবছিলুম।

সে কি, তুমি আমার মনের কথা কী করে জানবে।

তুমিই বা আমার মনের কথা জানবে কী করে!

তোমাকে যে আমি চিনে ফেলেছি।

আমিও চিনেছি তোমাকে।

কিন্তু সত্যিই কি মানুষকে মানুষ চিনতে পারে! মনকে মন! আজ এই মুহূর্তে বুঝি আমাদের সন্দেহ ছিল না। বুঝি মনে হচ্ছিল, মন দিয়ে মনকে যায় চেনা। যেমন বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিকে বোঝা যায়। স্বাতি বলল: তোমার পরিচয়টা তুমি ভেঙে ফেলতে পার না গোপালদা? তোমার তো শক্তির অভাব নেই, নেই বুদ্ধিরও। তবে কেন নতুন পরিচয় গড়তে পারবে না, কোন সম্মানের পরিচয়!

আমার রোমাঞ্চ হল। স্বাতির অনুরোধ শুনে নয়, তার চিন্তার ধারা জেনে। আমি তবে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলুম। বিশ্বাস হল একটা নতুন কথা। বীণার মতো মনও বাজে। দুটো যন্ত্রকে বাজতে দেখে জগদীশচন্দ্র ঈথারের প্রাণ দেখেছিলেন, আমি দেখলুম ভাবের প্রাণ। এই অপূর্ব পরিবেশের ভিতর দুটো প্রাণ আজ একই সুরে বাজছে। স্বাতির প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারলুম না। শুধু আমার মুখ তুলে ধরলুম তার পরিপূর্ণ দৃষ্টির সামনে।

পারবে না গোপালদা?

স্বাতির কণ্ঠে যেন আকুলতা শুনলুম।

এবারে আর নীরব থাকতে পারলুম না, বললুম: কেন পারব না! কিন্তু তার তাড়া কিসের!

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: মেয়ে হলে তুমি বুঝতে গোপালদা, আমার তাড়া কিসের! এই অনিশ্চয়তা আমার ভাল লাগে না।

কী ভেবে তখুনি বলল: আমি অন্য কথা বলছি না গোপালদা। বাবা মা তোমাকে সম্মানের চোখে দেখবেন, এইটুকুই আমি চাই। এরই জন্যে আমার তাড়া।

সে কথা আমিও বুঝি। কিন্তু উপায় খুঁজে পাই নে। আমাদের নূতন

দেশ। এ দেশে আজও সমানসুযোগ নিয়ে সমান ভাবে বাঁচবার সমান অধিকার তো সবাই পায় নি। আমাদের আদর্শ এখনও সংবিধানের পাতায় আবদ্ধ হয়ে আছে। কত দিন এই ভাবে থাকবে, তাও আজ জানবার উপায় নেই। ভারতের আদর্শকে যাঁরা ফলে ফুলে পুষ্পিত করে তুলতে পারেন সামান্য চেষ্টায়, তাঁরা সবাই তো আজ এক মত নন। কোন দিন কি এক মত হতে পারবেন। আজ সে ত্যাগ কোথায়। এই সুবিধাবাদের যুগে বুদ্ধি থাকলে লুটেপুটে খাও। কে খেতে পেল না, সে বোকারা দেখবে, আর কিছু করতে না পেরে আড়ালে কাঁদবে।

কথা বলছ না যে গোপালদা?

আমি তোমার কথাই ভাবছি। আমার একার ভবিষ্যৎ আমি গড়ে তুলতে পারি, সে বিশ্বাস আমরে আছে। কিন্তু—

কিন্তু কেন গোপালদা!

তাতে আমার আদর্শ থাকবে না। জ্ঞানশঙ্করবাবুর সম্পত্তি নিয়ে রাজা হতে পারি নি যে কারণে, সেই কারণেই কিছু করতে পারি নে। পরের গ্রাস আমি কেড়ে খেতে পারব না!

ভুল কথা। তুমি নিজের গ্রাস নিজে খাবে। আজ তো তোমার প্রাপ্য খাবার অন্যে এসে খেয়ে যাচ্ছে। তুমি এই অন্যায় কেন সত্য বলে মেনে নিচ্ছ!

স্বাতির কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। এমন করে তো সে কখনও কথা বলে নি! এ কথা কি সত্য নয়! হঠাৎ আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

স্বাতি বলল: নীরব থেকে অন্যায়কে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ। এ তোমার স্বার্থত্যাগ নয় গোপালদা, এ তোমার মনোবলের অভাব। শক্তি দিয়ে নিজের পাওনা গণ্ডা তোমায় বুঝে নিতে হবে। সরকার সেধে এসে কাউকে কিছু দেবে না।

আজকের ভারতে এ কথা সত্য বলেই মানতে হবে। কিন্তু এই

সত্যের ভিতর কোথায় একটু বেদনা আছে। প্রচুর জ্ঞান থাকলে তো মানুষ স্বার্থপর হয় না। অযাচিত জ্ঞান বিতরণে কৃপণতাও কোন দিন দেখি নি। অর্থের বেলায় কেন অন্য রকম হবে, কেন অন্য রকম হবে ক্ষমতার বেলায়? আজকের মানুষ যক্ষের মতো আগলে আছে অর্থ আর ক্ষমতা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আজ এরই জন্য হানাহানি করছে। এ দুটি জিনিস না থাকলে বুঝি বাঁচবার কোন সার্থকতাই নেই। স্বাতি বলল: কথা বলছ না যে গোপালদা?

আমি এবারে হাল্কা হবার চেষ্টা করলুম। বললুম: এ সব কথা তোমার মুখে সাজে না।

ক্ষুব্ধ ভাবে স্বাতি বলল: জবাবটা তুমি এড়িয়ে গেলে!

জীবনযাত্রায় সমস্যাটাকে এড়াতে পারলে বেশি খুশী হতুম।

ঠিক এই মুহূর্তে যেন বজ্রপাত হল, একেবারে আমাদেরই পিছনে।

কে, গোপালবাবু না?

হুঙ্কার শুনেই বুঝতে পারলুম যে তিনি কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। এঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়। গোদাবরী স্টেশনে গাড়িতে উঠেছিলেন। তারপর রামেশ্বরে। এ যাত্রায় দেখা হয়েছে পুষ্করে। মামা ও মামী এঁকে এত ভাল চেনেন যে দেখতে পেলেই নানান দুশ্চিন্তায় আকুল হয়ে পড়েন। রামেশ্বরের সেই রাত্রির কথা ভাবলে আজও আমার ভয় হয়। চমকে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

হালদার হাহা করে হেসে উঠলেন। বললেন: ভয় পেলেন কেন! বসুন আপনারা।

বলতে আর আমার সাহস হল না। এই ঘটনা নিয়ে যে কী গল্প ফেঁদে বসবেন, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। মামা মামীর কানে তো যাবেই, যাবে কলকাতার বহু পরিচিত মানুষের কানেও। ভাবনায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলুম।

হালদার বললেন : তোতাদ্রি মঠেই উঠেছেন তো। রাতে আলাপ হবে।

বলে আর অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত পায়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন

স্বাতি আমার হাত ধরে টেনে বসাল। বলল : ভয় পাচ্ছ কেন?

ভয় পাবার কথা নয়?

এ তোমার দুর্বলতা। কোন অন্যায় না করেও কেন ভয় পাবে!

ভয় তো ভগবানকে নয়, ভয় মানুষকে। মুখরোচক গল্প মানুষ বড় চট করে বিশ্বাস করে।

স্বাতি হাসল।

এবারে তার হাসি দেখে আমার রাগ হল। মেয়েটা এমন বেপরোয়া! শুচিতার অহংকারে কি লাজলজ্জাও বিসর্জন দেবে!

স্বাতি পিছন ফিরে দেখল যে হালদারকে আর দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল : চল এইবারে।

রাগত ভাবে আমি বললুম : ফেরার কি দরকার আছে!

স্বাতি হেসে উত্তর দিল : অন্ধকার দেখছ তো! আর দেরি করলে বাবা মা খুঁজতে আসবেন।

অন্ধকার সত্যিই গভীর হয়েছে। আর বিলম্ব করা সঙ্গত হবে না ভেবে আমরা সজোরে পা চালিয়ে দিলুম। আরতির সময় হয়েছে রণছোড়জীর মন্দিরে।

১০

আমাদের কত দেরি হয়েছিল তা বুঝতে পারলুম গোমতীর ঘাটে পৌঁছে। স্বর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে মামা মামী আমাদের অপেক্ষা করছেন, আর রতনদাসকে সঙ্গে নিয়ে রামখেলাওন নামছে সিঁড়ি দিয়ে। উপরে পৌঁছতেই মামী স্বাতিকে ভৎর্সনা করে বললেন : তোকে নিয়ে আর পারি নে স্বাতি!

স্বাতি তৎপরভাবে উত্তর দিল : এখানকার সূর্যাস্ত তো দেখলে না মা ; দেখলে তুমিও উঠে আসতে পারতে না।

ছাপান্নটা সিঁড়ির সব কটা তখনও আমরা উঠি নি। দুধারের ছোট ছোট দোকান থেকে দোকানীরা আমাদের ডাকছিল। স্বাতির কথার উত্তর না দিয়ে মামী সেদিকে এগিয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারলুম যে মামী এতক্ষণ অন্য কাজ করেছেন, আমাদের অপেক্ষা করেই সময় কাটান নি। তা না হলে স্বাতিকে আরও অনেক কথা শুনতে হত। স্বাতি মামীর সঙ্গে গেল, আমি এলুম মামার কাছে। মামা বললেন : তোমাদের দেরি হয়ে এক দিকে ভালই হয়েছে। তোমার মামীর এই বাজারটা দেখা হয়ে গেল।

মামা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে বললেন : একটা পাপ চুকল।

তীর্থ করতে এসে পাপের কথা কেন মনে পড়ছে বুঝতে পারলুম না। মামা বুঝলেন যে আমি তাঁর কথা বুঝতে পারি নি। তাই কিছু জিজ্ঞাসা করে জানবার প্রয়োজন হল না। তিনি নিজেই বললেন : রামখেলাওনকে এইখেনে রেখে তোমার মামী গিয়েছিলেন বাজার করতে। এতক্ষণ ঘুরেও কেনার মতো সামগ্রী খুঁজে পান নি।

মনে হল, অনেক দিন মামাকে এমন আনন্দ পেতে দেখি নি।

বললেন: দ্বারকার বাজার করাটা ডায়েরিতে টুকে রাখতে হবে। বেড়াতে বেরিয়ে কিছু না কিনে ফেরা এই বোধ হয় প্রথম হল।

আমি বললুম: সৌরাষ্ট্রের বাজার শুনেছি রাজকোট আর জামনগরে।

বাঁধানো চত্বরের উপর বসে এক সাধু গান গাইছিলেন। সুরটি মিষ্টি, কিন্তু স্বর অস্পষ্ট। তবু আমার মনোযোগ গেল সেদিকে। কান পেতে আমি তাঁর গান শোনবার চেষ্টা করলুম। গান নয়, স্তোত্রের মতো বন্দনা:

পূর্ব দিশা জগন্নাথ স্বামী, দক্ষিণ দিশা রামনাথ হ্যয়।
পশ্চিম দিশা রণছোড় ত্রিকমজী, উত্তর খণ্ড বদরীনাথ হ্যয়॥

চেষ্টা করে আরও শুনলুম খানিকটা:

গোমতী গঙ্গা নাহিয়ে, দর্শন দেত রণছোড় ত্রিকমজী।
ফির জন্ম নহি লিজিয়ে, আব গমন মিট জাইয়ে॥

লাল কৌপীন পরা ছোটখাটো মানুষ। সকালে বোধ হয় ভস্ম মেখেছিলেন, এখন তা মুছে গেছে। মুখে প্রসন্ন হাসি। লক্ষ্য করে দেখলুম যে তাঁর সামনে ভিক্ষাপাত্র নেই। মামা তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ স্বাতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল: ঐ পদকটা দেখছ গোপালদা! ঐ মেয়েটার গলায়!

বলে একটি গ্রামের মেয়েকে দেখাল আঙুল দিয়ে। মনে হল যে তার স্বামীর সঙ্গে মেয়েটি এসেছে, কিছু কিনছে দোকানে দাঁড়িয়ে। তাদের সজ্জা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। পুরুষটি কাপড় পরেছে মালকোঁচা দিয়ে, হাঁটু অবধি উঁচু ধুতি। গায়ে ফুলহাতা কতুয়া। উপর দিকটা আঁট, নিচেটা ঝালর দেওয়া অদ্ভুত ভাবে। হাতে লাঠি, মাথায় পাগড়ি। মেয়েটি তার ঘাগরার উপরে ওড়না জড়িয়েছে, তার একটা প্রান্ত মাথার উপরে। পিছন ফিরে আছে বলে গলার পদক দেখতে পাচ্ছি না।

মামীও এগিয়ে এসেছিলেন। বললেন: ঐ রকম পদক স্বাতি কিনতে চাইছে, পারবে কিনে দিতে?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আড় চোখে দেখলুম পদকখানি। সুতো দিয়ে গলায় বাঁধা মস্ত বড় পদক। গড়নটি সত্যিই অভিনব। সোনা না পিতলের, তা বোঝা যাচ্ছে না।

আমি রতনদাসের সাহায্য নিলুম। কিন্তু সে আমায় ভরসা দিল না। বলল: শহরে এ সব তৈরি হয় না, বিক্রিও হয় না। তবে স্যাকরাকে হুকুম করলে হয়তো গড়িয়ে দেবে।

পরে আমি অনেক খুঁজেছিলুম। সমস্ত বাজারটাই প্রায় চষে ফেলেছিলুম। কিন্তু কোথাও পাই নি। স্যাকরারাও স্বীকার করল যে গ্রামের সমস্ত মেয়েই অমনি পদক ব্যবহার করে, কিন্তু শহরে চলে না। নমুনা দিলে তৈরী করে দেবে। স্বাতি কিছু ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু তাকে ভরসা দিয়ে বললুম: কলকাতায় ফিরে গিয়ে তোমাদের বাড়ির স্যাকরাকে আমি নমুনা এঁকে দেব।

আরও কয়েকটি মেয়ের পদক ভালো করে দেখে নিলুম। এমন করে মেয়েদের কখনও দেখি নি। স্বাতির শখের জন্যেই এ লজ্জা স্বীকার করলুম।

সাধুর কাছে মামাকে দেখে মামী কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন। বললেন: ওখানে কী করছ?

মামা ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন: তোমরা এগোও না একটু, আমি আসছি।

মামী এগোলেন না, আমার দিকে চেয়ে বললেন: অনর্থক অর্থদণ্ড দেবেন।

আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম, মামা লুকিয়ে সাধুর হাতে কিছু গুঁজে দিয়ে এসে বললেন: চল। দুদণ্ড যে নিশ্চিন্তে কোথাও বসব, তার উপায় নেই।

জুতো নিয়ে ভিতরে যাবার উপায় নেই। মামা মামীর পায়েও জুতো ছিল না। রতনদাস নিচু হয়ে স্বাতির পা থেকে চটি জোড়া খুলে নিল, তারপর হাত বাড়াল আমার পায়ের দিকে। মামা হাঁ-হাঁ করে উঠে বললেন : তুমি কেন জুতোয় হাত দিচ্ছ! ও রামখেলাওন নিক।

তাতে কী হয়েছে!

বলতে বলতেই রতনদাস আমার চটি জোড়াও কেড়ে নিয়ে ভিন্ন পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলুম যে সে তার টাঙ্গার উপরে জুতো তুলে রাখবে।

মন্দিরের দরজাতেই একজন পাণ্ডার ছেলে আমাদের সঙ্গ নিল। মামা তাকে তাড়া দিলেন না, বরং চুপিচুপি আমায় বললেন : নতুন জায়গায় কেউ সব দেখিয়ে দিলেই সুবিধে হয়।

আরতির কিছু দেরি ছিল। ঘুরে ঘুরে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণের অন্য দেব-দেবী সব দেখে নিলুম। এর ভিতর প্রদ্যুম্নের মন্দিরই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণের সমস্ত আত্মীয় পরিজনই আছেন—বলরাম অনিরুদ্ধ সত্যভামা জাম্ববতী রাধিকা ও দেবকী মাতা। আছেন রাধাকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ কেশব কুলেশ্বর পুরুষোত্তম। মহাদেব বেণীমাধব কাশীর বিশ্বনাথ অম্বিকা দেবীও আছেন। আরও আছেন দুর্বাশা দত্তাত্রেয় নবগ্রহ।

শঙ্করাচার্যের সারদা মঠ দেখবার সময় মামা বললেন : শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছিলে মনে পড়ছে, তাঁর জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে।

স্বাতি যোগ করল : সমস্ত আমি ভুলে গেছি।

আমি কিছু বলবার আগেই পাণ্ডার ছেলে বলল : এইবারে আরতি শুরু হবে। এই সময়ে জায়গা দখল না করলে পরে দাঁড়ানো যাবে না।

রণছোড়জীর মন্দিরের দিকে আমরা এগিয়ে গেলুম। গোমতীর তীর থেকে মন্দিরের চূড়া শুধু দেখেছিলুম। সূক্ষ্মাগ্র চূড়া। কে

একজন বলেছিলেন একশো সত্তর ফুট উঁচু। এ হিসেব আমাদের জন্য নয়। এর চেয়ে পাঁচতলার সমান উঁচু বললে আমরা ভাল বুঝতে পারব। উপরে উঠবার সিঁড়িও নাকি আছে। সারদা মঠের অনুমতি পেলে উপরে ওঠা যায়।

কাছে থেকে মন্দিরের বাহিরটাও দেখেছিলুম। পাথরের তৈরী মন্দির। এ নাকি পোরবন্দরের পাথর। এক সময় হয়তো মন্দির-গাত্রে কারুকার্য ছিল। সে সব মূর্তি আজ অস্পষ্ট। আমরা ভিতরের মূর্তি দেখতে ছুটে গেলুম।

প্রশস্ত ভোগমণ্ডপ দেখলুম অনেকগুলি স্তম্ভের উপর। আমাদের পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মণ-তনয় বলল, স্তম্ভের সংখ্যা নাকি ষাট। যাত্রীরা একত্র হচ্ছেন। তাদের ভিতর দিয়ে আমরা রণছোড়জীর সামনে এসে দাঁড়ালুম।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই চোখ আমাদের জুড়িয়ে গেল। কালো পাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি অপূর্ব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বারকাপতি রণছোড়জী বুঝি আমাদের পরিচিত কৃষ্ণ নন। বাঙলায় ও বৃন্দাবনে আমরা যুগল মূর্তি দেখি কৃষ্ণের, দ্বিভুজ মানুষ মূর্তি। এ যেন দেবতার মূর্তি। মর্ত্যের মানুষ নন, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ। পরিপূর্ণ অন্তরে আমরা আরতি দেখতে লাগলুম।

আমার কী হল জানি নে। চোখ বুজে আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। রণছোড়জীর কৃষ্ণ মূর্তিকে ঘিরে আছে একখানি সূক্ষ্ম শাড়ি। চোখ মেলেই আমি চমকে উঠলুম। স্বাতি আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। আমার এই চমকানি দেখতে পেয়েই আস্তে আস্তে কথা কইল: কী হল গোপালদা?

আরতির শব্দে কথা শোনা যাচ্ছে না ভাল করে। তবু আমি উত্তর দিলুম স্বাতিকে: এক অলৌকিক দৃশ্য দেখলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম: দেখলুম, রণছোড়জী যেন শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন।

স্বাতি হাসল আমার কথা শুনে। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। আমার মন হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠল। কেন এমন দেখলুম।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গুনগুন করে গাইছিলেন :

প্যারে দরসন দিজ্যো আয়।
তুম বিন রহিয়ো ন জায়॥
জল বিন কমল, চঁদ বিন রজনী।
ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী॥

এ যে মীরার ভজন। আমি আর একবার চমকে উঠলুম।

স্বাতি আবার আমার মুখের দিকে চাইল।

ভিড়ের চাপে মামা মামীর কষ্ট হচ্ছিল। কোন রকমে দু হাত তুলে প্রণাম করবার চেষ্টা করলেন। তারপর আমাদের ডেকে বেরিয়ে এলেন মন্দিরের বাহিরে।

আমার স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটে নি। স্বাতি আমায় জাগিয়ে দিল। কথা বলে নয়, হাসিতে উচ্ছল হয়ে বলল : গোপালদার কাণ্ড জানো মা!

মামী ধমক দিয়ে বললেন : অত হাসছিস কেন?

মামা বললেন : ব্যাপার কি?

মন্দিরের ভেতর গোপালদা বলছিল, রণছোড়জী নাকি শাড়ি পরে আছেন।

শাড়ি পরার গল্প আমার মনে পড়েছে। বললুম : সবটুকু শুনলে আর হাসবে না।

বল।

বলে স্বাতি পাথরের চাতালের উপর বসে পড়ল। মামার কাছে টাকা নিয়ে পাণ্ডার ছেলে তখন ভোগ কিনতে গেছে। সে না ফেরা পর্যন্ত আমরা এইখানেই অপেক্ষা করব। এই অবসরে স্বাতিকে

আমি মীরার গল্প বললুম: মীরা বাঈএর গল্প তোমাকে চিতোরে বলেছিলুম। তাঁর শেষ জীবনটা কেটেছিল দ্বারকায় এই রণছোড়জীর মন্দিরেই। স্বামীপরিত্যক্তা রাজবধূ গাইতেন:

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসর ন কোঈ।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহীঁ কোঈ॥

ভাবাবেশে মীরা তখন পাগল হয়ে আছেন। চোখের জলে স্নান করিয়ে দিতেন তাঁর দেবতা রণছোড়জীকে।

ওদিকে মেবারের আকাশে দুর্যোগ এসেছে ঘনিয়ে। মনে প্রাণে সবাই ভাবছেন মীরার কথা। মেবারের সৌভাগ্য বুঝি তাঁরই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। অনুতপ্ত রাণা নিজেও বুঝি এই কথাই ভাবছেন। শেষ পর্যন্ত মীরাকে ফিরিয়ে আনাই স্থির করলেন। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের পাঠালেন দ্বারকায়।

রাণার অনুরোধ নিয়ে ব্রাহ্মণরা এলেন মীরার কাছে। মীরা তখন আর রাজবধূ নন, তিনি সমস্ত পৃথিবীর। তাঁর স্থান শুধু রাণার হৃদয়েই নয়, সমস্ত মানুষের অন্তরে তিনি স্থান করে নিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর সেই ক্ষণে সমস্ত ভারত স্পন্দিত হচ্ছে দেবতার নামে। সাধারণ মানুষ মীরাকে ভাবছে দেবতা।

মীরা তাঁর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর ফিরে যেতে রাজী হলেন না। বললেন, তাঁর জগৎ আজ অবারিত হয়ে গেছে। মেবারের রাজঅন্তঃপুর আর তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না। তাঁর আরাধনার ক্ষেত্রকে মানুষ কর্মের জগৎ ভাবছে। তাঁর নামগানকে ভাবছে নামপ্রচার। একদা নাকি মীরার খ্যাতি শুনে ছদ্মবেশে এসেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ আকবর। সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মিঞা তানসেন। মীরার কণ্ঠে হরিনাম শুনে বাদশাহ মোহিত হলেন। এ তো শুধু গান নয়, ঐ সুললিত কণ্ঠে জাদু আছে। গিরিধারীলাল গোপালের পায়ে কঠিন হৃদয়ও যে বিকিয়ে যায়। দেবতার পায়ে বহুমূল্য হার দিয়ে আকবর পালিয়ে গেলেন। হোক এ গল্প, সত্যিও হতে পারত।

সেই মীরা চিতোরের ব্রাহ্মণদের বললেন ফিরে যেতে। কিন্তু তারা ফিরে গেল না। তাঁরই দুয়ারে ধর্না দিয়ে পড়ল।

মীরা বললেন : বেশ। আমি রণছোড়জীর অনুমতি নিয়ে আসি।

দেবতার অনুমতির জন্য মীরা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। আর ফিরলেন না। সকাল বেলায় সমস্ত মানুষ সবিস্ময়ে দেখল রণছোড়জীকে। মীরার পরিধেয় বস্ত্র তিনি নিজেই পরিধান করে আছেন। ভক্তকে গ্রহণ করেছেন অলৌকিক অনুগ্রহে।

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন আমাদের পাশ দিয়ে। গুনগুন করে গাইছিলেন :

প্যারে দরসন দিজ্যো আয়।
তুম বিন রহিয়ো ন জায়॥
জল বিন কমল, চঁদ বিন রজনী।
ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী॥

১১

রাত্রের আহার একটা লজে সেরে আমরা মঠে ফিরে এলুম। মামা মামী স্বাতিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আমি বাহিরে বসলুম বাঁধানো বেঞ্চিটার উপর।

অন্য একটি ঘরের ভিতর থেকে গুনগুন করে কেউ গান গাইছিলেন। স্তোত্র পাঠের মতো গান। এমন মধুর শব্দ যে আমার কান ও মন একই সঙ্গে সে দিকে আকৃষ্ট হল। আমি শুনলুম :

ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্তব চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽন্যগতিং শরণ্যং
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥

আমার সংস্কৃতের সীমিত জ্ঞান নিয়ে এই শ্লোকের অর্থ উদ্ধারে অসমর্থ হলুম। সমস্ত শ্লোকটিও স্পষ্টভাবে শুনতে পেলুম না। আশা ছিল যে কোন সাধুর সাক্ষাৎ পেলে তাঁরই কাছ থেকে মানেটা জেনে নেব।

যিনি গাইছিলেন তিনি থামলেন না। মুগ্ধ মনে আমি শুনতে লাগলুম :

অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং
ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলং আত্মসাৎ কুরু॥

মনে হল যে পরের এই শ্লোকটির মানে বুঝি বুঝতে পেরেছি।— আমি সহস্র অপরাধে অপরাধী, গভীর ভবসাগরে পতিত হয়েছি। হে হরি, এই শরণাগতকে তুমি তোমার করে নাও।

গানের সুরে আমি কোথায় ভেসে গিয়েছিলুম জানি না। চমক ভাঙল আমাদের সাধুজীর কথায়। দুপুর বেলায় যিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, কখন যে তিনি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দেখতে পাই নি। এক গাল হেসে বললেন: গান শুনছেন?

বললুম: হ্যাঁ।

এই হল আমাদের আচার্যের বাণী। স্বামী রামানুজাচার্যের।

আমি তাঁকে অনুরোধ করলুম: এর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দেবেন?

সাধুজী আরও একটুখানি মিষ্টি হাসি হেসে বললেন: বকলমা দেবে, বকলমা?

এই অদ্ভুত কথাটি আমি রামকৃষ্ণের কথামৃতে পড়েছি। ঠাকুর বলতেন, বকলমা দেবে?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললেন: ঠিক ধরেছেন, এ হল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা। ভগবান ভক্তের নন, ভগবান শরণাগতের। একান্ত ভাবে আত্মনিবেদন করলেই ভগবানের কৃপালাভ হয়।

এই শ্লোক দুটির মানে বুঝি তাই?

দ্বিতীয় শ্লোকটির মানে ঠিক তাই। প্রথম শ্লোকে আচার্য বলছেন, আমি ধর্মনিষ্ঠ আত্মবেদী নই, তোমার চরণ-অরবিন্দে ভক্তিমানও নই। হে শরণ্য, আমি অকিঞ্চন ও অনন্যগতি হয়ে তোমার পাদমূলে শরণ নিচ্ছি।

আমি তাঁর দৃষ্টিতে এক রকমের ভাবালুতা দেখলুম। তিনি বললেন: আচার্যদেব এ গান গাইতেন শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে। একশো কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত এই গান তিনি গেয়ে গেছেন।

রামানুজ স্বামী একশো কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন, অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরঙ্গমে। কিন্তু এ তো তাঁর বাহিরের পরিচয়। তাঁর অন্তরের সংবাদ কজনে রাখে! ষোল বছর বয়সে বিয়ে করে তিনি সংসারী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুখী হতে পারেন নি। পত্নীকে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে সন্ন্যাসী হলেন। তারপর বার হলেন তীর্থ পরিক্রমায়—দক্ষিণ

থেকে উত্তরে কাশ্মীর রাজ্যে। তিনি দেখেছিলেন যে শঙ্করাচার্য তাঁর মায়াবাদ প্রচার করে বৌদ্ধ প্রভাবকে দমন করেছিলেন দৃঢ় ভাবে। কিন্তু সাধারণের উপযোগী কোন ধর্ম মতের প্রতিষ্ঠা করেন নি। দেশ ডুবে যাচ্ছে ভ্রান্ত ধারণার ভারে। তর্ক আর ধর্ম তো এক নয়। তর্কের উৎস বুদ্ধি থেকে, আর ধর্ম হৃদয়ের জিনিস, ভক্তি দিয়ে প্রেম দিয়ে তার উপলব্ধি। তাই সাধারণ মানুষের উপযোগী করে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করলেন :

অকিঞ্চনোঽনন্যগতিং শরণ্যং
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে।

বারে বারে আমি এই পদটি শুনতে লাগলুম। মনে হল, যিনি গাইছিলেন তিনি তাঁর সমস্ত দেহ মন দিয়ে শরণ্যের পায়ে আত্ম-নিবেদনের আকুতি জানাচ্ছেন।

এই তো দেবতা, এই জন্যেই তাঁর প্রয়োজন। স্বার্থ বিস্মৃত হলেই তো দেবতার সাক্ষাৎ, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রসাদ। ইচ্ছে হল, আমিও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠি :

অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া
কেবলং আত্মসাৎ কুরু।

এই যে, গোপালবাবু এখানে! ফিরেছেন তাহলে!

রসভঙ্গ করলেন কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার। কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর কাজই এই। রসের সন্ধান যে জানে, সেই রসভঙ্গ করে। তাতে আপত্তি ওঠা উচিত নয়। কিন্তু হালদার তার চেয়ে যা বেশি করেন, সেটুকুর জন্যেই আপত্তি। অন্ধকারেও তাঁর দুপাটি দাঁত দেখতে পাচ্ছিলুম।

বললুম : ফিরতে হল।

ভদ্রলোক সরাসরি আমার পাশে এসে বসলেন। সামনে লক্ষ্য করে দেখলুম যে সাধুজী কখন এক সময় সরে গেছেন। এরই মধ্যে তিনি কি হালদারের পরিচয় পেয়ে গেছেন! ভদ্রলোকের খালি গা,

খালি পা। প্রথমেই ঝোলানো পা দুখানা একটুখানি উঁচু করে দু পায়ে ঘষে ধুলো ঝাড়লেন, তারপরেই পা তুলে জাঁকিয়ে বসলেন। আমি বিরক্ত হয়েছিলুম, বোধ হয় তার আভাস পেয়েছিলেন আমার কথায়। বললেন: কতক্ষণ ফিরলেন?

সংক্ষেপে উত্তর দিলুম: একটু আগে।

ভদ্রলোক চারিধারে একবার চেয়ে দেখে বললেন: সবাই শুয়ে পড়েছেন বুঝি?

আমি উত্তর দিলুম মাথা নেড়ে।

হালদার বললেন: কী কাণ্ড বলুন!

আমি জানি যে ব্যাপারটা হয়তো নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ ঘটনাকেই মুখরোচক করে পরিবেশন করবার চেষ্টা করছেন। আমাকে আগ্রহ প্রকাশ করতে হল না, ভদ্রলোক নিজেই বললেন: আমি ঐ নেপোর বাপের কথা বলছি।

নেপোকেই আমি চিনি নে, তো তার বাপ!

চেনেন না নেপোকে? আরে মশাই, মেটেবুরুজের নেপো, নেপাল মল্লিক।

নেপো দরজি?

হালদার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: দরজি! দরজি কেন হবে! মেটেবুরুজে থাকলেই কি মানুষ দরজি হয় নাকি!

থতমত খেয়ে আমি বললুম: তা বটে।

হালদার আর একটা হুঙ্কার ছাড়লেন: তা বটে মানে!

কথা বলাই দায় দেখছি। তাই আর জবাব দিলুম না। হালদার একটু নরম সুরে বললেন: নেপোর বাপ অবিশ্যি এখনও দরজিগিরি করছে।

মনে মনে আমি হাসলুম। কিন্তু কোন কথা কইবার সাহস হল না। হালদার বললেন: কাণ্ডটা শুনেছেন! সেই নেপোর বাপও রেলের পাসে দ্বারকায় এসেছে।

বেশ তো।

ভদ্রলোক একটা বিকট ভেংচি কেটে বললেন : বেশ তো! বেশ তো বললেই ব্যাপারটা মিটে গেল!

উত্তর দিলে আরও বিপদ ডাকা হবে ভেবে চুপ করে গেলুম। হালদার বললেন : বুদ্ধি দেখিয়ে বুড়ো তাক লাগিয়ে দিলে। কোন্ বুড়ো বলুন তো?

একই নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন আমাকে।

আমি নিঃসন্দেহেই বললুম্ : নেপোর বাপ।

কী মরণ! নেপোর বাপ কেন হবে! আমি বলছি সেই মৈত্তিরের কথা।

কোন্ মৈত্র?

হালদার ভেঙচি কেটে বললেন : এরই মধ্যে ভুলে গেলেন তাকে! আরে সেই মৈত্তির, রামেশ্বরের মাটিতে পা দিয়েই যে পালিয়ে গেল ছুটি ফুরিয়ে যাবার ভয়ে!

মৈত্র মশায়ের কথা আমার মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারতের পথে আমাদের পরিচয়। তাড়াতাড়ি বললুম : তিনিও এসেছেন নাকি?

বিরক্ত ভাবে হালদার বললেন : আপনাকে নিয়ে আর পারি নে। সে এখানে কোন্ দুঃখে আসতে যাবে!

দুঃখের জন্য আমরাও আসি নি। কিন্তু আর কোন জবাব দিলুম না। হালদার বললেন : এবারে বেরবার আগে মৈত্তিরকে ধরেছিলুম একখানা রেলের পাসের জন্যে।

হালদার মশায়ের কানে একটা বিড়ি গোঁজা ছিল। বাঁ হাতে বিড়িটা সংগ্রহ করে বললেন : কথাটা যখন উঠেই পড়ল, তখন একটা বিড়ি ধরাই।

বলেই বেঞ্চি থেকে নেমে পড়লেন। খানিকটা এগিয়েই ডাকলেন : ও মশাই, আপনার নামটা কী ভুলে গেলুম।

আমাদের সামনেও যাত্রীদের থাকবার জন্য কয়েকখানা ঘর আছে।

সেইখান থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে কুয়োর দিকে যাচ্ছিলেন। ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর হালদারকে দেখতে পেয়ে বললেন : আমার নাম ?—অধরচন্দ্র সরকার।

হালদার ততক্ষণে ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছে গেছেন, বললেন : নাম শুনে আর করব কী, ও তো আবার ভুলে যাব। তার চেয়ে আপনার দেশলাইটা দিন। নিজের অধরের একটুখানি সুখ করে নিই।

কথা না বলে অধরবাবু তাঁর দেশলাইটি বার করে দিলেন। আর হালদারও বিনা বাক্য ব্যয়ে বিড়িটি ধরিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। ভেবেছিলুম, এই অবসরে সরে পড়ব। কিন্তু তারপরেই মনে হল, হালদারও তীর্থযাত্রী। যাত্রীকে বাদ দিয়ে তীর্থ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। যাত্রীর জন্যই তো তীর্থের মাহাত্ম্য। যাত্রী না এলেই দেবতার মাহাত্ম্য যাবে ফুরিয়ে।

হালদার ঠিক আগের মতো করেই তাঁর আসনটি দখল করে বললেন : কার কথা বলছিলুম ?

আমি তাঁর কথার সূত্র ধরিয়ে দিতে বললুম : মৈত্র মশায়ের কথা।

খুশী হয়ে হালদার বললেন : ঠিক বলেছেন। কী বলছিলুম যেন ?

রেলের পাসের কথা।

পড় পড় করে বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে হালদার বললেন : খাঁটি কথা। দাঁড়ান একটু, বিড়িটা নিবে গেলেই বিপদ হবে।

আমি বসে বসে তাঁর বিড়ি টানা দেখতে লাগলুম। এক সময় নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন : বিচিত্তির লোক মশাই আপনাদের সেই মৈত্তির। ভদ্রলোক রেলের চাকর, সগুষ্টি পাস পায়, বেড়ায় কিনা একা একা! বাড়িতে অগুনতি এঁড়িগেঁড়ি, তাদের পাহারায় রেখে আসে বৌটাকে। বুঝলেন গোপালবাবু, ঐ মৈত্তিরের ঠিকানাটা আমি জেনে রেখেছিলুম। বেরবার আগে গিয়েছিলুম তার কাছে। একখানা পাস যোগাড় করে দিলে চোদ্দটা ছেলেমেয়ে শুদ্ধ

পরিবারকেও নিয়ে আসতুম। কিন্তু বিচার নেই ভগবানের, তাই অপাত্রে সুযোগ দেন।

মনে পড়ল যে এ কথা তিনি আমাকে রামেশ্বরেও শুনিয়েছিলেন। তাঁর এই ক্ষোভের কথা। কিন্তু আমি কোন মন্তব্য করবার চেষ্টা করলুম না। হালদার বললেন: জানেন, কী বললে আপনাদের পেয়ারের মৈত্তির?

প্রশ্ন না করে আমি তাঁর মুখের দিকে ফিরে তাকালুম।

বললে, আপনি কি পাগল হয়েছেন হালদার মশাই! শুনুন তার কথা একবার।

তারপরই হাতের বিড়িটা টানতে গিয়ে দেখলেন যে সেটা নিবে গেছে। বললেন: দেখলেন তো, বিড়িটাও শত্রুতা করল।

ভেবেছিলুম, পোড়া বিড়িটা বোধ হয় ফেলে দেবেন। কিন্তু তা দিলেন না। আবার কানের উপরে গুঁজে রাখলেন। বললেন: কী বলছিলুম?

আপনার পাগল হবার কথা।

আমার পাগল হবার কথা!

ভদ্রলোক আমাকে প্রায় মারতে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: মৈত্র মশাই তো তাই বললেন আপনাকে।

আশ্বস্ত হয়ে হালদার বললেন: ও নিজেই তো একটা পাগল। কিন্তু আমাকে কেন পাগল বলল জানেন? আমি পাস চেয়েছিলুম বলে। আমাকে পাস দিলে নাকি ওর আটাশ বছরের চাকরিটা এক দিনে চলে যাবে। শুনুন কথা।

তারপরেই বললেন: এ দিকে দেখুন নেপোর বাপের কারবার। ছেলে মেলের চাকর, বাপের পাস নাকি পায় না। কিন্তু বুড়ো বাপের ব্যবস্থাটা তো করে দিয়েছে! ইচ্ছে থাকলে কী না করা যায়! আপনিই বলুন।

বলে আমার দিকে তাকালেন উত্তরের আশায়।

তাঁকে খুশী করবার জন্য বললুম : তা বটে।

হঠাৎ তাঁর গলার স্বর নামিয়ে বললেন : গোঁসাইজী ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি?

মামা ঘুমিয়ে না পড়লেও শুয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন : দুচক্ষে আমায় দেখতে পারেন না। বুড়ি তো জ্বলতে থাকেন। ওঁরা কেন, অমন লোক ঢের আছেন কলকাতায়। আর আছেন বলেই আমার তীর্থগুলো দেখা হচ্ছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। হালদার বললেন : আমার বয়েস দেখে তো মেয়ের বাপ ভুলবে না যে খরচ করে তীর্থ ঘুরিয়ে আনবে। রেলের পাসেরও কোন আশা দেখছি না। কাজেই গাঁটের কড়ি হল আমার সম্বল। এখন বুঝুন, সেই কড়ি আসে কোত্থেকে। সোজা আঙুলে তো ঘি ওঠে না গোপালবাবু, সময় মতো তাই একটু বেঁকিয়ে দিই।

হঠাৎ তাঁর পুরু ঠোঁটের ভিতর থেকে নোংরা দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল। বললেন : সেবারের গল্প আপনার মনে আছে তো! রামেশ্বরের রাসলীলার গল্প! সেই গল্প ভাঙিয়ে হরিদ্বার ঘুরে এসেছি। এবারে ভাবছি অমরনাথ ঘুরে আসব।

এবারের মক্কেল বুঝি ভারি শাঁসালো?

হালদার হেসে উঠলেন হা-হা করে, বললেন : অঘোর গোস্বামী বুঝি শাঁসালো মক্কেল নয়!

মামা!

আমি বুঝি আর্তনাদ করে উঠেছিলুম।

হালদার বললেন : ভয় কি ভাই, অন্ধকারে নির্জনে একটু প্রেমালাপ করে গরিব ব্রাহ্মণেরই তো উপকার করেছেন।

এই করে আপনি তীর্থের কড়ি যোগাড় করেন! ছিঃ!

এই মুহূর্তে হালদারকে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু

হালদার তাতে একটুও রাগ করলেন না। বললেন: সেদিন আর নেই রে ভাই, যে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে। ধর্মের জন্যে এমন অধর্ম তাহলে করতুম না।

আমার ঘৃণা তাতে কমল না। বললুম: এবারে কার সর্বনাশ করে এসেছেন?

তেমনি নোংরা হাসি হেসে হালদার বললেন: তীর্থস্থানে মিথ্যে বলব না গোপালবাবু, এখানে ও সব জিজ্ঞেস করবেন না।

আমি উঠে পড়েছিলুম রাগ করে। হালদার বললেন: রাগ করছেন কার ওপরে? এ'হল কলিযুগ, যুগের ধর্মই এই। মিথ্যা দিয়েই কি জগৎটা চলছে না?

চলতে গিয়েও আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। সন্ন্যাসীর গান তখন থেমে গেছে।

১২

বিছানার উপর কাত হয়ে শুয়ে মামা পাইপ টানছিলেন। মামী শুয়েছিলেন একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে। স্বাতি তার ক্যামেরায় একটা নূতন ফিল্ম লোড করছিল। রামখেলাওন যে পিছনের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, তা তার কাশির শব্দ শুনেই বুঝতে পারছিলুম। আমার পায়ের শব্দ শুনেই মামী বললেনঃ দরজাটা বন্ধ করে এস।

দরজাটা আমি বন্ধ করে দিলুম।

মামা বললেনঃ কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

বললুমঃ কালীঘাটের হালদার মশায়ের সঙ্গে।

কালীকেষ্ট হালদার! লক্ষ্মীছাড়া এখানে এসে জুটেছে?

বলে মামা সোজা হয়ে বসলেন।

হাসবার চেষ্টা করে বললুমঃ আপনি তাকে ভয় পান নাকি?

ভয়! ভয় পাব কেন! তবে কী জান? লোকটা একেবারেই সুবিধের নয়। ধর্মের নামে অধর্ম করে হাত পাকিয়েছে। মন্ত্রের নামে নিন্দে ছড়ায়, আর ধর্মসভায় করে পরচর্চা।

মামা আমাকে আগেও এ কথা বলেছিলেন। রামেশ্বরের সেই ঘটনার পর মামী মরে যাচ্ছিলেন হালদারের ভয়েই। দেশের রুচি আজ আর অজানা নেই। নীতিবাক্য কেউ শোনে না, দুর্নীতির গল্প শুনতে আসে ভিড় করে। পাড়ায় কীর্তন হবে শুনলে পুলিসে খবর দেয়, আর বিড়ির বিজ্ঞাপন নিয়ে মেয়ে বেরিয়েছে শুনলে বড় রাস্তাতেও গাড়ি আটকে যায়। এ দেশে মুখরোচক মিথ্যে কেউ যাচাই করে দেখে না বলেই মামীর দুর্ভাবনার শেষ নেই। এ সবই মামার কথা। মাদুরায় আমাকে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন।

খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে আবার বললেন : কী বলছিল লক্ষীছাড়া ?

সত্যি কথা আমি স্বীকার করলুম, বললুম : সমুদ্রের ধারে স্বাতিকে দেখেছেন আমার সঙ্গে।

দেখেছে বলছে ?

মামা যেন কেঁপে উঠলেন। আর গায়ের চাদর ফেলে দিয়ে মামী উঠে বসলেন বিছানার উপরে।

তাইতো বলছে !

মামী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন : আমি আগেই জানতাম যে এমন একটা কেলেঙ্কারি হবে। *

কিন্তু স্বাতি ভয় পাবার মেয়ে নয়, বলল : কেলেঙ্কারি কিসের !

মামী যেন গুমরে উঠলেন : কিসের কেলেঙ্কারি তা তুমি বুঝবে কেন !

স্বাতি বলল : তোমরা ভয় পাও বলেইতো ও অমন পেয়ে বসেছে।

মামার দিকে চেয়ে মামী বললেন : সেবারের কথাটা একবার ভেবে দেখ। অমন সম্বন্ধটা—

মামা ধমকি দিয়ে বললেন : রাখ তোমার সম্বন্ধ।

কিন্তু সেই সম্বন্ধের শোক মামীর আজও যায় নি। বললেন : অমন পাত্র তুমি আর একটা পেলে ?

তর্কে মামা হারতে রাজী নন। একটা ভেংচি কেটে বললেন : পাত্তর, না বাঁদর !

মামা-মামীর কাছে আমি এই পাত্রের সম্বন্ধে বেশি কিছু শুনি নি। যা শুনেছি তা হালদারের কাছে। বলেছিলেন, কোথাও একটু গণ্ডগোল আছে। বিলেত ফেরত সাহেব পাত্তর, গায়ে এখনও মেমের গন্ধ বোধ হয় লেগে আছে। এ কথাও বলেছিলেন যে গায়ের জোরে বিয়ে পাকা করেছেন বুড়ি নিজে, কিন্তু বুড়োর কোথাও খচখচ করছে। আজ এঁদের কথা শুনে আর সন্দেহ রইল না যে হালদার আমাকে খাঁটি খবর দিয়েছিলেন।

মামী বললেন: বছর তো ঘুরে গেল, পারলে কিছু সুরাহা করতে?

নিতান্ত তর্কের খাতিরেই বোধ হয় মামা বললেন: সুরাহা আমার করা আছে।

সে তো দেখতেই পেলাম! এত জল্পনা-কল্পনা, এমন পাকা ব্যবস্থা, সবই ভেস্তে গেল।

মামী যে রাণার কথা বলছেন, তা বুঝতে কষ্ট হল না। দিল্লীতে রাণার সঙ্গে স্বাতির বিয়ে মামী পাকা করেছিলেন। কথা ছিল, এবারের ভ্রমণে রাণাই তাঁদের সঙ্গী হবে। কিন্তু বিধাতার অন্য ইচ্ছা। রাণা ছুটি পেল না। শুধু পুজোর কয়েকটা দিন তার স্বাধীনতা। ঠিক হয়েছিল যে এই কয়েকটা দিন রাণা আবু পাহাড়ে কাটাবে সবার সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তাও হল না। রাণার বদলে এল চাওলা। দিল্লীর সেই পাঞ্জাবী যুবকটি, রাণার বোন মিত্রাকে যার ভাল লেগেছে, মিত্রাকে যার চাই। এসেছে মিত্রার জন্য তারই সঙ্গী হয়ে। চাওলা বুদ্ধিমান। তাই রাণার অনুপস্থিতির কারণ জানিয়েছে একটি মাত্র শব্দ দিয়ে। চাকরি। এর বেশি সে একটি কথাও বলে নি। বুদ্ধিমান যারা, তাদের অনুমান করতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় নি। রাণা আসতে পারে নি, বাপের অনুমতি পায় নি। চাকরির নামে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। সিনিয়ার ব্যানার্জি বৃটিশ সরকারের ঝানু সিভিলিয়ান। কোন্ ঘর থেকে বউ আনলে ছেলের ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল হবে, তা তিনি রাণার চেয়ে ভাল বোঝেন। রাণা তাই পুজোর ছুটি কাটাল দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙে।

মামা উত্তর দিলেন: ব্যবস্থা তো তোমারই।

ক্ষুব্ধ মনে মামী বললেন: মেয়েটা আমার কিনা!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: ঠিকই বলেছ। সে কথাও কালীকেষ্টকে জানিয়ে দেব।

মামী আবার আঁৎকে উঠলেন। বললেন: আমি আর ভাবতে পাচ্ছি নে বাপু।

মামা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে বললেন: এর মধ্যে ভাবাভাবি কী আছে! ঐ লক্ষ্মীছাড়াকে আমি আর ভয় পাই নাকি! কী করবে আমার! কী বলে বেড়াবে!

আশ্চর্য হয়ে মামী বললেন: তুমি কি পাগল হলে! বুঝতে পারছ না, দেশে ফিরে কী সর্বনাশ করবে!

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন: সে আমি বুঝব।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম: আপনার পয়সায় এবারে অমরনাথ যাবে বলছে।

যাওয়াচ্ছি। বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবে যে হেঁটে ফিরতে হবে কালীঘাটে। ট্রাম ভাড়ার পয়সা যদি পায় তো আমার নাম অঘোর গোস্বামী নয়।

দু চোখ বিস্ফারিত করে মামী মামার দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ এত সাহস তিনি পেলেন কোথা থেকে! স্বাতি তার ক্যামেরা তখন তুলে ফেলেছিল। আমার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। সে হাসি মামা দেখতে পেলেন না।

স্বাতির হাসিটি আমার অদ্ভুত লাগল। মনে হল যে মামার নির্ভীক হৃদয়ের সংবাদ তার জানা আছে। স্বাতিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। কিন্তু মামা নিজে যে তাকে লক্ষ্য করেছিলেন আমি তা দেখতে পাই নি। জানতে পারলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে। বললেন: হাসলি যে!

স্বাতি প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরেই সামলে নিয়ে বলল: যা কিছু দেখছি, সবই অদ্ভুত!

কিছু বুঝতে না পেরে মামা তার মুখের দিকে তাকালেন। আমি জানি, এ স্বাতির ছল। কী বলবে তাই ভাবছে। আমি সাহায্য

করতে পারতুম, কিন্তু করলুম না। স্বাতি বলল: সারদা মানে তো সরস্বতী, কিন্তু সারদা মঠে সরস্বতীর মূর্তি কোথাও দেখলাম না।

তার কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। মামী শুয়ে পড়ে চাদরখানা আবার টেনে নিলেন, মামা মন দিলেন পাইপের তামাকে। আমি সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বললুম: দুর্গার নামও সারদা।

খানিকটা আরাম পেয়ে স্বাতি বলল: শঙ্করাচার্যের চারটি মঠের নাম করেছিলে মনে পড়ছে। কোথায় তা ভুলে গেছি।

বললুম: দ্বারকায় সারদা মঠ দেখলে। পুরীতে গোবর্ধন মঠ। দক্ষিণ দেশে শৃঙ্গেরী মঠ আর উত্তরে হিমালয়ের ওপর যোশী মঠ। এ সমস্তই শঙ্করাচার্য নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর এক একজন উপযুক্ত শিষ্যের হাতে এই সব মঠ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: দাঁড়াও, এইবারে তোমার বিদ্যের পরীক্ষা করি। সারদা মঠের প্রধান পরিচালকের নাম বল।

পরিচালক নয়, বল অধ্যক্ষ বা আচার্য। তাঁর নাম ছিল হস্তামলক।

স্বাতি হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে।

বললুম: তুমি সুরেশ্বরাচার্যের নাম করবে তো! আমি জানি।

কেন জানি, সে কথাও বললুম: আমার এক স্কুলের বন্ধু সন্ন্যাসী হয়ে মঠে আছে। তাকে বোঁচা বলে ডাকলে সে আর সাড়া দেয় না, বলতে হয় মহারাজ।

স্বাতি আরও হাসল। মামী শুয়ে শুয়েই ধমক দিলেন: অত হাসছিস কেন?

গোপালদা কী বোকা দেখ!

বোকা না হলে তোমার সঙ্গে তর্ক করি!

কিন্তু স্বাতি তার পুরনো কথারই জের টেনে বলে: এ সব আচায্যির নাম আমি কি জানি যে ভুল ধরতে যাব! একটা অদ্ভুত নাম শুনে হেসে উঠেছিলাম, গোপালদার ভুলটা অমনি ধরা পড়ে গেল।

এবারে মামাও হাসলেন। তারপর হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায়

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললেন: বুঝলে গোপাল, একটা খবর আমার অস্পষ্ট মনে পড়ছে।

আমি কোন প্রশ্ন না করে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন: দ্বারকায় এই শঙ্করাচার্যের পদ নিয়ে বোধ হয় একটা মামলা হয়েছিল।

ভারতে এখন অনেক শঙ্করাচার্য। আদিগুরু চার ধামে চারটি মঠ স্থাপন করে চারজন শিষ্যকে এই সব মঠের ভার দিয়ে যান। তারপর একজনের পর আর একজন সেই গদিতে বসেছেন। লোকে সবাইকে শঙ্করাচার্য বলে। এই সারদা মঠেই পঁচাত্তর জন শঙ্করাচার্য হয়েছেন। তাঁদের ছোট ছোট পাথরের মূর্তি মঠে সাজানো আছে। আদিগুরু শঙ্করের আছে বড় মূর্তি। একদা সমস্ত মঠই স্বাধীন ছিল। কাজেই মঠাধ্যক্ষ নিয়োগে বাহিরের হস্তক্ষেপ ছিল না। তারপর বরোদার মহারাজার হাতে এল দ্বারকার মন্দিরের অধিকার। সারদা মঠও তাঁর অধীন হল। শঙ্করাচার্য রাজরাজেশ্বরানন্দ গুজরাতের তীর্থ ডাকোরে গিয়ে নূতন মঠ স্থাপন করলেন, আর বরোদা সরকার নিযুক্ত করলেন চন্দ্রশেখর আশ্রমকে। মামা ঠিকই বলেছেন। এই সময়েই পুরীর গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ বরোদার মহারাজের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তিনি তাঁর গুজরাতী শিষ্য স্বরূপানন্দকে সারদা মঠের শঙ্করাচার্য করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত লড়াই করে হেরে গিয়েছিলেন। এ সমস্ত কথা আজ ইতিহাসের কথা হয়েছে। মামা খবরের কাগজে দেখেছেন কিনা জানি না, পুরীর গোবর্ধন মঠে হয়তো শুনে থাকবেন। আমি সংক্ষেপে তাঁর উত্তর দিলুম: হ্যাঁ, পুরীর শঙ্করাচার্য মামলা করেছিলেন বরোদার গাইকোয়াড়ের বিরুদ্ধে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন।

স্বাতি বলল: কিসের মামলা?

শঙ্করাচার্যের গদি নিয়ে।

স্বাতি যেন হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। বললুম : এত হাসি কিসের ?

হাসব না। গদিতে বসলেই বুঝি শঙ্করাচার্য হওয়া যায়! আচার্য শঙ্করকে কে গদিতে বসিয়েছিল ?

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : রাজার সিংহাসনে বসে যদি রাজা হওয়া যায় তো শঙ্করাচার্যের গদিতে বসে শঙ্করাচার্য হওয়া যাবে না!

মাথা নেড়ে মামা বললেন : অকাট্য যুক্তি।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল : আচ্ছা গোপালদা, শঙ্করাচার্যের সমাধি আমরা কাঞ্চীপুরে দেখেছিলুম, তাই না ?

বললুম : সমাধি দেখেছিলুম ঠিকই, কিন্তু কোথায় তাঁর সমাধি হয়েছিল তা কেউই জানে না। বত্রিশ বছর বয়সের পর তাঁকে আর দেখা যায় নি। এই সত্যটুকুই সবাই জানে।

চিন্তান্বিত ভাবে স্বাতি বলল : মনে পড়ছে শঙ্করের মত সম্বন্ধে তুমি আমাদের অনেক কিছু বলেছিলে। সবই ভুলে গেছি।

মামা বললেন : মায়াবাদ।

উত্তরে আমি বললুম : একটা ছোট সংস্কৃত শ্লোক মনে রাখলেই সব মনে রাখা হবে। খুব সোজা শ্লোক।

সংস্কৃতে স্বাতির উৎসাহ নেই। বোঝে না বলেই নেই। সংস্কৃত না পড়েও আজকাল লেখাপড়া শেষ করা যায়। অনুশীলন করে যা শিখতে হয়, তা শেখবার রীতি আজকাল উঠে যাচ্ছে। এ হল সরলতার যুগ। মনের বা কাজের সরলতা নয়, সরলতা শিক্ষার। বিনা পরিশ্রমে যতটুকু হয়, ততটুকুই এ যুগের মান। কিন্তু মামা অন্য যুগের মানুষ। বললেন : বল তো তোমার শ্লোকটা।

কার লেখা কোথায় পড়েছি তা মনে নেই। কিন্তু কথাগুলো মনে ছিল। বললুম :

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

স্বাতির দিকে চেয়ে আমি প্রশ্ন করলুম: দেখছ তো কেমন সোজা শ্লোক!

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: সোজাই বটে।

মামা বাধা দিয়ে বললেন: দাঁড়াও দাঁড়াও; বুঝতে পারব বলেই মনে হচ্ছে। আর একবার বল তো।

আমি আর একবার শ্লোকটি বললুম। খুশী হয়ে মামা বললেন: এক কোটি গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা আমি আধখানা শ্লোকে বলছি। পরের লাইনটা আবার বল।

আমি তা বলতেই মামা বলে উঠলেন: ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্ম হলেন এক।

স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম: দেখলে তো!

মামার মুখমণ্ডল বুঝি গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন: টুলো পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়েছিলুম গোপাল। চর্চার অভাবে সব ভুলে গেছি।

স্বাতি বলল: সেবারে তুমি বেশ সোজা কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলে।

বললুম: মাধ্যমিক বৌদ্ধরা ছিলেন শূন্যবাদী। তাঁরা বললেন,

রূপাণি রূপী পশ্যতি শূন্যম্।
বিজ্ঞানত্যায়তনং পশ্যতি শূন্যম্॥

এ কোন নূতন ধারণা নয়। ভাগবতেও এই কথা আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বললেন যে সৃষ্টির পূর্বে কিছু ছিল না, এ কথা সত্য নয়। অসৎ থেকে সৎএর উৎপত্তি হতে পারে না। বৈদিক মন্ত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকালের আগেও কিছু বিত্তমান ছিল। তা চিন্মাত্র পরম ব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, আর অসৎ হল জগৎ।

তাঁর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি দৃষ্টির অগোচর, শব্দের অগোচর, মনের অগোচর,বাক্যেরও অগোচর।

তিনি কার্য নন, কারণ নন, তিনি জ্ঞাত নন, জ্ঞেয় নন। তিনি সমস্ত জ্ঞানের ও ক্রিয়ার অতীত।

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: ভাল করে বল গোপালদা, বেশ ঘুম আসছে।

মামারও হাই উঠল দেখলুম। বললুম: এই সত্য দর্শনের জন্যে সেদিনের ঋষিরা নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেছেন। আর আজ দর্শনের নামে আমাদের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

ঘরের একটা কোণায় আমারও বিছানা পাতা হয়েছিল। সেদিকে যাবার সময় বললুম: দর্শনকে আমরা ঘুমের ওষুধ বলব, সেদিন আসতে আর বেশি দেরি নেই।

দেওয়ালের টিকটিকিটা ডাকবার আর সময় পেল না। এই সময়েই ডেকে উঠল: ঠিক ঠিক!

১৩

দ্বারকায় একটা দিন থেকে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না। তীর্থে বেরিয়ে মানুষ হিসেবের কথা ভুলে যায়—পয়সার হিসেব, সময়েরও। কিন্তু মামী এ যাত্রায় সময়ের হিসেবটা ভুলতে রাজী হন নি। বলেছিলেন : আট তারিখে বাবা সোমনাথের পূজো দিতে হবে, একটা দিন দেরি হলে আমার চলবে না।

মামা কোন প্রতিবাদ করেন নি। আমার দিকে তাকিয়ে স্বাভি বলেছিল : সত্যিই চলবে না।

কাজেই আমিও আর প্রতিবাদ করি নি। দ্বারকায় আমরা পুরো একটি দিনও থাকতে পারলুম না। বেট দ্বারকা আছে। বেট দ্বারকা বাদ দিলে একটি দিন থাকা যেত।

সূর্যোদয় তখনও হয় নি। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাহিরে সেই গাছের নিচে বেঞ্চির উপর বসে এই কথাই ভাবছিলুম, এত দূর দেশে তীর্থ করতে এসেও এই তাড়াহুড়ো! দিন দিন পৃথিবীটা যেন বেশি ছটফটে হচ্ছে, সেই সঙ্গে মানুষগুলোও। নিজের কথাই লোকে ভাববার সময় পাচ্ছে না তো ধর্মের কথা ভাববে কখন! নিতান্ত সংস্কারের বশেই ব্রাহ্মণ বাপ ছেলের পৈতে দিচ্ছেন, দিন তিনেক গায়ত্রী জপও করাচ্ছেন। তারপর ছেলের মর্জি। গলায় পৈতে আছে এমন ব্রাহ্মণ সন্তান দেখলে পুণ্য হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—সংস্কারের বালাই এঁদেরও কমে যাচ্ছে। ধর্মাচরণ কতকটা স্কুল কলেজের অপ্‌সনাল সাবজেক্টের মতো। নাও ভাল, না নিলেও ক্ষতি নেই। হিন্দু ধর্মের তাতে কিছুই যাবে আসবে না। মোগল বাদশাহরা জিজিয়া কর লাগিয়ে কিছু ধর্মান্তরিত করলেন, বিদেশীরা

সভ্যতা শেখাবার নামে এখনও ধর্মান্তরিত করে চলেছেন। আমরা ভাল মানুষ, সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজের ধর্মকে দিনে দিনে বর্জন করে চলেছি। পাশ থেকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখলুম যে সাধুজী দাঁড়িয়ে আছেন প্রসন্ন মুখে। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: এত ভোরে উঠেছেন!

আপনিও তো উঠেছেন।

এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন: আজই চলে যাবেন বুঝি!

বললুম: হ্যাঁ।

কেন যেতে হচ্ছে সে কথা তিনি জানতে চাইলেন না, শুধু দুঃখিত ভাবে বললেন: দ্বারকার কিছুই ভাল করে দেখা হল না।

কেন, সবই তো কাল দেখেছি।

তা দেখেছেন বৈকি। রথ-দেখা কলা-বেচা দুইই হয়েছে। মন্দিরও দেখেছেন, বেড়ানোর আনন্দও পেয়েছেন। কিন্তু মন্দিরের ঠাকুর দেখা বোধ হয় হয় নি।

তাঁর মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তবু বললুম: মূর্তিও দেখেছি ভাল করে। কালো পাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি। বাঙলা দেশ বা বৃন্দাবনের মতো দ্বিভুজ যুগল মূর্তি নয়।

আমার কথা শুনে তিনি হাসলেন।

হাসলেন যে!

ঠাকুর দেখা আপনাদের ঠিকই হয়েছে। দেশে ফিরে লোকের কাছে সবই বলতে পারবেন।

এ যে তাঁর অন্তরের কথা নয়, তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। আরও বুঝতে পারলুম যে ঠাকুর আমরা যে চোখে দেখি, সে আমাদের ঠুলি-পরা চোখ। যা দেখে যাই, তা ঠাকুর নয়, সাজানো একটা পুতুল মাত্র। তবু বললুম: কিছু কি বাকি রয়ে গেল?

উত্তরের সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শুনলুম। বললেন: অন্য সময় এলে দ্বারকায় আরও কিছু দেখতে পেতেন।

কখন বলুন তো?

এই ধরুন বসন্ত-পঞ্চমী দোল-পূর্ণিমা অক্ষয়-তৃতীয়া বা জন্মাষ্টমী। আর কয়েকটা দিন পরে এলেও অন্নকূট মেলা দেখতে পেতেন। সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময়েও বড় মেলা বসে। দ্বারকায় এ সব সময় বড় জাঁক। আপনাদের ভাল লাগত।

এই আপনাদের কথাটায় একটু খোঁচা ছিল। মনে হল, আমরা যে ঠাকুরের চেয়ে জাঁক ভালবাসি সে কথাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন: আপনারা সবাই পূজোর ছুটিতেই আসেন। গুজরাতে এখন গরবা পর্ব।

গরবার নামে আমি নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললুম। বললুম: গরবা নাচ আপনি দেখেছেন?

কিছু না বলে সাধুজী শুধু হাসলেন। আমি লজ্জা পেলুম।

বললেন: যা শুনতে পান, ঠিক ততটা নয়। গান গাইতে গাইতে মেয়েরা নাচে মাথায় প্রদীপ নিয়ে। ঠাকুরেরই গান।

সেই সঙ্গেই যোগ করলেন: রণছোড়জীর ফুলদোল এর চেয়ে খারাপ লাগবে না।

তারপর সেই ফুলদোলের গল্প বললেন আমাকে। এখানে আবীরের রঙ নাকি সাদা। আমরা যাকে আবীর বলি তার নাম গুলাল। বসন্ত-পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজোর দিন থেকে এক মাস এখানে দোলের উৎসব। ফুলদোলে গোপালকৃষ্ণ দোলায় দুলবেন। একটি দোলা রণছোড়জীর মন্দির দ্বারে, আর একটি দেবকী-মাতার মন্দিরের সামনে ঝুলছে। তার উপর সোনার গোপালকৃষ্ণ। লোকে আবীর দিয়ে দোলা দুলোবে সারা বিকেল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

আমি তাঁর দৃষ্টিতে এক রকমের আবেশ দেখলুম। সেই আবেশ আমার চোখে লাগল না। আমি তো আমার চোখের সামনে সেই আবীরে-রাঙা গোপালকৃষ্ণকে দেখছি না দোলায় দুলতে! আমার

দৃষ্টি ধাক্কা খাচ্ছে সামনের ঘরগুলোর গায়েঁ। যাত্রীরা একে একে ঘুম থেকে উঠছেন, জলের পাত্র নিয়ে যাচ্ছেন কুয়োর ধারে। কল্পনার দারিদ্র্য আমার মনকে পীড়া দিল। অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

সাধুজী বললেন: আপনদেরও ভাল লাগত।

নিশ্চয়ই লাগত।

তিনি সরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন: আপনারা ট্রেনে যাচ্ছেন, না বাসে?

আমরা যে বেট দ্বারকায় যাচ্ছি, সে প্রশ্ন অনাবশ্যক। দ্বারকা পর্যন্ত এসে বেট না দেখে কেউ ফেরে না। বললুম: ট্রেনেই যাচ্ছি।

তাহলে তো পথে আর কিছু দেখতে পাবেন না।

পথের গল্প তিনি নিজেই বললেন। নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রদীপের আলোয় দেবদর্শন করতে হয়। তারপর গোপী তালাও, তার বাঁধানো ঘাট। পুকুরের পাঁকের নাম গোপী চন্দন। এ সবের পৌরাণিক গল্প আছে। ছোট ছোট মন্দিরগুলো যদি দেখতে ভাল না লাগে, ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর দেখতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

তাঁর কথা শুনে লজ্জা পেলুম। কিন্তু মিথ্যে বলেছেন বলে মনে হয় না। মন্দিরের চেয়ে ময়ূর দেখতে অনেকেরই ভাল লাগবে। মন্দিরের কথা ভুলে যাবার পরেও ময়ূরের কথা মনে থাকবে। সাধুজী বললেন: মিঠাপুরের নুনের কারখানা আপনারা ট্রেন থেকেই দেখতে পাবেন। টাটার কারবার। সেখানে লক্ষ লক্ষ মণ নুন তৈরি হচ্ছে, আর ওখা বন্দর থেকে চালান যাচ্ছে এডেনে। রতনদাসকে বলে রেখেছেন তো?

বলেছি। সাতটার সময়েই তিনখানা টাঙ্গা নিয়ে হাজির থাকবে।

সাতটার সময়! গাড়ি যে নটা পঁচিশ মিনিটে। এত আগে গিয়ে কী করবেন?

এখানে তো গরম জলের ব্যবস্থা নেই ! মামার ঘুম ভাঙলেই গরম জল চাই।

দোষ দিলুম মামার, কিন্তু প্রয়োজনটা সকলেরই। কাছে পিঠে দোকান থাকলে আমিও দু ভাঁড় খেয়ে আসতুম।

হালদারের গলা শুনতে পেলুম ঠিক এই সময়ে। কোন একটা ঘরের ভিতর থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন: দেশলায়ের একটা কাঠি দিতেই এত বায়নাক্কা। নিজের দরকারে অন্ধকারেও তো বেশ খুঁজে পাচ্ছিলেন।

পাশে তাকিয়ে দেখলুম, সাধুজী সরে গেছেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপরে আবার হালদারের গলা শোনা গেল। এবারে কতকটা মোলায়েম। বোধ হয় দেশলাইটা পেয়েছেন, আর একটা বিড়িও ধরাতে পেরেছেন। বললেন: কী হতভাগা জায়গা মশাই! শেষ রাত থেকে উবু হয়ে বসে আছি—চা-ও নেই, প্রাতঃকৃত্যের তাড়াও নেই!

একই অভিযোগ। শুধু একটু অমার্জিত। এই রুচির অভাব দিনে দিনে ব্যাপক হচ্ছে। সমাজ জীবন থেকে সাংস্কৃতিক জীবনেও সঞ্চারিত হচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে। চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁরা লক্ষ্য করছেন এর গতিপ্রকৃতি। চিন্তান্বিত হচ্ছেন দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। কিন্তু এ কথা আমার কেন মনে এল! এ কথা ভাববার তো কোন কারণ ঘটে নি! মানুষের ভাবনার বুঝি শেষ নেই।

সাধুজী আবার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ আমার শান্তিদির কথা মনে পড়ল, তাঁর সেই বিরাট দলের কথা। তাঁদেরও তো সোজা দ্বারকায় আসবার কথা ছিল। তাঁরা কি আসেন নি? সাধুজীর কাছে আমি এই কথা জানতে চাইলুম।

বাঙালী মেয়েদের একটা দল তো? সবশুদ্ধ চৌত্রিশজন?

ঠিক ধরেছেন।

সেই জন্মেই তো কাল দুপুরে ভাবনায় পড়েছিলুম। ঘর খালি

মাত্র একখানি। আপনাদের ঐ বড় ঘরখানি। আপনারা দুদিন থাকতে চাইলে আমরা বিপদেই পড়তুম। আজ ওঁরা বেট থেকে ফিরবেন। দ্বারকার ওপর দিয়ে যাবার সময় চিঠি পাঠিয়ে গেছেন।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলেই তরতর করে এগিয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখলুম, হালদার বেরুচ্ছেন। আমিও পালিয়ে গেলুম।

সাতটার আগেই সবাই উঠে পড়লেন, কিন্তু সাতটার মধ্যে তৈরি হতে পারলেন না। রতনদাস এল তার অনেক আগেই। নমস্কার করে বলল: আর দুখানা টাঙ্গাও সাতটার মধ্যে এসে পৌঁছবে।

আমার আর কাজ ছিল না। ভাবলুম এর সঙ্গেই কিছু কথা কই। স্বাতি দেখতে পেলে তামাসা করবে তা জানি, কিন্তু আজকালকার শিক্ষাভিমানী মানুষের মতো নাক সেঁটকাবে না। আমাদের অভাব যত বাড়ছে, মর্যাদা সম্বন্ধে তত বেশি আমরা সচেতন হচ্ছি। সামাজিক দূরত্ব রক্ষার আগ্রহে মনুষ্যত্বের অবমাননা করছি। এ বিষয়ে স্বাতির দুর্বলতা আমি লক্ষ্য করি নি। কোন দিন এই দুর্বলতা প্রকাশ পেলে আমার চোখে সে অনেক ছোট হয়ে যাবে। রতনদাসকে আমি কাছে ডেকে বললুম: এত সকালে এসেছ, তোমার বাড়ি বুঝি খুব কাছে?

রতনদাস বোধ হয় চরিতার্থ বোধ করল, বলল: আমি আপনাদের গোলাম। প্রয়োজন হলে সারারাত এখানেই পড়ে থাকব।

না না, আমি সে কথা বলছি না। তোমার বাড়ি কোথায়, আমি সেই কথা জানতে চাইছি।

বিনীত ভাবে রতনদাস বলল: খুব কাছে নয়, বেশি দূরও নয়। কাল বিকেলে সিমেন্ট ফ্যাক্টরির যে কলোনি দেখিয়েছি, আমি সেইখানে থাকি।

কোম্পানী তোমাকে বাড়ি দিয়েছে?

আমাকে দেয় নি, দিয়েছে আমার ছেলেকে। আমার বড় ছেলে সেখানে চাকরি করে।

আগ্রহ দেখিয়ে বললুম : কোন ভাল কাজ নিশ্চয় করে!

বিনয়ে রতনদাসের মাথা তার বুক পর্যন্ত নেমে এল। বলল : আপনাদের আশীর্বাদে এবারে ফোরম্যান হয়েছে।

ফোরম্যান!

আমি খুবই আশ্চর্য হলুম। লোকটা ভুল বলছে না তো!

মাথা নেড়ে রতন বলল : আপনারা যদি কারখানা দেখতে যান তো আমার ছেলেই সব ব্যবস্থা করে আপনাদের দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে।

ফোরম্যানের পদ বেশ পদস্থ বলে শুনেছি। কোনও টাঙ্গাওয়ালার ছেলে সেই পদাধিকার করে আছে জানলে খানিকটা অবিশ্বাস আসে। একটু আগেই আমি এই দুর্বলতা থেকে নিজেকে মুক্ত ভেবেছিলুম। এখন দেখছি এ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের সময় লাগবে। শ্রমের মর্যাদা যত দিন না স্বীকৃত হচ্ছে, ভ্রান্ত মর্যাদা জ্ঞানের হাত থেকে তত দিন আমাদের মুক্তি নেই। রতনকে জেরা করে আমি আমার সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিলুম। জিজ্ঞাসা করলুম : তোমাদের বাড়ি খুব বড়, তাই না?

বিনীত ভাবে রতন বলল : তা জায়গার কোন অভাব নেই।

এ রকম উত্তরে আমার সন্দেহের নিরসন হল না। রতন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় বুঝতে পারল সে কথা। বলল : বড় ঘর তিনখানা, ছোট খান দুই। আমি একখানা ছোট ঘরে থাকি।

বড় ঘরগুলোতে কে থাকে?

একখানা আমার বড় ছেলের, তার একটি মাত্র মেয়ে। আর একখানাতে আমার ছোট দুই ছেলে। তৃতীয় ঘরখানি বসবার।

তোমার বুঝি তিনটি ছেলে?

আমার চার ছেলে। মেজ ছেলে রাজকোটের হাসপাতালে গত বছর ডাক্তার হয়েছে।

এবারে আমি এই সংবাদ পেয়ে যত বিস্মিত হলুম, তার চেয়ে বেশি হলুম তার বিনয় দেখে। বললুম : সেজ ছেলে?

সে ছেলেটা পাজী, লেখাপড়ায় মন নেই। ওর দাদা ওকে কারখানায় ঢুকিয়েছে অ্যাপ্রেন্টিস করে। আর বছর দুই পরে চার্জম্যান হবে।

ছোট ছেলেটা বুঝি লেখাপড়ায় ভাল?

আনন্দে রতন গদগদ হয়ে উঠল, বলল: কী করে জানলেন?

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

রতন বলল: ওর দাদা বলেছে, শেষ পর্যন্ত যদি এমন ভাল থাকে, তবে ওকে বিলেত পাঠাবে ব্যারিস্টার হতে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: আমি তো ওদের পাঠাতে পারি নি।

বললুম: তোমার ছেলেরা এমন ভাল, তুমি কেন বুড়ো বয়সে খেটে মরছ?

রতন বলল: আমার ছেলেরাও এই কথা বলে, বুঝলেন! বলে, আমার কাজ করার দিন নাকি ফুরিয়ে গেছে। আপনিই বলুন, কাজ করার দিন কি কারও ফুরোয়!

একটু থেমে বলল: আমি ওদের কী বলি জানেন। আমি বলি, বাপ টাঙ্গাওয়ালা বলতে যদি ওদের লজ্জা করে তো আমি না হয় বাজারে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকি। বৌমা আমার উত্তর দেয় ভাল। বলে, বাপের পরিচয় দিতে যে ছেলের লজ্জা করে, সে ছেলের মুখ দেখতে নেই। আমার ওপর ওরা বড় জুলুম করে। ঘোড়া কিনেছে আর একটা, দেখাশুনোর জন্যে একটা চাকর রেখে দিয়েছে। আমাকে কিছুই করতে দেয় না।

আমি রতনদাসের চোখের দিকে চেয়ে ছিলুম। বুড়োর চোখজোড়া দেখলুম জলে ছলছল করছে। বললুম: তুমি কি সারা জীবন টাঙ্গাই চালাচ্ছ?

না।

বাকিটুকু শোনবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

রতন বলল: টাঙ্গা চালাচ্ছি আজ দশ বছর। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে।

আমি তবু তার দিকে চেয়ে আছি দেখে বলল: ব্যবসা আমাদের পেশা। পাঞ্জাবে ব্যবসা করতাম। কাটাকাটির সময় মার খেয়ে পালিয়ে এলাম। ছেলেরা তখন ছোট ছিল।

ওদের মা?

প্রশ্ন করতে আমার কোন সঙ্কোচ হল না।

রতন বলল: রেখে এসেছি।

এর বেশি রতন বলতে চাইল না, আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না।

এক সময় রতন বলল: বাবুজী, আজ আমার সৌভাগ্য কেন জানেন? আজ দশ বছর আমি আপনাদের সেবা করছি। তীর্থযাত্রীর সেবা। আমি আপনাদেরই পুণ্যের ফল ভোগ করছি।

রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে এ তার মুখের কথা নয়, এ তার বিশ্বাসের কথা। মনে প্রাণে সে এ কথা সত্য বলেই মেনে নিয়েছে, এ জীবনে এ বিশ্বাস বুঝি তার ভাঙবে না।

চারি দিকে কোলাহল তখন বেড়ে উঠেছে। মামাও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রতন এগিয়ে গেল তাঁকে নমস্কার করতে।

১৪

দ্বারকার স্টেশনটি নিতান্তই ছোট। একটি মাত্র প্ল্যাটফর্ম, সেও নিচু। দুটো প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনই বোধ হয় হয় না। সারা দিনে তিনখানা গাড়ি পশ্চিমে ওখা বন্দরের দিকে যায়, সেই তিনখানিই ফেরে রাজকোটের দিকে। ছোট ছোট দুখানি ওয়েটিং রুম পাশাপাশি। একখানি পুরুষের, অপরটি মহিলার। বাকি কয়েকখানি ঘর রেলকর্মচারীদের দপ্তর। দুধারে দুটি চায়ের স্টল। ব্যবস্থা আশানুরূপ নয়। চায়ের সঙ্গে দেশী বিস্কুট, প্যাকেটে মোড়া শুকনো প্যাঁড়া আর গরম তেলেভাজা পাওয়া যায়। তাই দিয়েই সকালের জলযোগটা সারা গেল। মামা বললেন: এত বড় তীর্থের এই দুর্গতি!

দুর্গতিই বটে। স্টেশনে একটা রিফ্রেশমেন্ট রুম নেই, রিটায়ারিং রুম নেই। ভাল একটা হোটেলও নেই শহরে। মামার পছন্দ হবে কেন! কিন্তু না হলে আর উপায় কি! যাঁরা দ্বারকার খবর রাখেন সারা বছর, তাঁরা হয়তো এ সবের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তা করলে ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হত।

যথা সময়ে ওখার ট্রেন এল। একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে সবাইকে তুলে দেওয়া গেল। মেয়ে কুলিরা তৎপর, তাদের তদারক করছিল রতন। গাড়ির ভিতর সাহেবী পোশাক পরা এক যুবক ছিলেন, তিনিও সাহায্য করলেন অযাচিত ভাবে। তাঁকে মামা ধন্যবাদ দিলেন, কুলিদের সঙ্গে রতনদাসকেও বকশিশ দিলেন।

আমি আমার নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। মামা ডেকে বললেন: গোপাল এ গাড়িতেই এস।

আমি দাঁড়াতুম না। কিন্তু মামার সহযাত্রী ভদ্রলোকের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। মামাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার লোক বুঝি?

এই লোক শব্দটির মানে বড় স্পষ্ট। রামখেলাওন মামার লোক, আমিও ঐ রকম কিছু! হয়তো বাজার সরকার, কিংবা জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা। জমিদারের সঙ্গে প্রভেদটা বড় বেশি। আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম, তা জানি। মামা কী জবাব দেন, সেই কথা জানবার আগ্রহ ছিল। সেই কথাটি জানা হলেই আমার ভবিষ্যৎটাও বুঝি জানা হবে। জানালার সামনে থেকে আমি সরে গিয়েছিলুম। মামা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁর উত্তর শুনতে পেলুম। এতটুকু দেরি না করে স্পষ্ট জবাব দিলেন: আমার ভাগনে।

তারপরেই স্বাতিকে বললেন: ধরে আন্ তো মা। ওর চাল চালিয়াতি যেন অন্যকে দেখায়!

আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। মনে হল যে এই মুহূর্তে মামা আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি স্নেহ দিয়ে ফেললেন। সেইটুকু ঢাকবার জন্যই বাইরের এই রূঢ়তা। আমার আরও একটু সন্দেহ হল। মনে হল যে মামা তাঁর সহযাত্রীর মন্তব্যকে উপহাস করবার জন্যই স্বাতিকে আমার কাছে পাঠালেন।

ফিরব কিনা ভাবছিলুম, এমন সময় স্বাতি আমার কাছে এল। বলল: চল গোপলদা, তোমার ডাক পড়েছে।

আমাকে ছেড়ে দাও।

কী করে ছাড়ি বল! মানুষ তোমাকে কী ভাবে, তা দেখবে না?

স্বাতির গলায় আমি আহত হবার আভাস পেলুম।

বললুম: মানুষের ভাবনা তার নিজস্ব অধিকার। আমি যদি তোমাকে স্বাতি না ভেবে হাতি ভাবি, তুমি আপত্তি করতে পার?

স্বাতি একেবারে আঁৎকে উঠল। বলল: আমি কি হাতির মতো?

মোটেই না। কিন্তু আমি তাই ভাবলে তুমি কি করবে?

স্বাতি এমন উত্তরের আশা করে নি, বলল: তোমার তর্কের ধারাটাই বড় বেয়াড়া।

বেয়াড়া বলবে বৈকি। সত্যি কথা সইতে পারাই সব চেয়ে কঠিন। যত বাদ প্রতিবাদ মারামারি কাটাকাটি, সবই সত্যি কথা নিয়ে।

কেমন?

চোরকে তুমি সাধু বল, সে খুশী হবে; কিন্তু চোর বললেই মারতে উঠবে। উল্টোটাও ঠিক। সাধুকে চোর বল, সে হাসবে; কিন্তু সাধু বললেই বিপদ, সে পালাবে। এই ধর না তোমারই কথা। যদি বলি তুমি আমাকে দুচক্ষে দেখতে পার না, তুমি খুব খুশী হবে। কিন্তু যদি বলি—

আর বলবার দরকার হল না। বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: তুমি আসবে কিনা বল।

গাড়ি ছাড়তে আরও একটু দেরি ছিল। গার্ডসাহেব তখনও মাল দেওয়া-নেওয়া করছেন। সে দিকে একবার তাকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বললুম: গেলেও বিপদ আছে। ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার তুলনা করতে বসবেন তোমার মা। উনি অবিবাহিত হলে রাণার সঙ্গেও মনে মনে তুলনা করবেন।

স্বাতি বিরক্ত হয়ে বলল: কী যে বল তার ঠিক নেই। নিজের সম্বন্ধে বেশি ভেবে মাথাটা খারাপ করেছ।

আজকাল তোমার সম্বন্ধেই বেশি ভাবি

তাই ভাব।

বলে স্বাতি পিছন ফিরল।

আমিও এগিয়ে বললুম: দেখলে তো, সত্যি কথা শুনলে রাগ হয় কিনা! কিন্তু কী করবে বল, মানুষের মুখ তো বন্ধ করা যায় না!

গাড়িতে উঠে দেখলুম যে সহযাত্রী ভদ্রলোক তখন প্রায় জমিয়ে ফেলেছেন। আমাকে দেখেই বললেন: আসুন গোপালবাবু, আপনার অপেক্ষাই আমরা করছি।

আমার সৌভাগ্য।

আপনি কলকাতায় কাজ করেন! কোন্ ফার্মে? আপনাকে তো কোন ক্লাবে পার্টিতে দেখি নি!

এক সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন, বোধ হয় একটারও উত্তর চান না। তাই ধীরে সুস্থে বেঞ্চির উপর আমি একটুখানি জায়গা সংগ্রহ করে বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন: কলকাতায় আমাকে সর্বত্র পাবেন। জো রায় বললে এমন ফার্ম নেই যারা আমায় চিনবে না।

জো রায়!

জে ও ই জো। বিলেত ঘুরে আসবার পরই ঐ নামে পরিচিত হয়ে গেছি।

তার আগে কী নাম ছিল?

এই বিপদে ফেললেন। সে নাম তো প্রায় ভুলেই গেছি। নামটা জে দিয়েই শুরু।

জিতেন, যতীন, জলধর—

আমি মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। স্বাতি হাসছিল মুখে কাপড় চেপে। মামা বললেন: কী ছেলেমানুষি করছ?

জো রায় বললেন: বলে যান, বলে যান।

জগদীশ জগবন্ধু—

সহসা জো রায় বলে উঠলেন: মনে পড়েছে—জনার্দন। আমার সাহেব বন্ধুরা জোনার্দন বলতেন। তারই সংক্ষেপ জো।

বিপদে পড়ে লোকে নাকি বাপের নাম ভুলে যায়। কিন্তু নিজের নাম ভুলে যাবার কথা এই প্রথম শুনলুম। সত্যি বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তাই ভাবলুম নামটা বলার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর পোশাক-পত্রে হাবে-ভাবে এমন একটা সাহেবি-আনা যে পিতৃদত্ত সেকেলে নামটি প্রকাশ করতে বোধ হয় লজ্জা হচ্ছিল। স্বাতি আর সংযত থাকতে পারল না, খিল খিল করে হেসে উঠল উচ্ছল ঝরণার মতো। জো রায় একটু লজ্জিত হয়েই সামলে নিলেন। বললেন:

নামের জন্যে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দায়ী করতে পারেন না। পারেন কি?

সজোরে মাথা নেড়ে আমি জবাব দিলুম: নিশ্চয়ই না।

হাসি থামিয়ে স্বাতি বলল: এই গোপালদার নামটাই দেখুন না। আপনার আর এঁর একই নাম তো, কিন্তু তফাত কত! আপনার নামটা না বললে বোঝাই যায় না। অথচ—

বাধা দিয়ে আমি বললুম: আমার নামটা বুঝি না বললেও বোঝা যায়?

কেন যাবে না। চেহারার সঙ্গে নামের খুব মিল আছে। এমন মিল যে কিছুতেই নামটা আমাদের ভুল হয় না।

মামা পকেট থেকে তাঁর পাইপ আর পাউচ বার করছিলেন, বললেন: কী ছেলেমানুষি হচ্ছে!

কথাটা তিনি আরও একবার বলেছিলেন। কিন্তু সেবারে স্বাতি উত্তর দেয় নি। এবারে বলল: তুমিই বল বাবা, নভেল নাটকে তুমি কখনও গোপাল নাম দেখেছ? কেউ রাখে নি, রাখবেও না। সিনেমার নায়কের নাম গোপাল রাখলে, সে ছবি কেউ দেখতে যাবে না। তার ওপর ঐ চেহারা!

বলেই ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। আজ তার বাচালতা দেখে আমিও হাসলুম।

জো রায় বললেন: ওঁর যখন এতই আপত্তি, আপনিও আপনার নামটা বদলে নিন না?

কী নাম নেওয়া যায় বলুন তো!

এই বিপদে ফেললেন। আমি একেবারেই ইমাজিনেটিভ নই।

স্বাতি বলল: আপনার যেমন জো. এঁকে তেমনি গো বলেই দিব্যি চলতে পারে।

জো রায় অভিভূতভাবে বললেন: অদ্ভুত!

মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন, আর পরক্ষণেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন জো রায়।

এ সব হাল্কা কথা শুরু হতেই মামী চোখ বন্ধ করেছিলেন। স্বাতি বসেছিল আমার পাশে। ফিস ফিস করে তাকে বললুম : ও নামে তুমিই ডেকো। দরকার হলে আগে একটা ও বসিয়ে নিও।

হাসির শব্দে এ কথা আর কারও কানে গেল না। শুধু স্বাতির কান দুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। আমি আনন্দ পেলুম।

এক সময় আমি জো রায়কে জিজ্ঞাসা করলুম : আপনিও কি ওখা চলেছেন ?

জো রায় জবাব দিলেন : মিঠাপুরে একটু কাজ আছে।

মিঠাপুরে কাজ ! আপনি কি তীর্থ করতে বেরন নি ?

গুড্ হেভেন্স্ ! আমি বেরব তীর্থ করতে ! তীর্থের আমি কি বুঝি !

ইচ্ছে হল বলি, ঠিক বলেছেন, ও সব ওল্ড্ ফুল্সের কাজ। মামা মামী না থাকলে ঠিকই বলতুম। অনেক আগেই বলতুম। ভদ্রলোক গোড়া থেকেই বাঙলার চেয়ে ইংরেজী বলছিলেন বেশি, মাথা নাড়ার চেয়ে বেশি ঝাঁকাচ্ছিলেন কাঁধ। আর এই অল্প সময়েই সিগারেট শেষ করেছেন গোটা কয়েক, দেশলাই জ্বালান নি। আমি নিজে সিগারেট খাই নে, অন্যের খাওয়াকেও অন্যায় ভাবি নে। কিন্তু আমার বয়সী কেউ মামা মামীর সামনে অবিশ্রাম ধোঁয়া ছাড়বে, এ কিছু অশোভন মনে হয়। মামা আমার গুরুজন, জো রায়ের নন। কাজেই আচরণ আপত্তিজনক বললে লোকে আমাকে পাগল ভাববে। তবু আমি নিজের মনকে বোঝাতে পারলুম না। বয়সকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে যে মন, সে মন আমার হাল আমলের যুক্তি মানে না। বললুম : তাহলে আপনার নুনের কারবার !

কারবার আমার নয়, কারবার আমার কোম্পানির। সেও নুনের নয়।

এতক্ষণ মামী চুপ করেই ছিলেন, এবারে হঠাৎ জেগে উঠে বললেন : ফার্মের চাকরি বুঝি !

ফার্মের চাকরিকে মামী যে শ্রদ্ধা করেন, আমি সে কথা দিল্লীতে জেনেছিলুম। মামী শুনেছিলেন যে ফার্মে চাকরি পেলে ভাল ছেলেরা নাকি আজকাল গভর্নমেন্ট চাকরি নেয় না। গভর্নমেণ্টে মাইনে কম, সারা জীবনই সংসার চলে কষ্টে স্বষ্টে। অথচ ফার্মের চাকরিতে ঢুকলে বাড়ি গাড়ি কোন কিছুর অভাব থাকে না। জোকে মামী এই ভাগ্যবান সম্প্রদায়েরই একজন বলে ধরে নিলেন। জো বললেন : অদ্ভুত ধরেছেন। কলকাতা থেকে সম্প্রতি এসেছি বম্বেতে, প্রমোশন নিয়ে। এই এলাকাটা আমাদের অধীন। ছোটখাটো অফিসার এ দিকে অবশ্য অনেক আছে।

জো রায় যে বড় অফিসার তা আমরা অনেকে আগেই বুঝেছি। বললুম : কোন্ কোন্ জায়গা আপনাকে দেখতে হবে ?

সে অনেক। জামনগরে উড়ে এসেছি। রাজকোটে কাজ ছিল। এবারে যাচ্ছি মিঠাপুর। সেখান থেকে কান্দলা বন্দর।

আমার ভারি ভাল লাগল এই সংবাদটি। একটি স্থান অন্তত ভদ্রলোকের দেখা আছে, যা আমরা দেখতে পারি নি। রাজকোট সম্বন্ধে কিছু জেনে নিতে হবে। স্থানীয় লোকের কাছে যেমন জানা যায়, বিদেশীর কাছে ঠিক তেমনটি হয় না। বিদেশীর দেখা বড় ভাসা ভাসা, দৃষ্টির ভিতর সে গভীরতা নেই। আধুনিক কালের অভিজ্ঞতাহীন লেখকেরা যেমন উপন্যাস লেখেন, কতকটা তেমনি। কয়েকখানি ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধেও এই অভিযোগ শুনেছি। প্রথম দর্শনে যা মনে হয়, লেখক তাই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। যাঁরা একটু রয়ে-সয়ে দেখেন, তাঁরাই জানেন যে সত্য কথা অন্য রকম। বললুম : সৌরাষ্ট্রের রাজধানী তো এখন রাজকোটে, তাই না ?

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল। ভারি দুষ্টু হাসি। আমি

জানি, ঐ হাসির অর্থ টা কী। তাই তখুনি তার উত্তর দিয়ে দিলুম : হাসছ যে।

স্বাতি উত্তর দিতে দেরি করল না। বলল : আমাদের সামনেই জিজ্ঞেস করছ, পরে গুলগাপ্পি দেবে কার কাছে ?

জো রায় এ কথার মানে বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম : কিছু বুঝলেন না বুঝি ?

জো রায় সত্যিই কিছু বুঝতে পারেন নি। তাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললুম : স্বাতি ঐ রকম। ওর সব খবর জানা চাই। অথচ বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ।

ভারি বিপদ তো !

বললুম : আপনি তাকাবেন না স্বাতির দিকে। সোজা রাজকোটের গল্প ধরে দিন।

রাজকোটের আবার গল্প কী ! দেশীয় রাজার রাজধানী ছিল, এখন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী হয়েছে। রাজার ভাল ভাল বাড়িগুলোতে হয়েছে সরকারী অফিস। নতুন বাড়িও অনেক উঠেছে। একটা ভাল মফঃস্বল শহর।

দেখবার কিছুই নেই ?

দেখবার জিনিস ! তা লোকেদের জিজ্ঞেস করেছিলুম বৈকি। ছুটো লেক আর একটা পার্ক আছে ভাল। আর একটা বেড়াবার মাঠ। রাজার আমলে রেসকোর্স ছিল, এখন সন্ধ্যাবেলায় লোকে হাওয়া খেতে বেরয়।

এই বুঝি সব !

আমি সেখানে একটি মাত্র সন্ধ্যে কাটিয়েছি, তাও ক্লাবে। আপনাকে আমি শোনা কথা বললুম।

হঠাৎ তাঁর আর একটি দ্রষ্টব্য স্থানের নাম মনে পড়ল। বললেন : ভাল কথা, একটা নাকি ঘিঞ্জি গলি আছে, জহুরীদের গলি। ওদের তৈরি জিনিস বম্বেতেও চালান যায়।

*   *   *

দ্বারকার পর মিঠাপুর দ্বিতীয় স্টেশন। কথায় কথায় আমরা সেখানে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু জো রায়ের নামবার কোন আগ্রহ দেখলুম না। কিন্তু সে কথা মনে করিয়ে দিলে অসৌজন্য প্রকাশ হবে ভেবে আমি চুপ করে বসে রইলুম।

জো রায় দরজার হাতল ধরে প্ল্যাটফর্মে কাকে খুঁজছিলেন। কাছেই একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছুটে এলেন। মাথার টুপি তুলে নমস্কার করলেন জোকে। তকমা আঁটা বেয়ারা একজন গাড়ির ভিতর ঢুকবার চেষ্টা করতেই জো তাকে বাধা দিয়ে বললেন: রহ্‌নে দেও।

অর্থাৎ জো এখানে নামবেন না। ইংরেজীতে ভদ্রলোককে বললেন: বিকেলের গাড়িতে ফিরব। কাগজপত্র স্টেশনেই আনবেন। আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। পাঁচজনের জন্যে।

মামা আপত্তি করে বললেন: আমাদের দরকার নেই, চা আমরা খেয়েছি।

অল টাইম ইজ টি-টাইম।

উত্তর দিলেন জো রায়।

১৫

মিঠাপুর আর ওখার মাঝখানে মাত্র একটি স্টেশন। এইটুকু পথের ভিতরেই জো রায় আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বললেন : এ দিকে কখনও আসেন নি তো, সঙ্গে কেউ না থাকলে অসুবিধেয় পড়বেন।

মামা খুশী হয়েছেন কিনা জানি না, বললেন : সে কি, আমাদের জন্যে আপনি নিজের কাজ ফেলে চললেন! এ ভারি অন্যায় হল।

বিব্রত ভাবে জো বললেন : আমি অন্যায় করলুম!

আপনি কেন! আপনার ক্ষতি করা আমাদের অন্যায় হল।

খুশী হয়ে জো বললেন : আমার আর কী ক্ষতি বলুন! কোম্পানির কাজ যেমন চলছিল, তেমনি চলবে। কিছু না দেখলে বরং এখানকার অফিসের লোকেরা খুশীই হবে।

তা যা বলেছেন। বড় অফিসার যত না আসে, তারা ততই মঙ্গল ভাবে।

আজ বিকেলের ট্রেনেই আপনারা ফিরছেন তো, না রাত কাটাবেন বেট দ্বারকার ধর্মশালায়? বড় নোংরা জায়গা, বুঝলেন! রাত কাটাবার কথা যেন ভাববেন না।

বললুম : আমাদের সময়ও নেই। কাল সোমনাথে আমাদের পৌঁছতেই হবে।

এত তাড়া!

বাড়ি ফিরতে হবে তো! স্টেশনে আর ধর্মশালার মেঝেয় গড়িয়ে গা গতরে ব্যথা হয়ে গেছে।

জো রায় যেন আঁৎকে উঠে বললেন : মেঝেয় গড়াচ্ছেন!

এ কথায় উত্তর দিলেন মামা, বললেন: কী করব বলুন! গোপাল আমাদের যেখানে ওঠাচ্ছে, সেইখানেই উঠছি; বসাচ্ছে যেখানে, সেইখানেই বসে পড়ছি। কাল রাতে এক মঠে তুলেছিল। সন্ন্যাসীদের মতো মেঝের উপরেই সারা রাত ছটফট করেছি।

আমি বললুম: বিনি পয়সার যায়গায় থাকবার ব্যবস্থা আর কত ভাল হবে।

মামী আপত্তি জানালেন: বিনি পয়সায় আর কোথায় হল! ঘর ভাড়া যেমন লাগল না, তেমনি বেশি পয়সা দিতে হল মঠের প্রণামী।

বললুম: সে তো নিজের ইচ্ছেয়, ভদ্রতা করে দেওয়া। না দিলেও কারও কিছু বলবার নেই।

মামা বললেন: মান ইজ্জতেরও একটা কথা আছে গোপাল। চাঁদার খাতা সামনে ধরে দিলে সব দিকেই নজর রাখতে হয়।

ওখা স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল: এ জায়গার এমন বিদঘুটে নাম কেন হল?

প্রশ্নটা কাকে করল, সেই জানে। কিন্তু জবাব দিলেন জো রায়, বললেন: নামের আবার কারণ কী আছে!

কেন থাকবে না! আপনার নিজের নাম সম্বন্ধেই তো আপনি অনেক কথা বললেন।

লজ্জিত ভাবে জো বললেন: তা যা বলেছেন!

কুলিরা মালপত্র নামাচ্ছিল। জো তাদের ওয়েটিং রুমে যেতে বলেছিলেন। আমি বলেছি ক্লোক রুমের কথা। গল্প হচ্ছিল এই সময়ে। মামা আমার দিকে চাইলেন। স্বাতি তা লক্ষ্য করে হাসল। আমার বুকের ভিতর বিদ্যার অহংকার উঠল ঠেলে। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, বললুম: উষা ছিলেন বাণ রাজার কন্যা। একদা এই স্থান তাঁরই নামে পরিচিত ছিল—উষা মণ্ডল। ওখা মণ্ডল বা ওখা সেই উষারই বিকৃত রূপ।

কথাটা বলেই আমি লজ্জা পেলুম। ছি-ছি, নিজের বিদ্যা জাহিরের এ কী নির্লজ্জ চেষ্টা! পণ্ডিতের মতো সব কথার উত্তর দিয়ে আমি কি নিজের দুর্বলতাই ঘোষণা করছি না! কিন্তু স্বাতির দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সে যে নিতান্ত বিস্মিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কুলিরা মালপত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাদেরও এগোতে হল। সময় ও সুযোগ থাকলে স্বাতি নিশ্চয়ই আমাকে উষার গল্প শোনাতে বলত, কিন্তু তা বলল না। চলতে চলতে জো একটা মন্তব্য করলেন: অদ্ভুত!

এই শব্দটা তাঁর মুখে আরও কয়েকবার শুনেছি। কেন বললেন, তা বোঝা গেল না।

স্টেশনে মাত্র কয়েকখানি ঘর। তারই ভিতর একটি খুপরি হল ক্লোক রুম। দরজার চৌকাঠের উপর লাল রঙে পরিচয় লেখা। পাশের একটা ঘর থেকে কুলিরাই চাবি নিয়ে এল। তাদের পিছনে এলেন একজন রেলের বাবু। রসিদ নিতে ও বিকেলের ট্রেনে বার্থ রিজার্ভ করতে খুব বেশি সময় লাগল না।

আমাদের চিঠি ও টেলিগ্রাম তারা পায় নি শুনে মামা ক্ষেপে উঠেছিলেন। বললেন: পোস্ট অপিসের লোকেরা এত অপদার্থ, আমি বিশ্বাস করতে পারব না।

একজন ছোকরা ভদ্রলোক প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলেন। বললেন: তাহলে কি আপনি আমাদেরই অপদার্থ বলছেন?

আমি মাঝখানে না পড়লে কিছু কটূক্তি বিনিময় নিশ্চয়ই হত। বললুম: আপনারা দু দলই সরকারী। নিজেরা লেখালেখি করে ব্যাপারটা জেনে নেবেন।

অদ্ভুত!

বলেই জো উদ্দাম ভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে আমরাও বেরিয়ে এলুম।

স্টেশনের বাহির থেকেই ধুলোর রাস্তা। নিচে যে শক্ত পথ আছে তা অনুমান করা যাচ্ছে, কিন্তু উপর থেকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না। স্বাতি বলল: এ দেখছি ধনুষ্কোডির মাটি।

বললুম: ধনুষ্কোডির বালি বল।

মামা বললেন: তা যা বলেছ। সেখানে জুতো খুলে শুধু পায়ে হাঁটতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল। মরুভূমির ওপর হাঁটা কি আমার কর্ম!

জো রায় বললেন: এখানে তো কষ্ট হচ্ছে না!

খানিকটা এগিয়ে একটা মোড় পাওয়া গেল। ডান দিকে নানা রকমের দোকান দেখা যাচ্ছে, বাঁ দিকের রাস্তাটা মনে হল সমুদ্র পর্যন্ত গেছে। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সমুদ্র খুবই কাছে। এ দিকের লোকেরা আমাদের মতো ঘুরে সমুদ্রের ধারে আসে না। তারা রাস্তায় পা না দিয়ে সরাসরি মাঠ ভেঙে চলে। বাঁধানো রাস্তা ধরে আমরা বাধানো জলের ধারে এলুম। তারই নিচে ছোট বড় নৌকোর সারি। তীর্থের পাণ্ডার মতো নৌকোওয়ালারা অনেকে এগিয়েই অপেক্ষা করছিল। সোজা আমাদের একটা নৌকোয় নিয়ে তুলল।

কয়েকটা ধাপ নেমে নৌকোয় পা দিতে হয়। জলের উপর নৌকো টলমল করে। মামা মামী খুব সাবধানে মাঝিদের হাত ধরে নামলেন।

অনেক কাল পরে জেনেছিলুম যে এ জায়গার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফেরিঘাট তৈরি হয়েছে। ইঞ্জিন লাগানো নৌকো এসেছে। কিন্তু দেশী নৌকোকে এখনও বাতিল করতে পারেনি। কলের নৌকো মাঝেমাঝেই বেগড়ায়। আর মুসলমান মাঝি মাল্লারা এখনও বলে, এ দ্বারকানাথের কৃপা, তাই তারা করে খেতে পারছে।

স্বাতি চারি দিকে চেয়ে বলল: সমুদ্রের ধারটা ঠিক সমুদ্রের ধারের মতো মনে হচ্ছে না।

অদ্ভুত !

বলেই জো রায় উদ্দাম ভাবে হেসে উঠলেন।

এই হাসিতে স্বাতি অপ্রতিভ বোধ করল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল : তাই না গোপালদা !

বললুম : ঠিকই তো। সমুদ্র হলে তো সমুদ্রের মতো মনে হবে।

মাঝিরা ততক্ষণে নৌকোর কাছি খুলে দিয়েছে। নৌকো দুলে উঠল। চোখ বুজে মামী বোধ হয় দুর্গা নাম স্মরণ করলেন।

জো রায় স্বাতিকে বললেন : বেশ বলেছেন কথাটি—সমুদ্রের ধারটা ঠিক সমুদ্রের ধারের মতো মনে হচ্ছে না।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে উত্তর দিল : দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র কী সুন্দর বল !

দ্বারকার সমুদ্রও তো আমাদের ভাল লেগেছে।

নৌকোয় মাঝি কয়েকজন। তারা পাল খাটাবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরা ছাড়াও যাত্রী আরও আছে। মনে হয় স্থানীয় লোক তারা। মাঝিদের সঙ্গে নিঃশব্দে কখন উঠে বসেছে, খেয়াল করি নি। এখন কোন কাজ করছে না দেখেই সন্দেহ হল যে তারা মাঝি নয়। আমাদেরই মতো কাঠের তক্তার উপর বসে কথা কইছে নিজেদের ভাষায়।

স্বাতি অকপটে আমার কথা স্বীকার করল। বলল : সত্যিই ভাল লেগেছে।

ভাল লাগার আরও যে একটু কারণ ছিল, সে কথা সে গোপন করে গেল। সে কথা বুঝি গোপন রাখবারই কথা। সকলের কাছেই গোপন রাখতে হবে। আমার কাছেও। বললুম : এখানেও ভাল লাগতে পারে।

এক সময় ভাল লাগল। বাঁধানো ঘাট মিলিয়ে যেতেই ওখা বন্দর দেখলুম স্পষ্ট ভাবে। সমুদ্রের ভিতর পিয়ার অনেক দূর এগিয়ে

এসেছে। কয়েকখানা ছোট ছোট জাহাজ নোঙর ফেলে যেন ঝিমচ্ছে। জোয়ারের সময় বড় জাহাজও নাকি আসে।

স্বাতি হঠাৎ খুশী হয়ে বলল : এ ধারে দেখেছ গোপালদা?

তাড়াতাড়ি আমি অন্য ধারে মুখ ফেরালুম। সেও এক অপরূপ দৃশ্য। দূরে সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। অসীম আকাশের সঙ্গে অকূল জল যেখানে মিলেছে, সেই দিগ্বলয়ে এক লোকালয় ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কতক্ষণ থেকে এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, কেউই আমরা খেয়াল করি নি। মামী সেই দ্বীপকে প্রণাম করলেন।

দ্বীপ তো নয়, কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকাপুরী। নিমেষে আমার মন পৌঁছে গেল সোনার অতীতে। কিন্তু স্বাতি বাধা দিয়ে বলল : দোহাই তোমার গোপালদা, বক্তৃতা শুরু কোরো না।

আমি চমকে চেয়ে দেখলুম তার দিকে। বিস্মিত হলুম অপরিমিত। আমি তো কিছু বলি নি। স্বাতি কি আমার ভাবনার কথাও শুনতে পাচ্ছে!

জো রায় হেসে উঠেছিলেন। বললেন : গোপালবাবু কি ভাল বক্তৃতা দেন নাকি?

মামা বললেন : গোপাল সঙ্গে থাকলে আমাদের গাইডের দরকার হয় না।

এ খুব ভাল অভ্যাস গোপালবাবু, ভবিষ্যতে ভাল নেতা হতে পারবেন।

স্বাতি বলল : এখন আমরা হাসছি বটে, কিন্তু তখন সবাই তোমার কথায় ওঠবস করবে।

মামা বললেন : ওঠা বসা কেন, ডন বৈঠক করবে বল।

মন্তব্যটা হয়তো সত্য, হয়তো সত্য নয়। আমি কোন উত্তর দিলুম না।

মামা বললেন : বুঝলে গোপাল, সত্যকার ত্যাগ ও নিষ্ঠা দিয়ে

দেশের স্বাধীনতা যাঁরা এনেছেন, তাঁদের সংখ্যা আজ মুষ্টিমেয়। আর কিছু দিন পরে হয়তো তাঁদের একজনও থাকবেন না। দেশ শাসন করবে এক দল সুবিধাবাদী স্বার্থপর লোক।

মামার মুখে ঠিক এমন কথা আমি শুনি নি। তাই খুব আশ্চর্য বোধ হল।

মামা বললেন : ভাল লোক তো আর এগিয়ে আসবেন না! সভা সমিতির ব্যাপারে দেখছ না? ধরে বেঁধে জোর করে আনতে হয়। কোনও প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় সভ্যরা ভোট দিতে আসছে না। জলযোগের আয়োজন করে নানা রকম চেষ্টাচরিত্র করে মিটিঙের কোরাম হচ্ছে। আমি এমন মিটিঙ দেখেছি যেখানে ক্যাণ্ডিডেট নিজে উপস্থিত হয় নি, দলের লোকেরা তাকে দাঁড় করিয়ে নির্বাচন করেছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কেন এমন হচ্ছে বলতে পার?

প্রশ্নটা তিনি আমাকে করেছিলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন জো রায়। বললেন : আগ্রহের অভাব।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু আগ্রহের অভাব কেন হল?

এ কথার জবাব খুঁজে না পেয়ে জো বললেন : ভেবে দেখবার মতো কথা।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল।

মামা বললেন : একটা গল্প বলি।

হাওয়া লেগে সাদা কাপড়ের পাল অভিমানিনীর গালের মতো ফুলে উঠেছে। জন কয়েক মাঝি দড়িদড়া নিয়ে ভারি ব্যস্ত। তিন মাইল প্রশস্ত সমুদ্র। দাঁড় টেনে পার হবার উপায় নেই। নৌকো চলে হাওয়ার জোরে। তর তর করে চলে। জল না হয়ে জমি হলে এত জোরে জোরে আমরা হাঁটতে পারতাম না। আধ ঘণ্টায় তিন মাইল হাঁটতে পারে এমন মানুষ হয়তো সত্য যুগে ছিল, কিংবা কৃষ্ণের যুগে।

জো রায়ের মন এ দিকে ছিল না। স্বাতির উপর থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে মামার দিকে তাকালেন।

মামা বললেন : গল্পটা শোনা। গত ভোট যুদ্ধের গল্প। একজন প্রার্থী ভোটের তদ্বিরে বেরিয়ে যাদের কাছে এসেছিলেন, তাদেরই একজন বলেছে।

জো মন্তব্য করলেন : তবে সত্য হওয়াই সম্ভব।

মামা বললেন : আমি বিশ্বাস করেছি। ভদ্রলোক ভোট প্রার্থনা করে ফেরবার সময় কয়েক আনা পয়সা চাইলেন। ট্রামভাড়া। ভদ্রলোক আশ্চর্য হলেন। হবারই কথা। কেননা ভোটের জন্যে লোকে কি না করে! ঘোড়দৌড়ের মাঠেও মানুষ এমন মরিয়া হয়ে ওঠে না। তাই পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে ট্রামভাড়ার পয়সা চাইলে কে না আশ্চর্য হয়! প্রশ্ন করে কী উত্তর পেলেন জান?

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

জো বললেন : নিশ্চয়ই তাঁর মাথা খারাপ।

মাথা খারাপ কেন হবে! মাথা তাঁর খুবই সুস্থ। বেশি সুস্থ। বয়স হয়েছে, কাজকর্ম নেই। দেশ ছেড়ে এসে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন তো, এখন কোনও রাজসভায় ঢুকতে পারলে পাঁচটা বছর সুখে কাটবে।

অদ্ভুত!

বলে জো রায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। নৌকোটা দুলে উঠল। কাত হল এক দিকে। মনে হল, এবারে আরও জোরে ছুটছে। দুরন্ত বাতাস এলোমেলো করে দিচ্ছে জামা কাপড়। স্বাতি সারাক্ষণ তার আঁচল আর চুল সামলাচ্ছে।

জো রায়ের হাসি থামলে স্বাতি বলল : পরিশ্রম নেই বলেই এখানে ভাড়া কম।

কথাটা অপ্রাসঙ্গিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বুঝতে কষ্ট হল না যে স্বাতি পারানি কড়ির কথা বলছে। তিন আনায় একজন যাত্রীকে

পার করে। তাও অপেক্ষা করে না পুরো নৌকোটা ভরাবার জন্যে। জন কয়েক যাত্রী হলেই হল। টাকা পাঁচসিকে যা জোটে তাতেই খুশী। ওপারে পৌঁছে অপেক্ষা করতেও রাজী আছে। কিছু না বললেও নাকি অপেক্ষা করে থাকে।

জো বললেন: এখানে স্টীমার বা মোটর লঞ্চ কেন চলে না তা বুঝতে পারছি না।

মাঝিদের একজন আমাদের উত্তর দিল, বলল: সবই দ্বারকানাথের কৃপা।

মানে?

লোকটি যে বাঙলা বোঝে তার পরিচয় এবারে পাওয়া গেল। তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। প্রতি দিন অসংখ্য বাঙালী যাত্রী আসছে, যাচ্ছে। তাদের পারাপার করছে এরাই। কথাবার্তা শুনছে। এক দিন দু দিন নয়, যেদিন এই নৌকোয় উঠেছে সেদিন থেকেই শুনছে। তাই এরা বাঙলা বুঝবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে! বলল: কলের নৌকো এখানে অনেক এসেছিল, কিন্তু চলল না। দ্বারকানাথের কৃপায় সবই বিকল হয়ে গেল।

স্বাতি আস্তে আস্তে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল আমাকে। বলল: এরা হিন্দু, না মুসলমান?

প্রশ্নটা অসঙ্গত নয়। আমারও কিছু সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এদের মুখে দ্বারকানাথের নাম শুনে সে সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে যে লোকটা কথা কইছিল, সে বুড়ো হেসে বলল: আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। জাতে আমরা মুসলমান বটে। হিন্দুও আছে। সে আমাদের সরকারী ধর্ম। আসলে আমরা সবাই দ্বারকানাথের প্রজা।

সব চেয়ে আশ্চর্য হতে দেখলুম জো রায়কে। নিজেকে সামলাতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল। তারপর বললেন: ছেলেবেলায় এমন কথা একবার শুনেছিলুম মনে পড়ছে। গাঁয়ে মহরম আর দুর্গাপুজো

সবার পুজো ছিল। মহরমে হিন্দুদেরও দল বেরত, আর দুর্গাপুজোয় মুসলমানও জুটত গান গাইতে আর হুল্লোড় করতে।

একটু থেমে বললেন: পরস্পরকে ঘৃণা করতে তো নেতারাই শেখালেন।

তবে আমায় নেতা হতে বলছেন কেন?

এই জন্যেই তো বলছি। ভাইএ ভাইএ লড়াই বাধিয়ে নিজেরটি গুছিয়ে নেবেন।

খুশী হয়ে মামা বললেন: ঠিক বলেছেন।

বলেছেন নয়, বলেছ বলুন।

অনুরোধে বিগলিত হলেন জো রায়।

বেট দ্বারকা তখন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেট মানে যে সুন্দর দ্বীপ তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় শুধু মন্দির চিনতে। বাড়ি-ঘর সবই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মন্দিরের চূড়া নেই। একটা উঁচু বাড়ির উপর মনে হল একখানা পতাকা উড়ছে পত পত করে। ঐ কি দ্বারকানাথের মন্দির!

নৌকো এবারে ভিড়বে। দু হাত জুড়ে মামী আর একবার প্রণাম করলেন।

বেট দ্বারকাতেও নৌকো থেকে নামার ব্যবস্থা এখার মতো। বাঁধানো জেটির মতো একটা জায়গায় এসে নৌকো লাগে। যাত্রীরা উঠে দাঁড়ালেই টলমল করে ওঠে। আমরা লাফিয়ে উঠে পড়লুম। মামা মামীকে সাহায্য নিতে হল এক বলিষ্ঠ মাঝির। লোকটা হাতে ধরে তাঁদের টেনে তুলল।

পাণ্ডার ছেলেরা কাছেই কোথাও অপেক্ষা করছিল। তারা এক সঙ্গে ধরল হেঁকে। তাঁদের মধ্যে একটি বালককে বেছে নিয়ে মামা বললেন : চল।

আমি ঠিক এমনটি আশা করি নি। আশঙ্কা করেছিলুম অনেক কিছু। পুষ্করের কথা আমার মনে আছে। সেখানে সারাটা পথ তিনি এদের তাড়া দিয়েছেন। মামীর পরামর্শ শোনেন নি কিছুতেই। কিন্তু আজ তাঁর কী হল!

আমি কেন, মামী নিজেও আশ্চর্য হয়েছেন। স্বাতি তো আমার দিকে চাইল এমন ভাবে যে তার প্রশ্নটা বুঝতে আমার একটুও বিলম্ব হল না। মামা বোধ হয় নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ দিলেন, বললেন : একটু গোলমেলে ঠেকছে, তাই না?

আমি নিঃশব্দে তাঁর প্রশ্নটা সমর্থন করলুম।

বললেন : এতে দুটো লাভ হল। প্রথমটা হচ্ছে, এতগুলো হতভাগার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে দেখতেও কিছু সময় কম লাগবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু আমার খানিকটা সন্দেহ রয়েই গেল। কিন্তু সেটুকু সরল করে দিল স্বাতি। বলল : বিকেলের গাড়িতে তো আমাদের ফিরতেই হবে। বেলা এখুনি প্রায় দুপুর।

খুশী হয়ে মামা বললেন: তার ওপর সমুদ্র পার হতে হবে বিকেলের দিকে শুনেছি ঝড়ও ওঠে।

এইখানেই মামার দুর্ভাবনা। মনে পড়ল যে গাড়িতে তিনি একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। তাঁর কোন বন্ধু নাকি বিকেলের দিকে সমুদ্র পার হতে গিয়ে ঝড়ের মতো বাতাসে পড়েছিলেন। সে কী দুলুনি! মেয়েরা তো বমি করেই অস্থির। দেবতার অসীম দয়া যে সবাই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন।

হনহন করে মামা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। জো রায় আমাকে বললেন ফিসফিস করে: একটু পিছিয়ে পড়ুন।

পিছিয়ে পড়ব!

অনেকক্ষণ সিগারেট না খেয়ে পেটটা ফুলে উঠেছে।

সিগারেট কি ফুরিয়ে গেছে?

সিগারেট ফুরবে কেন!

বলেই একটা সোনার সিগারেট কেস বার করলেন পকেট থেকে। খুলে দেখালেন প্রায় এক কৌটো সিগারেট দুধারে সাজানো আছে। আমাকে আশ্চর্য হতে দেখে হেসে বললেন: চলবে একটা?

বললুম: ধন্যবাদ। আমি খাই নে।

জো রায় একবার মামা মামীর দূরত্বটা দেখলেন, তারপর পিছন ফিরে বললেন: নিতান্তই ভাল ছেলে দেখছি।

নিজে একটা সিগারেট বার করে তার গোড়ার দিকটা জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁটে চাপলেন। পকেট থেকে বার করলেন লাইটার। অনেকবার ঘষে জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে বললেন: এ কাজটার অভ্যেস নেই।

বুঝতে পারলুম যে তিনি সিগারেট দেশলাইয়ের কাঠিতে ধরান না, লাইটারেও না। পোড়া সিগারেটের আগুনে নতুনটা ধরান। ট্রেনের কামরাতেও তাই দেখেছি। কিন্তু এতক্ষণ যে কিছু খান নি, তা লক্ষ্য করি নি। কেন খান নি, তারও কারণ অনুমান করতে পারি নি।

জো রায় বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন: আশ্চর্য হচ্ছেন তো! ফুল্‌স্‌ অব দি ওল্ড্‌ স্কুল বড় ফ্যাস্টিডিয়াস, পানের থেকে চুন খসলেই তাদের মান যায়। বুঝলেন না?

বুঝলুম খানিকটা। আর এও বুঝলুম যে সবটুকু বুঝতে আরও খানিকটা সময় লাগবে।

জো রায় নাকে মুখে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। একটা শেষ না হতেই আর একটা ধরিয়ে টানতে শুরু করলেন। এক সময় বললেন: আপনারও দেখছি সংস্কারে বিশ্বাস আছে।

কী করে দেখলেন?

আমার কথায় একটু আঘাত পেয়েছেন মনে হচ্ছে!

আমি উত্তর দিলুম না।

এ আমার একটা দোষ, বুঝলেন! পুরনো সব কিছুকেই আমি ভাল বলে স্বীকার করতে পারি নে।

কিছু পারেন তো?

জো যেন চমকে উঠলেন। বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে এমন একটা প্রশ্ন হতে পারে। বিব্রত ভাবে উত্তর দিলেন: তা তো ভেবে দেখি নি।

তাহলে আপনাকেও সংস্কারমুক্ত বলা চলে না।

এ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে জো তাড়াতাড়ি বললেন: এই বয়সে আপনি তীর্থ করতে বেরিয়েছেন?

বয়সের সঙ্গে বাধাও তো বাড়বে।

জো রায়ের দৃষ্টিতে খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব দেখলুম। বললেন: তা হয়তো বাড়বে। কিন্তু—

আমি এই কিন্তুর মানে বুঝি। স্বাতি কুমারী মেয়ে, তার বাপ মায়ের সঙ্গে বেরিয়েছে। বেরতেই হবে। তাকে বাড়িতে রেখে আসতে হলে যোগ্য অভিভাবক চাই। তা হয়তো নেই। কিন্তু আমি ভাগ্নে। তীর্থের টান না থাকলে মামার সঙ্গে কেন এলুম। এই সন্দেহের উত্তর দেবার সময় এখনও আসে নি।

বাজারের রাস্তা দিয়ে মামা মামী অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা যে একটা মোড়ের মাথায় আমাদের অপেক্ষা করছিলেন, তা জানা গেল স্বাতিকে দেখে। আমাদের খুঁজতে সে ফিরে আসছিল। জো রায়ের ছুটো সিগারেট প্রায় শেষ হয়েছিল। স্বাতিকে দেখতে পেয়ে সে হনহন করে এগিয়ে গেল। আমি গেলুম তার পিছনে। স্বাতি বলল: বাবা ভাবছেন, আপনারা বুঝি হারিয়ে গেলেন।

জো উত্তর দিলেন: না না, হারাব কেন! এই একটু দাঁড়িয়ে ছিলুম আর কি!

স্বাতি দেখতে পেল যে জো রায় তাঁর পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেললেন। আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাবে হাসল কৌতুকের হাসি। মনে হল যে তার এই হাসিতে জো রায়কে যেন স্বচ্ছ ভাবে দেখতে পাচ্ছি। জো বললেন: চলুন এবারে।

স্বাতি আমাকে ডাকল: এস।

দ্বারকানাথের মন্দিরের সামনে পৌঁছে কিছুতেই বিশ্বাস হল না যে কোন মন্দিরের সামনে এসেছি। মন্দির কোথায়! এ তো একটা বাড়ি মনে হচ্ছে! একটা ধর্মশালা! দোতলার উপরেও একটা তলা আছে। তার ঢেউতোলা টিনের ছাদটা ঢাকা পড়েছে বিরাট এক বট গাছের পিছনে। গোল খিলানের খোলা দরজা। একটা ছুটো লোক যাতায়াত করছে। আমরাও সেই পাণ্ডার ছেলেকে অনুসরণ করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়লুম।

এ যেন অন্য জগৎ। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের এমন প্রভেদ বোধ হয় আগে কোথাও দেখি নি। ঐশ্বর্যের অপব্যয় দেখলুম চারি দিকে। মার্বেল পাথরের মেঝে পায়ের নিচে ঝকঝক করছে। বড় বড় দরজার সমস্তটা রূপোয় মোড়া। দ্বারকানাথকে ঘিরে আছেন তাঁর পাটরাণীরা—রাধিকা রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী। প্রত্যেকের

আলাদা মন্দির। জাঁকজমকে কেউ কারও চেয়ে ছোট নন। এমন ভারি ভারি রূপোর দরজা দ্বারকায় শুধু রণছোড়জীর সামনেই দেখেছি।

স্বাতি হঠাৎ জানতে চাইল: কেন এমন হয়েছে বলতে পার?

সকলেরই এক প্রশ্ন, কাজেই বুঝতে কারও কষ্ট হল না। মামা বললেন: আবু পাহাড়ে দিলওয়ারার মন্দিরও তো কতকটা এই রকম। বাইরে থেকে জাঁকজমক বোঝা না গেলেও সেখানে মন্দির বলে চিনতে ভুল হয় না।

জো বললেন: ঠিকই বলেছেন। এর একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে।

তাতে আর সন্দেহ কী!

স্বাতি গম্ভীর গলায় বলল: সেই কথাটাই তো আমরা জানতে চাইছি।

এ সবের সঠিক কারণ আমার জানা নেই। কেউ কোন কারণ নির্দেশ করে থাকলেও তা পড়ি নি। তবু কিছু অনুমান করতে পারি। আমি সেই অনুমানের কথা বললুম: ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের কথা মনে পড়ে? মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে পূজারী ব্রাহ্মণদের তখন দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে হত। সেই যুগে যত নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে সবই এই রকম। বাইরে থেকে মন্দির বলে যাতে সন্দেহ না হয়, সেই চেষ্টাই প্রবল ছিল সেদিনের মন্দির নির্মাতাদের।

স্বাতি তখনি বলল: এ মন্দির তাহলে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে তৈরি বল।

খানিকটা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললুম: আমি কি ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছি!

জো স্বাতির পক্ষ নিয়ে বলল: কেন দেবেন না! আপনি যখন জানেন এ সব—

মাপ করবেন। কোথায় কোন্ মন্দির কখন তৈরি হয়েছিল, সে সব আমার পাঠ্য পুস্তকে লেখা ছিল না।

মামা আমাকে সমর্থন করে বললেন: আমাদেরও এ সব পড়তে হয় নি।

মন্দিরের দরজা তখনও সব বন্ধ। ভোগের কিছু দেরি আছে। তারপর যাত্রীদের দর্শনের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। পাণ্ডার ছেলেটি বলল: শঙ্খ তালাও-এ স্নান করবেন না?

মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন: সে আবার কী?

ছেলেটি উত্তর দিল: শঙ্খ নারায়ণের মন্দির আছে সেখানে।

সে কত দূরে?

কিন্তু বালকটি তার নিজের ভাষায় যে উত্তর দিল, তাতে দূরত্ব বোঝা গেল না।

মামা উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন: ও সব থাক গোপাল। দেরি হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।

আমার তখন অন্য কথা মনে পড়েছিল। কোথায় যেন শঙ্খোদ্ধার তীর্থের কথা পড়েছি। এই দ্বীপেরই নাম শঙ্খোদ্ধার তীর্থ।

স্বাতি আমায় ভাবতে দিল না, বলল: কী ভাবছ বল তো গোপালদা?

আমি তাকে সত্যি কথা বললুম: বিষ্ণু পুরাণের একটা গল্প মনে পড়েছে।

স্বাতি বলল: বল না গল্পটা!

দ্বারকানাথের দ্বার খুলতে আরও কিছু দেরি ছিল। এই অবসরে আমি তাকে বিষ্ণু পুরাণের গল্প শোনালুম।—

অবন্তীপুরে সান্দীপনি মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষার পর কৃষ্ণ বলরাম যখন গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন, তখন মুনি বললেন প্রভাসের লবণ সমুদ্রে মৃত তাঁর পুত্রকে জীবিত অবস্থায় এনে দিতে হবে। গুরুর এই আজ্ঞা পেয়ে দুজনে এসে উপস্থিত হলেন এইখানে। ভয় পেয়ে

সমুদ্র বলল, সান্দীপনি মুনির পুত্রকে আমি হরণ করি নি, যে করেছে সেই শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামের অসুর এখানেই আমার জলে বাস করছে। এ কথা শুনেই কৃষ্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে পঞ্চজনকে বধ করলেন এবং তার অস্থিতে উৎপন্ন শঙ্খটি গ্রহণ করলেন। বললুম: কৃষ্ণের শঙ্খের নাম যে পাঞ্চজন্য তা মনে আছে তো!

স্বাতি বলল: আছে। কিন্তু সান্দীপনি মুনির ছেলের কী হল?

বললুম: তার জন্যে দুজনকে যমপুরী যেতে হয়েছিল এবং যমকে জয় করে সেই বালককে টেনে আনতে হয়েছিল নরক থেকে।

তারপর?

তারপর আর কী! অবন্তীপুরে ফিরে গিয়ে গুরুকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র।

জো রায় এতক্ষণ নিঃশব্দে এই গল্প শুনছিলেন। শেষ হতেই বলে উঠলেন: অদ্ভুত!

দূর থেকে আমরা দ্বারকানাথকে দর্শন করলুম। তারপর একে একে দেখলুম রাধিকা রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতীকে। মামা বললেন: কৃষ্ণের শুনেছি ষোল হাজার একশো রাণীর মধ্যে পাটরাণী ছিলেন আটজন। এখানে চারজন দেখছি, আর চারজনের নাম বলতে পার?

মামা আমার দিকে তাকালেন।

বললুম: কালিন্দী মিত্র বিন্দা সত্যা সুশীলা লক্ষ্মণা জলহাসিনী প্রভৃতি রাণীর নাম শুনেছি। কে কে পাটরাণী ছিলেন জানি নে।

স্বাতি বলল: তুমি জান না এমন কথাও কি আছে!

আমি তখন ভাবছিলুম। অন্যমনস্ক ভাবে বললুম: রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী নাগ্নজিতী শৈব্যা মাদ্রী লক্ষ্মণা ও কালিন্দী।

জো বললেন : রাধিকা কি কৃষ্ণের রাণী ছিলেন না ?

বেয়াড়া প্রশ্ন। রাধার জন্মবৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে, শ্রীমদ্ভাগবতে নেই। গোলকধামে রাসমণ্ডলে বিষ্ণুর ইচ্ছায় তাঁর বাম অঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন ষোড়শী মনোহারিণী রাধা। মর্ত্যে এই রাধা সুদামের শাপে কৃষ্ণের মাতুল আয়ান ঘোষের পত্নী হয়েছিলেন। পুরাণকার বলেন যে রাধার ছায়ার সঙ্গে আয়ানের বিবাহ হয়।

তারপর রুক্মিণী! রুক্মিণী হরণের গল্প মামার মনে ছিল। তিনি নিজে সেই গল্প বললেন: বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী। শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কৃষ্ণ তাঁর রূপের খ্যাতি শুনে যাদবদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। মনে মনে রুক্মিণীও ছিলেন কৃষ্ণের অনুরক্ত। মন্দিরে পুজো দিয়ে রুক্মিণী যখন ফিরছিলেন, কৃষ্ণ তাঁকে হরণ করলেন। যুদ্ধ হল। জয় হল যাদবদের। দ্বারকায় এনে রুক্মিণীকে কৃষ্ণ বিয়ে করলেন।

আমি বললুম : রুক্মিণীর ছেলে মেয়েদের নাম বড় ভাল।

এ সবে স্বাতির আগ্রহ আছে দেখলুম। বললুম : দশটি ছেলে, নাম প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ চারুদেহ সুষেণ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু-বিন্দ সুচারু ও চারু। মেয়ে একটি, নাম চারুমতী।

স্বাতি হেসে উঠল।

হাত জুড়ে জো রায় বললেন: আপনার স্মৃতিশক্তিকে নমস্কার।

স্বাতি বলল : এবারে সত্যভামা ও জাম্ববতীর গল্প বল।

বললুম : তাহলে স্যমন্তক মণির গল্প বলতে হবে।

বুঝতে পারলুম যে এ গল্প কারও মনে পড়ছে না। সংক্ষেপে তাই স্যমন্তক মণির গল্প বললুম।—

সূর্যের উপাসনা করে সত্রাজিৎ পেয়েছিলেন স্যমন্তক মণি। শুদ্ধ ভাবে ধারণ করলে সেই মণি প্রতি দিন আট ভার সোনা প্রসব করে,

কিন্তু অশুচি অবস্থায় ধারণ করলে প্রাণহানি অনিবার্য। সত্রাজিৎ দ্বারকায় আসতেই সকলে মণির প্রভাব দেখে আশ্চর্য হল। কৃষ্ণ ভাবলেন রাজা উগ্রসেনের গলাতেই সে মণি বেশি শোভা পাবে। ভয়ে সত্রাজিৎ সেই মণি দিলেন ছোট ভাই প্রসেনজিৎকে। এক দিন প্রসেনজিৎ মৃগয়ায় গিয়ে আর ফিরলেন না। সবাই ভাবল, এ কৃষ্ণেরই কীর্তি। এই কলঙ্কের কথা শুনে কৃষ্ণ গেলেন বনে। ভাবলেন, যে ভাবেই হোক মণি উদ্ধার তাঁকে করতেই হবে। এ দিকে এক সিংহ প্রসেনজিৎকে নিহত করে। প্রসেনজিৎ সেদিন অশুচি ছিলেন। আবার সিংহকে হত্যা করে জাম্ববান সেই মণি উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের যুদ্ধ হল জাম্ববানের সঙ্গে। লোকে বলে, এই জাম্ববানই ছিলেন রামের প্রধান মন্ত্রী। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাম্ববান মণি তো দিলেনই, সেই সঙ্গে তাঁর কন্যা জাম্ববতীকেও দিলেন। দ্বারকায় ফিরে কৃষ্ণ যখন সত্রাজিৎকে সেই মণি ফেরত দিলেন, তখন মিথ্যা কলঙ্ক রটনার জন্যে সত্রাজিতের অনুশোচনার সীমা রইল না। নিজের কন্যা সত্যভামাকে সম্প্রদান করে খানিকটা শান্তি পেলেন।

জাম্ববতী ও সত্যভামার গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি থামতেই স্বাতি বলল : তারপর ?

বাকি গল্পটা আমি খুবই সংক্ষেপে বললুম : এই সত্রাজিৎ প্রাণ দিলেন শতধন্বার হাতে। এক সময় শতধন্বা কৃতবর্মা ও অক্রূর চেষ্টা করেছিলেন সত্যভামার পাণিগ্রহণে। সেই রাগ। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, পাণ্ডবদের জতুগৃহ দাহ হয়েছে সেখানে। সত্যভামার কাছ থেকে খবর পেয়ে কৃষ্ণ শতধন্বাকে হত্যা করেন। কিন্তু মণি তখন অক্রূরের হাতে। ভয়ে অক্রূর সেই মণি দিলেন কৃষ্ণকে। ... তা নিলেন না, বললেন : ও তোমার কাছেই থাক।

...ন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে স্বাতি আবার বলল : সত্যি...?

হেসে বললুম : ক্ষিধে পেয়ে গেছে।

আমাকে সমর্থন করে জো বললেন : এতক্ষণে একটা প্রাণের কথা বলেছেন।

ক্ষুধাই আমাদের প্রাণের কথা।

১৭

ফেরার পথে মামা বললেন : কোথায় খাওয়া যায় বল তো ?

মামী সাবধান করলেন : যেখানে সেখানে নিয়ে তুলো না বাপু।

দু ধারের বাড়িঘর আর দোকানপাটের দিকে চেয়ে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

জো রায় বললেন : ইট্‌স্ এ প্রব্‌লেম।

এ যে কঠিন সমস্যা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই পাণ্ডার ছেলেটি আমাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করল। কী বুঝেছিল জানি নে, বলল : ভাল লজ আছে। বাঙালী বাবুরা পছন্দ করে।

জো রায় উৎসাহিত হয়ে বললেন : সত্যি !

বললুম : বাবুরা পছন্দ করে, সাহেবরা নয়। কাজেই একটু সতর্ক থাকবেন।

জো রায় বললেন : পরোয়া নেই। ক্ষিধের সময় সবারই এক গোত্র।

শেষের কথাটি আমার ভাল লাগল। জো রায় হয়তো খুব হালকা ভাবেই কথাটা বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হল যে জগতে এ একটা খুব বড় সত্য। ক্ষিধের সময় শুধু মানুষ কেন, মানুষে পশুতেও কোন প্রভেদ থাকে না। এ একেবারে আদিম প্রবৃত্তি।

মামা বললেন : ভাল কোন হোটেল নেই এখানে ?

উত্তর দিল ছেলেটি, বলল : ধর্মশালা অনেক আছে, হোটেল নেই।

মামী মন্তব্য করলেন : কেন থাকবে ! যারা তীর্থ করতে আসে তাদের জাত ধর্ম আছে তো ! হোটেল রেস্টুরেন্টে খাবার জন্যে তারা এখানে আসে না।

মামা বললেন : আমরা তবে উপবাস করি।

মামী এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তার আগেই সেই পাণ্ডার ছেলেটি একটি লজের সামনে এনে হাজির করল। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল : ভিতরে আসুন।

লজ না কোন গৃহস্থের বাড়ি বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু জো রায় কোন দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলেন। এটা ক্ষিধের জন্য, না দুর্বলতা এড়াতে, তা বোঝা গেল না। দুর্বলতা একটু আছে বৈকি। কোট-পাৎলুন-পরা বিলেত-ফেরৎ সাহেব, তীর্থ করতে এসেছেন নিজের শখে। নাক সেঁটকালে যে আমরা নানা সন্দেহ করব। আমি হেসে বললুম : ঠিক আছে।

মামা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন : ঠিক আছে!

তাড়াতাড়ি বললুম : আপনারা বসুন এখানে। আমি একটু দেখে আসি।

কী দেখবে?

এর চেয়ে ভাল জায়গা কিছু আছে কি না।

পাণ্ডার ছেলেটি বোধ হয় কিছু বুঝতে পেরেছিল। বলল : বাঙালী বাবুরা সবাই এই লজে খান, খেয়ে খুব তারিফ করেন। অনেকে আবার রাতের জন্যে রাবড়ি আর পুরি সঙ্গে নিয়ে যান।

জো রায় বলে উঠলেন : আমরা দিনের বেলাতেই রাবড়ি আর পুরি খাব।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টিতে যা বলল, তার অর্থ আমি বুঝি। বললুম : আর ঝাল ঝাল একটা তরকারি, সঙ্গে একটু আচার।

স্বাতি বলল : চমৎকার।

দরজায় দাঁড়িয়ে কেউই ছিলেন না। পাণ্ডার ছেলেকে অনুসরণ করে সবাই ভিতরে গেলেন। কিন্তু তারপরেই গোলমাল বাধল। একটা সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে হবে। মই নয়,

সিঁড়িই। কিন্তু খুব অপরিসর। একজনের পিছনে আর একজনকে উঠতে হয়, পাশাপাশি উঠবার উপায় নেই। পাণ্ডার ছেলের পিছনে জো রায় উঠে গেলেন অবলীলাক্রমে। স্বাতি উঠল, মামীও উঠলেন।

আমার দিকে ফিরে মামা বললেন : ব্যাটাদের বুদ্ধি দেখ। দোতলা বাড়ি তুলবে, অথচ সিঁড়ির খরচ করবে না।

একটা পা তুলে বললেন : মচকাবে না তো!

মামী তখন উপরেই পৌঁছে গেছেন, পিছন ফিরে বললেন : উঠেই পরীক্ষা কর।

গোপাল একটু পরে উঠো।

বলে মামা থপথপ করে উপরে উঠতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে আমাকে অনুমতি দিলেন উঠবার।

আমি উঠলুম। পিছনে রামখেলাওন। লোকটি নিঃশব্দে চলে, তাই সবাই তার কথা ভুলে যান। সে নিজে ভুললে এত দিনে নিশ্চয়ই হারিয়ে যেত, যেমন প্রথমবারে সে হাওড়া স্টেশনেই হারিয়ে গিয়েছিল।

উপরে পৌঁছে এক নূতন সমস্যা দেখা দিল। লম্বা এক ফালি বারান্দার মতো ঘর। তার দেওয়ালের গায়ে বেঞ্চির উপরে থরে থরে বিছানা সাজানো আছে—তোশক আর মাথার বালিশ, তার উপরে মোটা মোটা পাশ বালিশ। মামা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। স্বাতি বলল : বোধ হয় রাতে শোবার ব্যবস্থা।

চিন্তিত ভাবে জো রায় বললেন : প্রশ্ন হচ্ছে, এ সব যাত্রীদের জন্য, না বাড়ির লোকের?

মামীর মুখে আমি অতৃপ্তির লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম। তাঁকে খানিকটা আশ্বাস দেবার জন্যে বললুম : তীর্থক্ষেত্রে সবই পবিত্র। খাওটা পরিচ্ছন্ন চাই।

মামা আর কোন উপায় না দেখে আমাকে সমর্থন করে বললেন : তাই দেখ।

বালক ততক্ষণে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। পাশের দরজা দিয়ে ছাদে কখন সরে পড়েছিল, দেখতে পাই নি। এবারে এক মহিলার সঙ্গে ঘরে এল কয়েকখানা পিঁড়ি হাতে। দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি সেগুলো বিছিয়ে দিয়ে বলল : বসুন।

দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে না, কাজেই বসতে হবে। সকলের আগে জো রায় তাঁর পা মুড়ে বসে পড়লেন স্বচ্ছন্দে, আর বসেই বললেন : দাঁড়িয়ে কেন!

সবাই বসলেন।

রামখেলাওন সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মামা তাকেও বসালেন। খানিকটা দূরে মেঝের উপরেই সে বসল।

পাণ্ডার ছেলেকে আমি বললুম : মেঝেটা একটু মুছে নিতে বল।

মামীর অসন্তোষ আমি অনুভব করতে পারি। চারি দিকের টাল করা বিছানা দেখে ঘরটাকে শোবার ঘর বলেই মনে হচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্চার ঘর হলে আরও কেলেঙ্কারি। ঝাঁটপাট নেপামোছা নেই, ধুলোর উপরেই ঠাঁই করে দিল। চোখের উপর এমন নোংরামি তাঁর সহ্য হচ্ছে না। হয়তো কিছু খেতেও রাজী হতেন না। আমার কথায় তাই তৃপ্তি পেয়ে বললেন : ভাল করে বুঝিয়ে বল গোপাল, এদের তো কারও ঘেন্নাপিত্তি নেই!

আমার কথায় পুনরুক্তি করে মামা আমাকেই লজ্জা দিলেন, বললেন : তীর্থক্ষেত্রে সবই পবিত্র।

দরজার বাহিরে মুখ বাড়িয়ে বালকটি তাদের নিজেদের ভাষায় কী হুকুম করল। এতক্ষণে এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের প্রয়োজন জানতে : ভাত ডাল, না পুরি রাবড়ি?

উত্তর আমাদের দিতে হল না, ছেলেটিই দিল। কত পুরি আর কত রাবড়ি, শুধু সেই কথাটিই জানতে চাইল। ওজন বলতে হবে।

আমি জানি, মামা ওজন বলতে পারবেন না। বললেন : পেট ভরাতে হবে।

ভদ্রলোক একবার জো রায় আর একবার মামার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মামীর দিকে। কিন্তু কথা কেউই বললেন না। তাই দেখে আমি বললুম : এক সের পুরি আর এক সের রাবড়ি, ছ জায়গায় ভাগ করে আন।

স্বাতি বলল : ঝাল ঝাল তরকারি আর আচারের কথা বলবে না?

বললুম : তাও চাই। আর তাড়াতাড়ি চাই।

ভদ্রলোক ভিতরেব দিকে কিছু ফরমাস জানিয়ে নিচে নেমে গেলেন তরতর করে।

আমি তখনও বসি নি। জল এনে ভাল করে মুছিয়ে নিলুম জায়গাটা। তারপরে বসলুম।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে হাসল দুষ্টুমির হাসি। এই আচার দেখিয়ে আমি যে মামীর মন যোগালুম, সেই কথাটিই বোধ হয় জানিয়ে দিল। আমি তার উত্তর দিলুম না।

জো রায় বললেন : গোপালবাবুর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলুম।

মামা বললেন : কী রকম?

এক কথায় কেমন ব্যবস্থা করে দিলেন দেখুন, আমি অমন ওজন বলতে পারতুম না।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

জো রায় বড় অপ্রতিভ বোধ করে বললেন : কী করব বলুন, আমি কত খেতে পারি সে হিসেব আমার খানসামা জানে।

স্বাতি এবারে আরও উদ্দাম ভাবে হাসল।

লজ্জায় জো রায় যেন মরে গেলেন। আর মামী বকলেন স্বাতিকে : কী হচ্ছে এ সব!

খানিকটা সামলে স্বাতি বলল : গোপালদা খানসামার কাজ করতে পেরেছেন বলে মিস্টার রায় কেমন তারিফ করছেন দেখ।

এবারে মামাও হাসলেন।

জো রায় লজ্জিত ভাবে বললেন: আমি সে জন্যে তারিফ করি নি।

আমি বললুম: স্বাতিও অন্য কারণে হেসেছে।

খানিকটা যেন আশ্বাস পেলেন জো রায়। বললেন: অন্য কারণে!

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল: গোপালদার ওজনের জ্ঞান কত, তা আমাদের জানা আছে। মাদ্রাজে আধ সের আঙুর কিনেছিল ছ আনায়।

সেই পুরনো কথা। সেখানে নাকি ষোল তোলায় এক সের হয়। মামী নিজে সেই আঙুর কিনেছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলুম। কাজেই উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

মামা বললেন: তবু কিছু বলে তো আমাদের উদ্ধার করেছে!

জিনিস যদি আট তোলা আসে, ছ জনের পেট ভরবে তো?

পাণ্ডার ছেলেটি ছিল দাঁড়িয়ে। সে বলল: কম পড়বে।

আমি আশ্চর্য হলুম এই ছেলেটির কথা ভেবে। ভারতবর্ষের এক প্রান্তে বাঙলা, আর এক প্রান্তে এই দ্বারকা। ভাষার কত প্রভেদ! এ দেশের একটা কথাও আমরা বুঝতে পারি না, অথচ এই অপরিণত বয়সের বালকটি আমাদের অনেক কথাই বুঝতে পারছে। কত হাল্কা ভাবে আমরা এখন কথা বলছি। কিন্তু বুঝতে পারি নি যে কত মনোযোগ দিয়ে ছেলেটি সব শুনছে। তা না হলে এমন সঙ্গত জবাব দিতে পারত না। মন্দিরে নিজের কর্তব্য সে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু মামার কাছে পয়সা নেয় নি। বলেছে পরে নেবে। এইটুকু বয়সেই বোধ হয় বুঝতে শিখেছে যে ক্ষুধার্ত মানুষের চেয়ে পরিতৃপ্ত মানুষের মেজাজ থাকে প্রসন্ন, দানের হাত উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেই সুযোগ ছেলেটি হারাতে চায় নি। মনস্তত্ত্বে তার জ্ঞানের পরিচয় আগেই পেয়েছিলুম, এবারে তার ভাষা শিক্ষার আগ্রহের পরিচয়

গেলুম। বাণিজ্যে এদের দেশজোড়া প্রতিপত্তি দেখেছি। এই মুহূর্তে মনে হল, তা হবে নাই বা কেন!

জো রায় কিন্তু চমকে উঠেছিলেন, বললেন: এখানেও কি আর্ট তোলায় সের নাকি!

হেসে বললুম: তা নিশ্চয়ই নয়, হলে এরাই আপত্তি তুলত।

এ নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করতে হল না। ভিতর থেকে পিতলের থালা গেলাস এল, বাহির থেকে এল খাবার। সেই ভদ্রলোক একখানা পরাতের উপর ছ ভাঁড় রাবড়ি আর একখানা খবরের কাগজ মুড়ে সের খানেক পুরি নিয়ে এলেন। এই খাবার আনতে দেরি যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নির্বিকার ভাবে বললেন: পুরি ভেজে আনতে একটু দেরি হয়ে গেল।

মামা বসবার জন্য আমাদের মতো ছোট ছোট কাঠের টুকরো পান নি, পেয়েছিলেন আকারে কিছু বড় একটি দোলনার আসন। তার দুদিকে লোহার কড়া। সেই দুটি তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল কিনা জানি নে, বললেন: একটু দেরিই বটে।

ভদ্রলোক বললেন: একেবারে খাঁটি ঘিয়ে ভেজে আনা হল। দেশের অবস্থা যা হয়েছে, সবই ভেজিটেব্‌লের কারবার।

জো রায় বললেন: ঠিক বলেছেন। ঘি ভেজিটেব্‌ল হয়েছে, এবারে মাছ মাংসও ভেজিটেব্‌ল হবে।

মামা বললেন: তারপর আমরাও।

জো রায় সশব্দে হেসে উঠলেন।

এতক্ষণে পুরি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। মামী বললেন: রাম-খেলাওনের জন্যে খানকতক আরও চাই।

স্বাতি বলল: তোমার চাই নে গোপালদা?

তার হাসিটি সবাই দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু আমি তার প্রচ্ছন্ন বেদনাটুকু দেখলুম। আমি তার এই বেদনার কথা জানি, কিন্তু কবে তা দূর করতে পারব তা জানি নে। বললুম: দরকার হলে চেয়ে নেব।

একই নিঃশ্বাসে প্রশ্ন জানালুম ভদ্রলোককে : আমাদের তরকারি আর আচার কই ?

দরজা দিয়ে ভদ্রলোক ভিতরের দিকে ছুটলেন, পরের মুহূর্তেই ফিরে এসে বললেন : আসছে।

ছোট ছোট কানা-উঁচু পিতলের রেকাবিতে করে আলুর তরকারি এল, আর কয়েক রকমের আচার বাড়ির মেয়েরাই আনল। স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে মনে হল যে তার জিবে জল এসে গেছে। আসবেই। আচার এমন জিনিস যে নাম শুনলেই জিবে জল আসে। যার আসে না, বুঝতে হবে তার রসনা নিতান্ত নীরস। প্রশ্নটা কিন্তু জো রায়কে করলুম : কেমন দেখছেন ?

আচারের এক টুকরো মুখে পুরে উত্তর দিলেন : অদ্ভুত!

সেই সঙ্গে জিব আর তালু দিয়ে একটা শব্দ করলেন টক্ করে।

মামী খানিকটা আলুর তরকারি মুখে দিয়েছিলেন, বললেন : এ দেখছি আমাদের মতোই পাঁচ ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কা দিয়েছে।

এই সময় নিচে থেকে একজন লোক উপরে এল। খবর দিল যে জনকয়েক যাত্রী এসেছে, তারা ডাল রুটি খাবে। জানা গেল যে এদের পুরি রাবড়ির দোকানটা খানিক তফাতে। সেখানেও বসে খাবার ব্যবস্থা আছে, যাত্রীরা লজে আসে ভাত খেতে। রাঁধে বাড়ির মেয়েরা।

খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে পয়সা মিটিয়ে যখন আমরা নেমে আসছিলুম, দেখলুম স্বাতিকে ধরেছে একটি মেয়ে। তারই বয়সী। ছিপছিপে গড়ন, শ্যামলা রঙ। উজ্জ্বল চোখে খুশির আমেজ। কিন্তু স্বাতি কিছু ভয় পেয়েছে মনে হল।

মামা মামী নেমে গিয়েছিলেন, পিছনে জো রায়। আমি অপেক্ষা করছিলুম স্বাতির জন্য। তাকে সাহস দিতে দাঁড়িয়ে গেলুম।

মেয়েটি হিন্দীতে গল্প জুড়ল, বলল : তোমার ঐ থলির ভিতর কী আছে ?

বলে আঙুল দিয়ে দেখাল তার ভ্যানিটি ব্যাগটা।

ভয়ে ভয়ে স্বাতি বলল : চাবি রুমাল আর—

পান সুপুরি নেই ?

সাহস পেয়ে স্বাতি হেসে বলল : পান সুপুরি নেই, আছে কিছু পয়সাকড়ি।

তারপর খুলে দেখাল ব্যাগের ভিতরটা। আমাকে আড়াল করে দেখাল। ততক্ষণে আরও একজন বয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও দেখলেন বিস্ফারিত চোখে। বাঁ কাঁধে স্বাতির ক্যামেরা ছিল। সেটাও তাঁরা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে দেখলেন।

নেমে আসবার সময় স্বাতি বলল : বুঝলে গোপালদা, এ সব জিনিস এরা এখনও দেখে নি।

তার পরের কথাটুকু শোনবার জন্য আমি চুপ করে ছিলুম। গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল : না দেখেও এদের বেশ চলে যাচ্ছে।

দেখলে এমন ভাল করে চলত কি !

কিন্তু এ প্রশ্ন আজ অবান্তর।

১৮

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে পাণ্ডার ছেলেই একখানা নৌকে ঠিক করে দিল। কিন্তু হাত পাতল না।

মামা খুশী হলেন অপরিমিত, আর দিলেনও কিছু বেশি। নমস্কার করে বালকটি বলল: আমাদের নামটা—

কিন্তু মামার চোখের দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করতে সাহস পেল না।

পাণ্ডাদের কার্ড নেই। কিন্তু ছাপানো হ্যাণ্ডবিল রাখে অনেকে। সেই সব হাতে দেয় দেশে গিয়ে বিতরণের জন্য। খাতা সকলেরই আছে। তাতে যাত্রীদের নাম পিতার নাম গ্রাম থানা পোস্ট অফিস জেলা সবই লিখে রাখে। পেলে কিছু আত্মীয় বন্ধুদের নামও। প্রয়োজন হলে তারা যাত্রীদের কাছেও বেড়াতে আসে। মেয়ের বিয়ে, কিছু প্রণামী দাও। ছেলে কলেজে উঠেছে, একটা চাকরি জুটিয়ে দাও, পাণ্ডাগিরি করে আর পেট চলে না। দ্বারকার পাণ্ডাকে নিয়ে এ সব ভয় নেই। খুব জোর তারা আমেদাবাদে যাবে, কিম্বা বরোদা। ভয় ছিল বৈদ্যনাথের পাণ্ডা হলে। মামার অসন্তোষের কারণ আমি বুঝি। ছোট ছেলেকে তিনি ছোটই দেখতে চান, এই ধরনের প্রশ্নকে মনে করেন পাকামি। ছেলেটিও কিছু সন্দেহ করছিল, তাই কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিল।

জো রায়কে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। নৌকোয় বসে সবারই এক সঙ্গে নজর পড়ল। মামী ব্যস্ত হলেন বেশি, বললেন: আমাদের সঙ্গেই তো আসছিল।

জো রায়ের প্রয়োজনের কথা আমি জানি। বোধ হয় একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে গোটা দুই সিগারেট শেষ করছেন। ট্রেনে তো অজস্র

সিগারেট খেয়েছেন মামা মামীর সামনে। হঠাৎ এই পরিবর্তনটা তাই চোখে ঠেকে। বললুম: ঐ আসছেন।

কয়েকজন মাঝি মাল্লার আড়াল থেকে জো রায় প্রসন্ন মুখে বেরিয়ে এলেন। আশ্বস্ত হয়ে মামী বললেন: এই যে!

মামা বললেন: কোথায় গিয়েছিলেন?

সত্য কথাটা জো রায় এড়িয়ে গিয়ে বললেন: দিক নির্ণয় করছিলুম।

দিক নির্ণয়!

মামা আশ্চর্য হলেন।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে কিছু ইশারা করল। তার অর্থবোধ না হলেও মনে হল যে কিছু বলার আদেশ হল। বললুম: উনি দিশেহারা হয়েছিলেন।

মামা আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে কি!

জো রায় আমতা আমতা করে জবাব দেবার চেষ্টা করলেন: দিশেহারা! হুঁ, তা একটু হয়েছিলুম বৈকি!

গম্ভীর ভাবে স্বাতি বলল: বলেন কি?

জো রায় আকাশের দিকে চাইছিলেন করুণ ভাবে। সূর্য কোন্ দিকে বোধ হয় তাই দেখবার চেষ্টা করছিলেন। ইতিমধ্যে মাঝি মাল্লারা নৌকো খুলে দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। বললুম: সূর্যটা ঘুরে গেছে।

এ কথার উত্তর স্বাতি তৎপর ভাবে দিল: তোমার কি মাথাটা ঘুরে গেছে গোপালদা।

হেসে বললুম: প্রায়।

আশ্চর্য হয়ে জো রায় আমাকে প্রশ্ন করলেন: বলেন কি মশাই?

বললুম: দ্বারকায় গাড়িতে চড়ে ভাবছিলুম, দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তরে চলেছি। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ওখা বন্দর, কাজেই সমুদ্র দেখব বাঁ হাতে।

স্বাতি জানতে চাইল : কিন্তু ?

কিন্তু মিঠাপুর পৌঁছেই মাথা ঘুরে গেল।

কেন বলতো ?

মনে হল যে ট্রেনের মুখ গেছে ফিরে। উত্তরের বদলে এবার দক্ষিণে চলেছে।

জো রায় চেঁচিয়ে উঠলেন : অদ্ভুত! আপনি ঠিক আমার মনের কথাটি ধরে ফেলেছেন!

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসল।

উৎসাহ দেখিয়ে আমি বললুম : এ যে সকলেরই মনের কথা। দেখলেন না, ট্রেন এসে সরসর করে ওখায় ঢুকে গেল। স্টেশন এল ডান দিকে, সেই দিক দিয়ে বেরিয়েই সমুদ্র। কাজেই দেখুন, সমুদ্র পশ্চিমে হলে এসেছি দক্ষিণমুখো।

চিন্তিত ভাবে মামা বললেন : ঠিক কথা।

চোখ বন্ধ করে জো রায় কিছু ভাবছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে বললেন : উঁহু।

তারপর আবার চোখ বন্ধ করে শূন্যে আঙুল চালনা করলেন খানিকক্ষণ, শেষটায় নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ খুলে বললেন : ভারতবর্ষের মানচিত্র আমার চোখের সামনে আছে। দ্বারকা সমুদ্রের গায়ে, ওখা একেবারে উত্তরে। পশ্চিমে আরব সাগর।

গম্ভীর ভাবে আমি বললুম : উত্তরমুখো চললে বাঁ হাতে পশ্চিম, কিন্তু আমরা যে ডান হাতে সমুদ্র পেয়েছি তাতে সন্দেহ নেই।

জো রায় তখুনি মেনে নিয়ে বললেন : ঠিক।

এবারে স্বাতিও আশ্চর্য হয়ে বলল : বেট দ্বারকা কি তবে আরব সাগরে নয় ?

আকাশের সূর্য দেখিয়ে আমি বললুম : দেখছ না আমরা এখন পশ্চিমে যাচ্ছি! কাজেই এই ছোট দ্বীপটি হল কচ্ছ উপসাগরে। ওখার যে প্রান্তে আমরা নৌকোয় উঠলুম তা পুবে, পশ্চিম

প্রান্তে হল বিস্তীর্ণ আরব সাগর। বড় বড় জাহাজ চলে সেই দিকে।

নৌকোর পালে বাতাস বাড়ছে। পতপত করে শব্দ হচ্ছে আর জলের উপর কলোচ্ছ্বাস। নৌকো দুলছে, কাত হচ্ছে, আর ছুটছে। স্বাতি আমার কাছেই বসে ছিল। আস্তে আস্তে বলল: কচ্ছ উপসাগর সম্বন্ধে আমার ধারণা শুনলে তুমি হাসবে।

আশ্বাস দিয়ে বললুম: হাসব না।

তোমার হাসিকে আমি ভয় পাই নাকি?

তবে নির্ভয়েই বল।

স্বাতি নিজেই হেসে বলল: এই উপসাগরটাকে আমি একটা জলা জমি বলে ভাবি। সবুজ ধানের ক্ষেতের খানিকটা যখন বানের জলে ডোবে, ধান গাছের ডগা জেগে থাকে, জলের ওপরে, কতকটা তেমনি। এমন ধারণা কেন হল জান?

জানি। ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে।

কী করে জানলে?

নিজেও তো মানচিত্র দেখেছি। কিন্তু তুমি যা বলছ, তা কচ্ছ উপসাগর নয়, তার নাম রন অব কচ্ছ। গ্রেট আর লিট্‌ল্ রন।

ঠিক ব্যাপারটা কী বল তো?

তোমার সঙ্গে একবার দেখতে যাব।

স্বাতি আমার দিক থেকে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। জো রায় বসেছিলেন ঠিক তার সামনে। তাঁকেই প্রশ্ন করল: আপনি দেখেছেন কি?

আমাদের আলাপ যে জো রায় সবই শুনেছেন তার প্রমাণ পেলুম উত্তর শুনে। বললেন: গান্ধীধামে একবার গিয়েছিলুম। এ সব কথা তখন মনে হয় নি।

গান্ধীধামের নামে আমার অনেক কথাই মনে পড়ল। সিন্ধীদের কথা, ভাই প্রতাপ দয়ালদাসের কথা। এ সবই খবরের কাগজে পড়া।

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে কিছু শুনতে পাব ভেবে আনন্দ হল। কিন্তু মামা আমাকে প্রশ্ন করবার সুযোগ দিলেন না। নিজেই বললেন: সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্রের নাম না হয় বুঝলুম। কিন্তু কচ্ছ নাম কেন হল বলতে পার? কচ্ছ মানে তো কাছা!

প্রশ্নটা তিনি আমাকেই করেছেন। কাজেই উত্তর দিতে হবে। না দিলে তিনি মানবেন না, আর দিলে স্বাতির ব্যঙ্গ আছে। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই সে বলল: মুক্ত কচ্ছ কথাটা আমরা শুনেছি।

বললুম: সংস্কৃতে কচ্ছের আরও অনেক মানে আছে। নৌকোর অংশ তুঁত গাছ, ঝিঁঝি পোকা, মুখ সম্পুট, আকাশ আচ্ছাদন, কচ্ছপের খোলা ইত্যাদি। এখানে তার অন্য মানে। কেন জলেন ছণোতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক-ছদ্+ড। জলের নিকটবর্তী স্থান বা জলময় দেশ। নদী কচ্ছোদ্ভবং কান্তমুচ্ছ্রিতং ধ্বজসন্নিভং।

জো রায় তাঁর দু চোখ কপালে তুলেছিলেন। আর স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সর্বনাশ!

মামার মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর মনের সন্ধান নিচ্ছিলুম। সহসা তাঁকে বড় বিচলিত দেখাল। মামার দৃষ্টিতে আমি অদ্ভুত ভয় দেখলুম। বাতাসের চাপে নৌকো এক ধারে কাত হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে জল ছুঁতে পারছি। আর একটুখানি কাত হলেই নৌকোর উপরেই জল উঠবে। জো রায় শক্ত হয়ে বসে আছেন। মামা হাত রেখেছেন উঁচু দিকটায়। বেশ একটু হেলেও আছেন - যতটা ভার ওদিকে দেওয়া যায়। আমার হাসি পেল মাঝি মাল্লাদের দিকে তাকিয়ে। কয়েকজন দড়ি টানাটানির কাজে ব্যস্ত আছে, আর সবাই গল্প করছে নিশ্চিন্ত মনে, যেন কিছুই হয় নি।

স্বাতির সর্বনাশ কথাটি এই অবস্থা দেখে নয়, সেটি তার তামাসার কথা। কিন্তু আমি সুযোগটি নিয়ে বললুম: ভয় কিসের?

স্বাতির যে সত্যিই ভয় করছিল, তা বুঝতে পারলুম তাকে নীরব

থাকতে দেখে। উত্তর দিল খানিকটা পরে, যখন নৌকো আবার সোজা হয়ে উঠল। বলল : অত বিত্তের ভার এই ছোট নৌকো বইতে পারছিল না।

অদ্ভুত!

বলে জো রায় হেসে উঠলেন।

কিন্তু মামা তাড়াতাড়ি সরে গেলেন অন্য ধারে। সেই উঁচু ধারটার মামীর পাশে বসে বললেন : তুমি বড়ই হাল্কা।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন : বল এই বারে।

কী বলব ?

কী বলছিলে যেন! এই যে কী একটা বলছিলে না ?

আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলুম : কচ্ছের কথা।

স্বাতি বলল : মহাভারতে কী লিখেছে ?

এ তার তামাসার কথা। তবু বললুম : ভীষ্ম পর্বে এই জনপদের শুধু নামটি আছে, তার বেশি নেই। টলেমির বইএ এই কচ্ছ উপসাগরের নাম কান্টি উপসাগর। দেশের ভেতর এই নাম নাকি এখনও আছে।

তারপর ?

তারপর পেরিপ্লাস। লেখক এই উপসাগরে বরকে নামে একটি দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। বিদেশের পণ্ডিতরা বলেন,- ওখা মণ্ডলই এই বরকে দ্বীপ। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতদের অন্য মত। তাঁদের মতে দ্বারকা শব্দের অপভ্রংশ হল বরকে। মাগধী ভাষায় দ্বারকার প্রতিশব্দ বরবরায়ে। জৈন বণিকেরা এক সময় মাগধী ভাষা ব্যবহার করত। কাজেই পেরিপ্লাস এই বরবরায়ে শব্দটি বণিকের মুখে শুনে বরকে করেছেন। স্ট্রাবোর লেখায় সিগর্তিন নামে একটি জনপদ আছে। উইলসন সাহেব বলেন, সেই সিগর্তিন বা স্ত্রীগর্তই বর্তমান কচ্ছ।

জো রায় আবার বললেন : অদ্ভুত !

স্বাতি বলল : এই বারে ইতিহাস বল।

বলব ?

নিশ্চয়ই বলবেন।

বললুম : কচ্ছের রাজাদের এক বংশাবলী পাওয়া যায়। তার নাম জাড়েজা রাজ বংশাবলী। এই জাড়েজা বা শম্মা রাজগণ নিজেদের কৃষ্ণের বংশধর বলে দাবী করেন। কৃষ্ণনন্দন নরকাসুরের পুত্র বাণাসুর ও তাঁর বংশধররা রাজত্ব করতেন মিশর ও শোণিতপুরে। এই বংশেরই তিনজন রাজকুমার মিশর থেকে ভারতে পালিয়ে আসেন। বড় ভাই অশপৎ মুসলমান হয়েছিলেন। গজপৎ ছোট, তিনি সুরাষ্ট্রে ছিলেন। আর নরপতের ছেলে শম্মা হলেন এদের আদি পুরুষ।

মামা বললেন : নামগুলিও তোমার মনে আছে !

মনে রাখবার মত নাম যে। অশ্বপতি গজপতি আর নরপতি !

জো রায় বললেন : অদ্ভুত !

নৌকো আবার হেলেছে। ঠিক আগের মতোই। মামার সমস্ত ভারেও আর সোজা থাকছে না। পালের উপর হাওয়া এমন জোরে এসে লাগছে যে ভয় হচ্ছে কাপড় ছিঁড়ে যাবে বলে। কিন্তু কাপড় ছিঁড়ছে না। নৌকোই ক্রমাগত কাত হচ্ছে। ছলছল করছে শ্যামল জল। অকূল অফুরন্ত জল। হাত নামিয়ে খানিকটা জল আমি তুলে নিলুম। শীতল স্নিগ্ধ। কেন জানি না, এই জল একটু মুখে নিতে ইচ্ছে হল। সমুদ্রের লোনা জল। ইংরেজ কবি কোলরিজের কথা আমার মনে পড়েছে :

Water water everywhere
But not a drop to drink.

শুধু সমুদ্রে কেন, সমুদ্রের তীরেও তাই। এত জল, কিন্তু খাবার জল নেই। দ্বারকায় বৃষ্টির জল ধরে রাখছে সারা বছরের জন্য। ধনুষ্কোডিতে জল আসছে রেলের ট্যাঙ্ক ওয়াগনে।

অন্য সময় হলে মামা আমাকে বাধা দিতেন। কিন্তু এখন কিছু বলতে পারলেন না। মনে হল, তিনি মনে মনে কিছু বলছেন। আমি তাঁদের ভোলাবার জন্য বললুম : জানেন মিস্টার রায়, এই জাড়েজা বংশ সৌরাষ্ট্রের দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জাম রাবল নামে এক রাজকুমার নবনগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, আর মরভি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কাম্বোজী নামে এক যুবরাজ। যে বংশাবলীর কথা বলছিলুম, তার শেষ রাজা দ্বিতীয় শ্রীদেশলজী, জন্ম ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এঁর পিসি কেশব বাঈ-এর বিয়ে হয়েছে জুনাগড়ের নবাবের সঙ্গে।

পরিষ্কার দেখতে পেলুম যে আমার কথা আর মামার কানে যাচ্ছে না। তিনি দু হাতে কাঠের পাটাতন চেপে ধরেছেন। মামা যে চোখ বন্ধ করে ছিলেন, এতক্ষণ তা দেখতে পাই নি। স্বাতি হাসল জো রায়ের দিকে তাকিয়ে। তিনিও শক্ত হয়ে আছেন। কিন্তু সে ভাবটা ঢাকবার জন্য বললেন : তারপর ?

হেসে বললুম : বলিহারি হিউ-এন-চাঙ্‌কে। ভারতের লোক হয়ে কচ্ছ আমরা চোখে দেখি নি, আর তিনি চীনের মানুষ হয়ে সে দেশের কথা লিখে রেখে গেছেন। দশ অবতারের মন্দির দেখেছেন নিজের চোখে, গল্প লিখেছেন ধনী লোকের। তখন ঐ দেশ নাকি মালব রাজ্যের অধীন ছিল।

সমুদ্রের জল মনে হচ্ছে ছিটকে ছিটকে উঠছে। নৌকোর বাঁ দিকটা প্রায় জলের রেখা ছুঁয়েই আছে। আর একটুখানি কাত হলেই হল। তারপর যা হবে, ভাবতে ভয় হয়।

মাঝি মাল্লাদের মধ্যে একজন বুড়ো আমাদের লক্ষ্য করছিল, বলল : কিছু ভয় নেই বাবু, সমুদ্র এখানে লক্ষ্মী ছেলে।

নৌকো সোজা হয়ে আসছিল। বাতাসের জোর কমেছে। কতকটা আশ্বস্ত হতেই মামা বললেন : লক্ষ্মী ছেলের এই নমুনা বটে!

মামী তাঁর চোখ খুলে ছিলেন, বললেন : আর কতটা বাকি ?

ওখার বন্দর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কয়েকখানা বড় বড় জাহাজ শ্রান্ত মরালের মতো স্থির হয়ে আছে। হয়তো মাল নামছে কিংবা উঠছে। ঐ ধারটাতে আরব সাগর। করাচি বন্দর এখন আর ভারতের হাতে নেই। একা ওখা পেরে উঠছে না। তাই এই কচ্ছ উপসাগরে নতুন বন্দর হয়েছে কান্দ্‌লা। গান্ধীধাম আর কান্দ্‌লা। জো রায়কে জিজ্ঞাসা করে সমস্ত খবর জানা যাবে।

নৌকো আবার কাত হচ্ছিল। মামা বললেন: ভটচায্যি মশায়ের কথা মনে থাকলে এমন পাপ কার্য কখনও করতুম না।

কথাটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তবু তাঁর মুখের দিকে তাকালুম প্রশ্নের দৃষ্টিতে। মামা বললেন: সে বাতাস নয়, ঝড়। নৌকো এই ডোবে, কি সেই ডোবে। পাটাতনের উপর সবাই গড়াগড়ি দিয়ে বমি করেছে।

মাঝিরা বুঝি বাংলা বোঝে। সেই বুড়োটা বলল: নৌকোটা নিশ্চয়ই ডোবে নি।

মামা বললেন: কোন রকমে বেঁচে গেছে।

মাঝি বলল: বেলা বাড়লে এক এক দিন অমন হয়। তা বলে নৌকো কখনও ডোবে না।

এবার আর নৌকো বেশি কাত হল না। মামা বললেন: এই শেষ। আর কখনও এ পাপ করব না।

পুণ্যের কথা মামী আর বললেন না।

বন্দরের মাটি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর ভয় নেই। এটুকু জল সাঁতার কেটেও পার হওয়া যায়।

১৯

নৌকো ডুবল না। সাঁতার কাটতেও হল না। নির্বিঘ্নে আমরা পারে পৌঁছে গেলুম। ঘড়ির দিকে চেয়ে জো রায় বললেন : বিকেল পাঁচটায় আমাদের গাড়ি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

স্বাতি বলল : তাহলে এই শহরটাও দেখে নেওয়া যাবে।

মামী একবার আকাশের দিকে তাকালেন। মধ্যাহ্নের সূর্য তখন অগ্নিবর্ষণ করছে। এই রৌদ্রের নিচে ঘুরে বেড়াবার ফল তিনি অবশ্যম্ভাবী মনে করেন। বললেন : পাগল নাকি!

জো ঠিক বুঝতে পারেন নি, তবু বললেন : ওখা আবার শহর!

তারপরেই স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলেন যে মন্তব্যটা করে তিনি ভাল করেন নি। তাড়াতাড়ি বললেন : স্টেশনে যাবার পথেই একটু ঘুরে যাওয়া যাবে।

আমি বললুম : বেড়ানোর চেয়ে এখন বিশ্রামের দরকার বেশি।

মামা তখন কসরৎ করে ঘাটের উপর উঠেছেন। মাঝিদের একজন উপর থেকে তাঁকে টেনেছে, নিচে থেকে ঠেলেছে একজন। জলের উপর নৌকো দোলে বলে আর একজনের কাঁধে ভর দিয়েছিলেন তিনি। প্রথমে বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস। তারপর পয়সা দিলেন চুক্তির চেয়ে বেশি। বললেন : এদের পুণ্যের জোর আছে, নইলে আজ আর পারে উঠতে হত না।

মামার কথা শুনে মামী হাসলেন। নৌকোয় তাঁকে আমরা হাসতে দেখি নি। মামাও যে দেখেন নি তা বোঝা গেল তাঁর কথা শুনে। বললেন : এ হাসি তোমার কোথায় ছিল এতক্ষণ?

মামী বললেন : জমা ছিল।

চলতে চলতেই মামা বললেন : হুঁ।

বাজারের মোড়ের কাছে এসে আমাকে দাঁড়াতে হল। খাবার জিনিস কিছু কেনা দরকার। আমাদের গাড়ি বিকেলে ছাড়বে, জামনগর পৌঁছবে রাত বারোটার পর। এর মাঝে কোন স্টেশনে খাবারের ব্যবস্থা নেই। মিঠাপুর তো ওখা ছাড়লেই পৌঁছবে। সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব আজকাল আমার উপরেই এসে পড়েছে। কাজেই সারাক্ষণ সচেতন থাকতে হয়। মামা বললেন : দাঁড়ালে যে ?

আপনারা এগিয়ে যান, আমরা এখুনি এসে পড়ব।

মামা বললেন : কিছু একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে।

স্বাতি বলল : আমি গোপালদার মতলব ভেঙে দেব।

আসুন না।

বলে জো তাকে সাহস দিলেন।

তার আগেই মামী বলেছিলেন : পাগল নাকি ! এই দুপুর রোদে কেউ ঘুরে বেড়ায় !

কথাটা কানে যেতেই জো বললেন : ঠিক কথা।

স্বাতি হেসে উঠল খিল খিল করে।

অপ্রতিভ ভাবে জো বললেন : আপনি হাসছেন !

স্বাতি বলল : দেখুন না গোপালদার কাণ্ড, এদিক সেদিক ঘুরে একে ওকে দু-চার কথা জিজ্ঞেস করে স্টেশনে ফিরবেন। তারপর ওঁকে আর পায় কে ! গুলগাপ্পি দিয়ে আরও দু ডিগ্রী দাম বাড়াবেন।

খুশী হয়ে জো বললেন : তা যা বলেছেন। চলুন তাহলে, উনি নিজের কাজকর্ম সেরেই ফিরুন।

সবাই এগিয়ে গেলেন। আমি শুধু রামখেলাওনকে সঙ্গে নিলুম।

ছোট বাজার। গ্রামের মতো নয়, ছোটখাট শহরের মতোই। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, একটি ধর্মশালা আছে, আর আছে ওখেশ্বর মহাদেবের মন্দির। বন্দরের জন্যই ওখার বাজার, আর বেট দ্বারকার

যাত্রীদের জন্য ধর্মশালা। যাঁরা অসময়ে আসেন, কিংবা ফেরেন অসময়ে, তাঁরাই থাকেন ধর্মশালায়। তা না হলে বেট দ্বারকায় ধর্মশালার অভাব নেই, ব্যবস্থাও ভাল।

যে ভদ্রলোকের কাছে আমি এই সব খবর নিচ্ছিলুম, তিনি হিন্দী জানেন। জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি রেলের লোক?

বললুম: কেন এ রকম সন্দেহ করছেন বলুন তো!

ভদ্রলোক বললেন: যাঁরা পয়সা খরচ করে তীর্থ করতে আসেন, তাঁরা বেট দ্বারকায় কয়েক দিন বিশ্রাম করেন। যাঁরা বিনি পয়সায় আসেন রেলের পাসে, তাঁদেরই ফেরবার তাড়া।

হেসে বললেন: চলতে পয়সা লাগে না তো, লাগে কোনখানে স্থির হয়ে থাকতে।

আমি লজ্জিত ভাবে বললুম: আমরাও বুঝি রেলের লোকের মতো চলেছি!

চলার ধরন দেখে তো তাই সন্দেহ হচ্ছে।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন: এখন কি দেশে ফিরবেন?

বললুম: না। এখান থেকে আমরা সোমনাথ দর্শনে যাব।

ভদ্রলোক বললেন: ডাকোরে বোধ হয় যাবেন না?

ডাকোরা!

গুজরাতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ডাকোরের নামই শোনেন নি।

ভদ্রলোকের কথার ধরনে আমি লজ্জা পেলুম অপরিসীম। বললুম: সত্যিই তাই। আমরা শুধু দ্বারকা ও সোমনাথের নাম জানি। দ্বারকার রণছোড়জী আর প্রভাসের সোমনাথ। বেট দ্বারকার নামও আমরা শুনেছি, কিন্তু তীর্থস্থানের যে তালিকা আমাদের আছে, তাতে ডাকোরের নাম নেই।

ভদ্রলোক বললেন: এ কথা শুনে আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগে। দ্বারকায় এসে আপনারা নকল রণছোড়জী দেখে চলে যান, কিন্তু আসল রণছোড়জীর খবরও পান না।

আমি মেনে নিয়ে বললুম : এ যে আমাদের দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করে আমরা জানব বলুন।

তাও ঠিক। দ্বারকার পাণ্ডারা আপনাদের কখনও বলবে না যে তাঁদের রণছোড়জী নকল।

আসল ও নকল দেবতার অনেক গল্প আমি শুনেছি। মুসলমান অত্যাচারের ভয়ে মন্দিরের পূজারীরা অনেক বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করেছিলেন মধ্যযুগে, তারপর সে সব বিগ্রহ আর ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। তাই আসল জায়গায় এখন নকল বিগ্রহের পূজা হচ্ছে। এই রকমেরই কোন গল্প আছে ভেবে আমি বললুম : কোনও আক্রমণের ভয়ে বুঝি বিগ্রহকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল ?

ভদ্রলোক বললেন : না, তা নয়। সে গল্প যদি শুনতে চান তো বসুন এখানে।

বলে এক দোকানের সামনের একখানা বেঞ্চিতে আমাকে বসতে বললেন। নিজেও বসলেন আমার পাশে। তারপরে একটি অলৌকিক কাহিনী শোনালেন।

সে অনেক দিনের পুরনো কথা। ডাকোরের এক বিষ্ণুভক্ত, নাম তার বোদানো। প্রতি বছর সে দ্বারকায় যায় রণছোড়জীর দর্শন মানসে। কিন্তু সাধারণ যাত্রীর মতো খালি হাতে যায় না। তার হাতের তেলোয় তুলসীর গাছ গজায়, সেই তুলসীর পাতা সে রণছোড়জীকে নিবেদন করে। বছরের পর বছর সে ডাকোর থেকে পায়ে হেঁটে দ্বারকায় যায় আর দেবতাকে দেখে বুক ভরা সুখ নিয়ে ফিরে আসে।

একদিন সে বুড়ো হল, পা আর চলে না। তবু কোন রকমে দ্বারকায় এসে রণছোড়জীকে বলল, এ কী হল আমার। আর কি তোমার দর্শন পাবো না ?

গভীর রাতে স্বপ্ন দেখল বোদানো। রণছোড়জী তাকে বলছেন,

ভয় কী, এবারে আমি তোমার সঙ্গে যাব। আর এখন থেকে ডাকোরেই থাকব।

বোদানোর আনন্দ আর ধরে না। ঘুম থেকে উঠে সে ডাকোর যাত্রা করল। আর রণছোড়জী চললেন তার সঙ্গে।

সকাল বেলায় রণছোড়জীর পূজারী গুগ্‌লি ব্রাহ্মণেরা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে মন্দিরে বিগ্রহ নেই! কোথায় গেল বিগ্রহ! বোদানোর কথা তাদের মনে পড়ল, এ নিশ্চয়ই ঐ বুড়োর কাজ। নিশ্চয়ই সে বিগ্রহ চুরি করে নিয়ে গেছে। অমনি তারা বোদানোর পিছনে ছুটল, তীর ধনুক নিয়ে কাবারা চলল তাদের সঙ্গে। কাবা হল ব্যাধের জাত, তাদের লক্ষ্য খুব সাংঘাতিক, একবার দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। দেবতা তাই ভক্তকে রক্ষার জন্যে স্বপ্নে আবার দেখা দিয়ে বললেন, গোমতী সরোবরে আমাকে লুকিয়ে রাখ।

কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণেরা ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বলল, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত বিগ্রহ তারা খুঁজে পেল। সরোবরের জলে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল তারা। বিগ্রহের গায়ে লেগেছিল সেই বর্শার খোঁচা। এখনও সেই দাগ আছে বিগ্রহের গায়ে।

ভদ্রলোক থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম: তারপর কী হল?

আমার কৌতূহল দেখে তিনি খুশী হয়ে বললেন: এই গল্পের একটি রকমফের আছে। কেউ বলে যে কাবাদের তীর লেগে বোদানোর মৃত্যু হয়েছিল, আর দেবতা স্বপ্ন দিয়েছিলেন তার সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে। আবার কেউ বলে যে তা নয়, রণছোড়জীর ভক্তের গায়ে কেউ হাত দিতে পারে নি। পূজারী ব্রাহ্মণেরা বিগ্রহ নিয়ে যাচ্ছে দেখে দেবতা স্বপ্নে আবার দেখা দিয়ে বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের বল যে তারা বিগ্রহের ওজনের সমান সোনা নিয়ে ফিরে যাক।

ভয় পেয়ে বোদানো বলেছিল, কিন্তু অত সোনা আমি কোথায় পাব! দেবতা বলেছিলেন, সে ভাবনা তো তোর নয়, তোর ঘরে যা আছে তাই দিবি।

পূজারী ব্রাহ্মণেরা রাজী হয়েছিল এই প্রস্তাবে। তারাও কোন স্বপ্ন দেখেছিল কিনা তা কেউ জানে না। বিগ্রহ ওজন করা হবে, কিন্তু সোনা কই! বোদানোর স্ত্রীর কানে শুধু এক জোড়া দুল। দেবতাকে স্মরণ করে সে তাই কান থেকে খুলে দিল।

কালো পাথরের বিরাট বিগ্রহ রণছোড়জীর। সোনার দিকে তাকিয়ে পূজারীরা হাসল। কিন্তু কী আশ্চর্য! বিগ্রহের ওজন হল মাত্র একটি দুলের সমান।

কথা দিয়েছিল ব্রাহ্মণেরা, তাই একটি দুল নিয়ে তাদের ফিরে যেতে হল। আর ডাকোরে প্রতিষ্ঠা হল রণছোড়জীর।

আমি প্রশ্ন করলুম: দ্বারকার মূর্তি তাহলে কোথা থেকে এল?

ভদ্রলোক বললেন: রণছোড়জী নাকি পূজারীদের স্বপ্ন দিয়েছিলেন পরে। দ্বারকায় সাবিত্রী ভাবে আর একটি মূর্তি পাওয়া যাবে। ভাব মানে কুয়ো। কয়েক মাস পরে সত্যি তারা আর একটি বিগ্রহ খুঁজে পেয়েছিল। সেই মূর্তিরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে দ্বারকার মন্দিরে।

এ হল কিংবদন্তীর কথা। কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। কবি গোপালদাস নাকি লিখেছেন যে ১২১২ সংবতের বৃহস্পতিবার কার্তিক পূর্ণিমার দিন বোদানো এই বিগ্রহ দ্বারকা থেকে ডাকোরে নিয়ে গিয়েছিল। সরকারী গেজেটিয়ারেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিগ্রহ সরানো হয়েছিল। দুর্গাশঙ্কর শাস্ত্রী মনে করেন যে মুহম্মদ গজনী যখন সোমনাথ লুণ্ঠন করেন দ্বারকা তখন কোন তীর্থস্থান ছিল না। তীর্থ রূপে দ্বারকা সম্মান পাচ্ছে ১২০০ সংবতের পর থেকে। কিন্তু এই মন্তব্য সত্য কিনা তা সন্দেহ

করবার যুক্তি আছে। বরাহ পুরাণে আমরা দ্বারকার অজস্র উল্লেখ দেখি। লক্ষ্মীধরের তীর্থকল্পতরুতেও আছে দ্বারকার কথা। সে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা।

ডাকোরের মন্দির কত প্রাচীন আমি তা জানতে চাইলুম।

ভদ্রলোক বললেন: শুনেছি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। এর জন্যে গোপাল জগন্নাথ তাম্বেকের এক লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তি, হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, অপরূপ সুন্দর মূর্তি, সোনার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। এই সিংহাসনটি দিয়েছেন বরোদার গাইকোয়াড়, তার মূল্য ছিল সোয়া লক্ষ টাকা।

আমি বললুম: আপনি নিশ্চয়ই এ মন্দির দেখেছেন!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আপনারাও দেখে যাবেন। ডাকোর কোন বড় স্টেশন নয়, বড় লাইনের উপরেও নয় এই স্টেশন। আমেদাবাদ থেকে যে লাইন বম্বে গেছে, তার উপরে আনন্দ নামে একটি স্টেশন আছে। এইখানে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে যেতে হয় ডাকোরে। ঘণ্টা দুয়েকের যাত্রা। আমেদাবাদ থেকে তিন চার ঘণ্টায় পৌঁছনো যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম: যাত্রীর ভিড় কেমন?

ভদ্রলোক বললেন: ছোট লাইনের গাড়িতে চাপলেই দেখতে পাবেন। প্রতি দিন বহু যাত্রী এই তীর্থে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের টান যে এ যুগেও এত প্রবল, তা দেখে আপনার ভাল লাগবে। নবরাত্রির উৎসবের সময় গেলে সেই সমারোহের স্মৃতি আপনার চিরকাল মনে থাকবে।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন: আপনি জানেন কিনা জানি না। এ দেশে বৈষ্ণব ধর্মের অনেক সম্প্রদায় আছে। বল্লভাচার্য স্বামীনারায়ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের সম্প্রদায়গুলি পৃথক মন্দিরে পূজা করে থাকেন। কিন্তু ডাকোরের রণছোড়জী সকল সম্প্রদায়েরই প্রিয়

দেবতা। আর এই জন্মেই ডাকোর সকল যাত্রীর কাছেই সমান প্রিয়।

আমি বললুম : তারপর!

আর কী বলব বলুন।

বলুন মন্দিরের কথা, আর অন্যান্য দ্রষ্টব্যের কথা।

ভদ্রলোক বললেন : প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে বেশ বড় মন্দির। ভাল কারুকার্যও আছে। অঙ্গনে প্রবেশের জন্য দুটি দ্বার উত্তরে ও পশ্চিমে। নিকটে গোমতী সরোবর, তার অনেকগুলো বাঁধানো ঘাট। যে ঘাটের উপরে রণছোড়জীকে ওজন করা হয়েছিল, সে ঘাটটিও দেখতে পাওয়া যায়। ভক্ত বোদানোরও একটি ছোট মন্দির আছে। আর আছে ত্রিকমজী বিষ্ণুর মন্দির ও ডঙ্কনাথ মহাদেবের মন্দির।

আমার মনে হয় যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা না হলে ডাকোর সম্বন্ধে আমি অজ্ঞান থেকে যেতুম। বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোককে তাই আমি অজস্র ধন্যবাদ জানালুম।

২০

আমি একটা প্রয়োজনের কথা ভেবে বাজারে এসেছিলুম। আজ রাতের আহার কোন স্টেশনে পাওয়া যাবে না। বিকেল বেলায় আমাদের ট্রেন ছাড়বে, আর অনেক রাতে পৌঁছবে জামনগরে। সঙ্গে খাবার না নিলে আমাদের খুবই বিপদ হবে। তাই ভেবেছিলুম যে কিছু শুকনো খাবার আর ফলমূল কিনে স্টেশনে ফিরব।

কিন্তু স্বাতির কথাই সত্যে পরিণত হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন মানুষের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলুম যিনি একেবারে নতুন কথা শোনালেন আমাকে। দ্বারকার চেয়েও বড় তীর্থ আছে এ অঞ্চলে, এ কথা বললে অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। স্টেশনে ফিরে এ কথা আমি বলতেও পারব না। স্বাতি তখনই হাসবে কৌতুকের হাসি।

কিন্তু এখানকার বাজারে পছন্দমতো কি কিছু পাওয়া যায়! অনেক খুঁজে একটা বেকারি পাওয়া গেল। সেখান থেকে আধ পাউণ্ডের রুটি নিলুম কয়েকখানা। ফলের দোকান থেকে নিলুম কলা ও বড় বড় দুটো পেঁপে। তার আকার দেখেই মন ভরে যায়।

ফেরার পথে আমি রামখেলাওনের কথা ভাবছিলুম। অদ্ভুত লোক। তাকে কথা বলতে আমি শুনি নি। ডাকলে কাছে আসে নিঃশব্দে, কথা বলার প্রয়োজন হলে ঘাড় নাড়ে, কৈফিয়ৎ দেয় না অনুযোগের। মনে মনে ঠিক করলুম, আজ তার গলার আওয়াজ শুনব। জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার বাড়ি কোথায় রামখেলাওন?

ভেবেছিলুম এ রকম প্রশ্নের উত্তর এড়ানো যায় না। কিন্তু সে লোকটা একটু হেসে উত্তরটা এড়িয়ে গেল। হাসির অর্থটি কিন্তু পরিষ্কার—বাড়ির বালাই নেই। কিন্তু কেন নেই! সে পূর্ববঙ্গের

বাঙালী নয়, পাঞ্জাবীও নয় পশ্চিম পাঞ্জাবের। যত দূর মনে হয়, তার দেশ হবে বিহারে, গঙ্গার উত্তরে।

আমি আবার প্রশ্ন করলুম : বাড়ি নেই তোমার ?

রামখেলাওন আরও স্পষ্ট ভাবে হাসল। এই হাসির অর্থ আরও পরিষ্কার—কটা লোকের বাড়ি আছে। সত্যিই তো, এই বিরাট দেশে জমি অনেক আছে। কিন্তু সেই জমি তো আমার মতো বা রামখেলাওনের মতো লোকের হাতে নয়। বাড়ির স্বপ্ন কি আমরা দেখতে পারি ! পরিশ্রমের পুরো মূল্য যেদিন পাওয়া যাবে, সেদিন দেশের রূপ পালটাবে। আজকের গৃহহীন মানুষ সেই দিনেরই অপেক্ষা করে থাক।

তাকে আর কিছু বলবার আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলুম।

মামারা ওয়েটিং রুমে বসে গল্প করছিলেন। জো রায় জাঁকিয়ে বসে কথা কইছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন : আসুন গোপালবাবু, এখন সিন্ধের হিন্দুদের কথা হচ্ছে। বাস্তুহারা বাঙালী আর পাঞ্জাবীদেরই কথা আপনারা ভাবলেন, এই হতভাগাদের কথা কখনও ভেবেছেন কি ?

আমাদের হাতে খাবার জিনিস দেখে মামী সোজা হয়ে বসলেন। মামা বললেন : ও সব আবার কী আনলে ?

রাতের খাবার।

স্বাতি বলল : রাতে কি আমরা কলা আর পেঁপে খেয়েই থাকব ?

এ সব না খেলে উপোস করতে হবে। তা পারবে কি ?

মামা আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন। বললেন : সত্যি গোপাল, তুমি আছ বলেই আমরা নিশ্চিন্ত আছি।

মামী হাত বাড়িয়ে পেঁপে দুটো নিয়ে বললেন : খাসা জিনিস।

বেতের ঝুড়ি ছিল পায়ের কাছে। তার ভিতর তুলে রাখলেন :

কলাও তুললেন। পাঁউরুটি বাহিরে রাখতে হল। বললেন: মাখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, সুবিধে মতো এক কৌটো কিনে রাখতে হবে।

একখানা চেয়ার টেনে আমি জো রায়ের পাশে বসে বললুম: বলুন এইবারে সিন্ধুর হিন্দুর গল্প।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে জো রায় বললেন: অদ্ভুত!

অদ্ভুত কী দেখলেন?

ঠিক এই সময়ে স্টল থেকে কয়েক পেয়ালা চা এল, চা দেখে মামা প্রসন্ন হয়ে বললেন: আমাদের নাকি?

ওয়েটিং রূমে আরও জন কয়েক মেয়ে পুরুষ ছিল। তাই এই প্রশ্ন। বেয়ারাটাকে আমি বললুম: মামাবাবুকে আগে দাও।

ঘরে ঢোকবার আগে আমিই এদের বলে এসেছিলুম। জো রায়ের হাতে এক পেয়ালা চা উঠতেই তিনি আর একবার বললেন: অদ্ভুত!

এবারে আর আমি কোন প্রশ্ন করলুম না।

এক চুমুক চা খেয়ে জো বললেন: বুঝলেন গোপালবাবু, সিন্ধের হিন্দুরা একটা জাত বটে। মুসলমানদের কাছে তাড়া খেয়ে বেশি দূরে যায় নি। ওই যে আপনি বলছিলেন রন অব কচ্ছ, শুধু জলা জমিটা পেরিয়ে কচ্ছে এসে ঢুকেছে। গান্ধীধাম হচ্ছে তাদের নতুন করাচী। তার ব্যাপারই আলাদা।

বললুম: সবচেয়ে পরে সভ্য হয়েছে কিনা, সভ্যতার প্রতি তাই একটা মায়া আছে। এখনও তা আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

মামা জানতে চাইলেন: সবচেয়ে পরে সভ্য হয়েছে মানে!

লোকে তো তাই বলে। খ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই গোটা উত্তর ভারতটায় আর্য-সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধুদেশে হয় নি। মামা বললেন: সিন্ধুর উপত্যকাতেই তো আর্যদের প্রথম বসবাস।

ঠিক কথা। সেই প্রদেশের নাম সপ্ত সিন্ধব। কুনার সিন্ধু বিতস্তা আসিকনি ইরাবতী শতদ্রু ও বিপাশা বিধৌত উত্তর পাঞ্জাব। যে

মানুষেরা খ্রীষ্টের জন্মের ছ হাজার বছর আগে এসে এই প্রদেশ থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়লেন সিন্ধুর তীরে তীরে, তাঁরা সিন্ধু দেশে নামলেন না। ব্রহ্মাবর্তের সরস্বতী নদী থর মরুভূমির ভিতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে নামছিল। সিন্ধুদেশে তার স্রোত হারিয়ে গেল।

স্বাতি বলল: এমন অসভ্য ছিল দেশ!

বললুম: সে কথা সত্য কিনা জানি না। মহেঞ্জোদারো ধ্বংস হবার পর দেশটা অসভ্য হয়ে গেল, এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়। এক সময় এই মুলুকের সভ্যতা তো সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত ছিল।

স্বাতি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি জোকে জিজ্ঞাসা করলুম: গান্ধীধাম কি নতুন শহর?

একেবারে নতুন। মনে হবে যে শহরটা কেউ খাতার পাতায় এঁকেছে।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এমন সুন্দর!

জো রায় কিছু বিচলিত হয়ে বললেন: সৌন্দর্যে ঠিক নয়, পরিকল্পনায় বেশ অভিনব। শুনলুম পাঁচ লাখ লোকের জন্যে এই শহর তৈরি হচ্ছে। এখন প্রায় হাজার চল্লিশেক লোক জুটেছে।

এই শহরের পত্তন সম্বন্ধে কাগজে আমি অনেক কিছুই পড়েছিলুম। ভাই প্রতাপ দয়ালদাস নামে একজন কর্মবীরের নাম শুনেছি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে তিনি সিন্ধীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। দেশ ছাড়া চলে, কিন্তু একটা করাচী চাই। কচ্ছে আছে কান্দ্‌লা বন্দর। সেই বন্দরের উন্নয়নে ভারত সরকার প্রচুর টাকা ঢালবেন। কাজেই তারই পাশে একটু জমি পেলে নতুন করাচী আবার গড়ে উঠতে পারে। ভাই প্রতাপ শহরের পরিকল্পনা করলেন। মহাত্মাজী তখনও বেঁচে। তিনি এই উদ্যমের প্রশংসা করলেন। কচ্ছের মহারাও পিছিয়ে রইলেন না। সিন্ধু রিসেট্‌লমেণ্ট কর্পোরেশন নামে যে প্রতিষ্ঠান এই শহর গড়বে তাদের তিনি পনর হাজার একর জমি দান করলেন কান্দ্‌লার কাছে। সে গল্প এখনও আমার মনে আছে।

এই সুসংবাদ দিয়ে কচ্ছের দেওয়ান মহাত্মাজীকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি এই তার পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি তখন আচার্য কৃপালনী। ডক্টর চৈতরাম ও ভাই প্রতাপের সঙ্গে মহাত্মাজীর অস্থি তিনি কচ্ছে আনেন, এবং কান্দ্‌লা ক্রীকে সেই অস্থি বিসর্জন করেন। সেই দিনই এই নতুন শহরের নাম হল গান্ধীধাম।

জো বললেন : শহরের দুটো ভাগ আছে—সর্দারগঞ্জ ও আদিপুর, মাইল চারেক তফাতে। চমৎকার চওড়া রাস্তা, ধারে ধারে গাছ পোঁতা হয়েছে। চেষ্টা হচ্ছে বাগান করবার। মরুভূমির মতো রুক্ষ পাথুরে জায়গায় বাঙলার মতো শ্যামল শোভা আনবার চেষ্টা। ছাব্বিশ হাজার গাছ নাকি পুঁতেছে। সব শুদ্ধ আড়াই লক্ষ গাছ পুঁতবে।

চোখ বড় বড় করে স্বাতি বলল : শহর তো তাহলে বন হয়ে যাবে !

জো তখনি মেনে নিয়ে বললেন : প্রায় সেই রকমই অবস্থা।

আমি বললুম : শহরের দুটো ভাগ বলছিলেন।

বলছিলুম বটে। সর্দারগঞ্জ হল শহরের বাজার। বিরাট চওড়া রাস্তার ওপর প্রায় আড়াই শো দোকান। ওধারে আদিপুরে প্রায় হাজার চারেক বাড়ি তৈরি হয়েছে। শুনলুম, যারা বাস করে তারাই নাকি বাড়ির মালিক। কর্পোরেশন নাকি খুব সস্তায় এমন কি ইন্‌স্টল্‌মেণ্টে বাড়ি দিয়েছে সিন্ধী উদ্বাস্তুদের।

জো বলে চললেন : শুনে আশ্চর্য হবেন, মিউনিসিপ্যালিটি যাকে বলে, ঠিক তেমন কিছু গান্ধীধামে নেই। শহর পরিচালনার এক অদ্ভুত উপায় তারা করেছে। বাজার আর সিনেমার আয় থেকে শিক্ষার খরচ ওঠে।

স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল : সিন্ধীদের ভাষা কী ?

এই বিপদে ফেললেন !

বলে জো আমার দিকে তাকালেন।

হেসে বললুম : সিন্ধীদের সিন্ধী ভাষা। আগে আরবী অক্ষরে লেখা হত, এখন দেবনাগরীতে লেখা হচ্ছে। গুজরাতীও নিশ্চয়ই চলে।

জো বললেন : বাঁচালেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম : গান্ধীধামের নতুন মন্দির আপনি দেখেছেন ?

করুণ ভাবে জো বললেন : বাইরেটা দেখেছি। মন্দির বলে একেবারেই মনে হয় না, বরং দুর্গ বললে মানায়। জেলখানার মতো ইঁটের গাঁথুনি, কামানের শেলের মতো সরু হয়ে উপরে উঠেছে।

বর্ণনা শেষ হবার আগেই মামী বললেন : কোন্ ঠাকুরের মন্দির ?

জো বললেন : কী একটা অদ্ভুত নাম—

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : নির্বাস্ত্রেশ্বর শিবের ?

জো রায় খুশী হলেন অপরিমিত, বললেন : ঠিক বলেছেন। কী করে মনে রাখলেন বলুন তো ?

হেসে বললুম : নির্বস্ত্রদের শিব। তাই মনে আছে।

জো বললেন : মূর্তিটিও অদ্ভুত বলে শুনেছি। দাঁড়ানো শিব। শিবের এমন মূর্তি নাকি ভারতের আর কোথাও নেই।

মামীর চোখের দৃষ্টিতে এক রকমের আচ্ছন্নতা দেখলুম।

হঠাৎ একটা নাম আমার মনে পড়ল—জে. কে. চৌধুরী। এই তরুণ ভদ্রলোক নাকি গান্ধীধামের প্ল্যান তৈরি করেছেন। ভদ্রলোক বাঙালী কিনা, জোকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলুম। জো স্বীকার করলেন যে চৌধুরীর নাম তিনি শোনেন নি।

এই সঙ্গে কান্দ্‌লার গল্পও শোনালেন জো রায়। বললেন : বন্দর প্রতি দিন বাড়ছে। ভারত সরকার ধীসা থেকে কান্দ্‌লা পর্যন্ত রেল লাইন পেতে দিয়েছেন। কাজেই কান্দ্‌লার মাল এখন দিল্লী যাবে সোজা রাস্তায়। দিল্লী আহমদাবাদ লাইনে পালনপুর হল জংসন স্টেশন, আবু রোড আর মেহসানার মাঝামাঝি। পালনপুর থেকে কান্দ্‌লা সোজা রাস্তা।

বেলার দিকে নজর কারও ছিল না। সেই কথা মনে করিয়ে দিতে হল। এইবারে ঘড়ির দিকে চেয়েই মামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন : কী কেলেঙ্কারি দেখেছ।

মামী জবাব দিলেন : কেলেঙ্কারি কিসের! গাড়ি তো তোমার চলে যায় নি।

মামা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : চলে তো যেতে পারত।

মামী বললেন : গেলেই হল! এঁরা যাবেন না?

বলে আর সবাইকে দেখালেন।

মামা তাঁর পাইপ আর পাউঁচ রেখেছিলেন টেবলের উপরে। সে দুটো তুলে পকেটে পুরে বললেন : তা বটে।

কুলিরা দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিল। তাদের নিয়ে আমি ক্লোকরুমে গেলুম মাল ছাড়াতে।

২২

প্রথম শ্রেণীর কামরা একখানা খালি পাওয়া গেল। এতে চারজনের জায়গা। জো রায় জামনগর পর্যন্ত যাবেন, তাঁর স্থান হয়েছে পাশের কামরায়। জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে জো নিচে নেমে বললেন : আসছি।

নিচে নেমে তিনি কোথাও গেলেন না, ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মামা আমাকে ডেকে বললেন : তুমি যাচ্ছ কোথায়!

সত্যি কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললুম : মিস্টার রায়কে দেখে আসছি।

মামা বিশ্বাস করলেন, কিন্তু স্বাতি করল না। আমার মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি মেলে রইল। দৃষ্টিতেই আমি তার উত্তর দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলুম।

জো বললেন : আসুন এই গাড়িতে, এখনও ফাঁকা আছে।

দুজনেই পাশের গাড়িতে উঠলুম। আমি ভেবেছিলুম যে সিগারেট খাবার জন্যে জো এখানে এলেন, এবারে সিগারেট ধরাবেন। কিন্তু তা করলেন না। পকেট থেকে একটা ছোট নোট বুক বার করে বললেন : আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন তো!

বাড়ির ঠিকানা!

জো অত্যন্ত ভারিক্কি চালে বললেন : আমি আপনার বাড়ির ঠিকানাই চাইছি। কলকাতায় গিয়ে দেখা করব

আমার সঙ্গে!

আমার বিস্ময় আরও বাড়ল।

জো তাঁর সরু পেনসিলটা উঁচিয়ে বললেন : কেন এমন না বোঝার ভান করছেন! জজ সাহেবের কাছে আর্জি থাকলে পেশকারের কাছেই তা পেশ করতে হয়।

রহস্য খানিকটা স্বচ্ছ হলেও একেবারে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। বললুম : আমি বোকা মানুষ, আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন।

সবটুকু বলতে জো বোধ হয় লজ্জা পেলেন, তাই সংক্ষেপে বললেন : আপনার সাহায্য ছাড়া তো হবে না, ঠিকানাটা তাই টুকে রাখছি।

মনে মনে আমি আনন্দ পেলুম। জোর আচরণে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, তারও খানিকটা কারণ বোঝা গেল। হেসে বললুম : বাড়ির বালাই আমার নেই, উতোরপাড়ায় একখানা ভাঙা ঘর আছে। হারানিধির চায়ের দোকানে খোঁজ নেবেন, সেই বাৎলে দেবে।

এইটুকু খবরই জো নোট বুকে টুকে নিলেন। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন : বড়দিনের ছুটিতে আপনার শরণ নেব। এরই মধ্যে একটুখানি—

কথাটা জো শেষ করলেন না। নোট বুক পকেটে রেখে সিগারেট আর লাইটার বার করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়েই তাঁর মেজাজ আরও প্রসন্ন হল। বললেন : দেওয়ালির ছুটিতেই একবার যাবার চেষ্টা করব।

যেতে আসতেই তো ছুটি কাবার হবে।

বেশি সময় তো লাগবে না। রাতে উঠলে ভোর বেলাতেই পৌঁছান যাবে। নাগপুরে বদলিতেই যা সময় নষ্ট।

আকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই এ সব কথা মনেই আসে না। লজ্জিত ভাবে বললুম : সে কথা ঠিক।

গর্বিত ভাবে জো বললেন : সত্যি কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না, তা না হলে বলতুম।

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললুম : কেন করব না!

জো বললেনঃ অনেকেই সন্দেহ করেন কিনা, তাই আজকাল আর বলি না। সে মশাই সত্যিই অবিশ্বাস্য ঘটনা। কলকাতা থেকে বিলেত। দেশ থেকে বিদেয় করে বাবা ভাবলেন নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু মা এদিকে পা ছুঁইয়ে নানা রকম প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। আমি যাই কোথায় বলুন!

সবটা না বুঝেও আমি গম্ভীর ভাবে বললুমঃ খুব সত্যি কথা।

খুশী হয়ে জো বললেনঃ এই দেখুন, আপনি যত সহজে বুঝলেন, ঠিক এমনটি কেউ বোঝে না। বুঝলে কত সুবিধে হত বলুন!

তার পরেই বললেনঃ এ সব কথা আবার বুড়ো বুড়ির কাছে বলবেন না যেন। তাঁরা যে স্কুলের, তাতে আমার পরকালটা নষ্ট হবে।

পরকাল!

পরকাল মানে পরের কাল। মানে বুঝলেন না! ফিউচার্‌ণ চলতি কথায়—

আমি বললুমঃ ভবিষ্যৎ।

ঠোঁটের সিগারেটটা সরিয়ে জো বললেনঃ অদ্ভুত!

ভদ্রলোক ইংরেজী কথাই বলেন বেশি। বাঙলার সঙ্গে ইংরেজী মেশানো এক বিচিত্র ভাষা। কানে বড়ই কটু লাগে।

জো আর একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেনঃ কী মনে হয় আপনার, চান্স আছে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। তবু উত্তর দিতে হল। বললুমঃ নেই কেন ভাবছেন?

জো রায় খুশী হয়ে বললেনঃ ঠিক বলেছেন। এইটেই আমাদের উইক্‌নেস। গোড়া থেকেই আমরা হাল ছেড়ে বসে থাকি।

একটু উত্তেজিত ভাবে জো রায় জোরে জোরে ধোঁয়া নিতে লাগলেন। বললুমঃ তাড়াতাড়ি নেই, গাড়ি ছাড়তে এখনও দেরি আছে।

তা ঠিক, কিন্তু ওঁরা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হচ্ছেন!

ব্যস্ত যে হয়েছিলেন তা বুঝতে পারলুম স্বাতিকে দেখে। প্ল্যাটফর্মে নেমে স্বাতি আমাদের দেখছিল। তার উপর আমার চোখ পড়তেই সরে গেল। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল নিজের অজ্ঞাতসারে। জো রায়ের আকর্ষণের কারণ আমি মেনে নিলুম।

জো স্বাতিকে দেখতে পান নি। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন: কী দেখছেন?

বললুম: একটি মেয়ে যাত্রীকে।

মেয়ে যাত্রী!

বলেই জো লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে গেলেন দেখতে। কিন্তু স্বাতি তখন নিজের গাড়িতে নিশ্চয়ই উঠে পড়েছিল।

জো রায়ের ভিতর ও বাহির দুটোই যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলুম: কলকাতা থেকে কেন এদিকে বদলি নিয়ে এলেন?

প্রচুর ক্ষোভের সঙ্গে জো বললেন: আর বলবেন না। লক্ষ্মীছাড়ারা কিছুতেই সেখানে থাকতে দিল না। বলে, আমি নাকি অফিসের চেয়ে ক্লাবে বেশি থাকি।

তারপরেই বললেন: কথাটা মিথ্যে বলে না।

আমার আর একটা কথা জানবার ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম: আপনার বাবা কী বলেন?

তাচ্ছিল্যের সুরে জো বললেন: সব সময়েই বলেন, তোর চাকরি যাবে। যেন ওঁর জন্যেই আমার চাকরিটা আছে।

চাকরিতে নিষ্ঠার পরিচয় আমি পেয়েছি। কাজ করতে এসে কাজের কথা ভুলে গেলেন। আমি নিশ্চয়ই জানি, ফেরার পথেও তিনি মিঠাপুরে নামবেন না। দায়িত্বশীল পদে অবহেলার অবকাশ নেই। তাইতেই বেশি মান, বেশি মাইনে। আমরা যখন সামান্য টাকা হাত পেতে নিই, আর তুলনা করি বড় বড় সাহেব-সুবোর সঙ্গে, তখন আমাদের এই উত্তরই শুনতে হয়। তবু আমরা নিয়মিত

কলম পিষি, দশটা থেকে পাঁচটা অবধি অনলস অভ্যাসে। সাহেবদের নজর বাঁচিয়ে আমরা ফাঁকি দিই। বলি, কয়েকটা টাকা বেশি পেলে এই ফাঁকিটুকু আর দেব না। কর্তৃপক্ষ এ কথা বিশ্বাস করে না। বলে, ফাঁকি মানুষ দেবেই, ফাঁকি দেওয়া মানুষের অভ্যাস। জো রায়ের মতো কাজ করলে আমার চাকরি নিশ্চয়ই থাকত না। তাঁর বাবা বোধ হয় ঠিকই বলেন।

জো বললেন: আপনারও কি এই মত নাকি?

আমার মতামতের কী দাম!

দ্বিতীয় সিগারেটটা তখন তাঁর শেষ হয়েছিল। ছোট টুকরোটা জানালার বাহিরে ছুঁড়ে ফেলে বললেন: আসুন।

জো রায়ের সঙ্গে নেমে আমরা মামার কামরাতেই এলুম। কিন্তু আশ্চর্য হলুম মামার কথা শুনে। বলছিলেন: এ সব জাত ধর্মের ব্যাপার গোপালকে জিজ্ঞাসা কোরো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: এই যে তুমি এসেই গেছ দেখছি।

স্বাতি এমন একটা ভঙ্গি করল যে তার আর এ গাড়িতে থাকা চলবে না।

বেঞ্চের একটা ধারে একটুখানি জায়গা সংগ্রহ করে বললুম: আমায় কিছু বলবেন মামাবাবু?

মামা তখন পাইপ টানছিলেন। স্বাতি বলল: ধর্মকথা শোনাও।

মামীর মুখ দেখে মনে হল না যে আমার কাছে কিছু শোনবার সাধ তাঁর আছে। তাই তিনি নিজে কোন প্রশ্ন করলেন না।

মামা তাঁর পাইপ সরিয়ে বললেন: কী জানতে চাইছিলে তুমি, গোপালকে বল না!

মামী তবু কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না দেখে স্বাতি হাসল আমার দিকে চেয়ে। মামা নিরস্ত হলেন না, বললেন: এ সব কথা

তুমি একবার বলেছিলে, বোধ হয় ত্রিচিনপল্লীতে। তাই না স্বাতি?

স্বাতি বলল: এবারে উদয়পুরেও তো বলতে শুরু করেছিলেন।

ভাল বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

মামা বললেন: বৈষ্ণবদের কথা। বৈষ্ণব বলতে এখনও আমরা একটা সম্প্রদায়ই বুঝি। তোমার কাছেই প্রথম শুনলুম যে তাদেরও আবার দল আছে।

এবারে আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। বললুম: এ সব বাদানুবাদের কথা আপনাদের ভাল লাগবে না।

স্বাতি বলে উঠল: গোপালদা নিজের দাম বাড়াচ্ছে বাবা।

মামা হেসে বললেন: বৈষ্ণবদের চারটি সম্প্রদায়ের কথা তুমি বলেছিলে, তাই না?

সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

মামা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন: হ্যাঁ মানে। তার পরে কী বল।

জো রায় তাঁকে সমর্থন করে বললেন: বলুন না তার পরের কথা।

স্বাতি হাসছিল। সেই হাসি উপেক্ষা করে বললুম: ঋষি শ্রী ব্রহ্ম ও রুদ্র সম্প্রদায়।

মামা মাথা নেড়ে বললেন: এ সব নাম তো তুমি বল নি, তুমি বলেছিলে নিম্বার্ক রামানুজ মাধব ও বল্লভের নাম।

বললুম: দুইই ঠিক। আমি যা বলেছি তা প্রাচীন নাম, আপনি এই সব সম্প্রদায়ের নতুন নাম বললেন। ঋষি সম্প্রদায়ের আর এক নাম ছিল চতুঃসন সম্প্রদায়। বর্তমানে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার এঁদের আদি আচার্য। নিম্বার্কাচার্য দক্ষিণ দেশের মানুষ হলেও এখন তাঁর প্রধান কেন্দ্র ব্রজমণ্ডল।

মামা বলে উঠলেন : মনে পড়েছে। তুমি কবি জয়দেবকে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলে মন্তব্য করেছিলে যে এক সময় বাঙলা দেশে তাঁর আদর ছিল।

আপনার ঠিক মনে আছে দেখছি।

মামা গর্বিত ভাবে চাইলেন মামীর মুখের দিকে।

স্বাতি বলল : রামানুজের গল্প আমার মনে আছে। তোতাদ্রি মঠের সাধুরা তো তাঁরই সম্প্রদায়ের!

বললুম : ঠিক কথা। আর এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও এসে পড়ে। আমার মনে হয় যে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণবদের এতগুলো সম্প্রদায়ের বোধ হয় সৃষ্টি হত না।

মামা সোজা হয়ে বসে বললেন : কেন?

নিম্বার্কাচার্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আমাদের ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব থেকে হিন্দুদের মুক্ত করবার জন্যে শঙ্করাচার্য প্রচার করলেন তাঁর অদ্বৈতবাদ। তাতে নিম্বার্ক মত বদলে গেল। রামানুজ দেখলেন যে সাধারণ মানুষ শঙ্করকে ভুল বুঝেছে, তার ফলে নাস্তিকে দেশ ভরে যাচ্ছে। অমনি তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারে লেগে গেলেন। এত দিনে বৈষ্ণব ধর্ম হল সাধারণ মানুষের উপযোগী। আজও সমস্ত দক্ষিণ ভারত তাঁর এই মত আঁকড়ে ধরে আছে।

কিন্তু রামানুজের বৈষ্ণব ধর্মের ধার ছিল না, মাধবাচার্য সেই ধার আনলেন তাঁর দ্বৈত মতে। তিনি বিশ্বাস করলেন যে সাধারণের সাধনার জন্যে দ্বৈতবাদই উৎকৃষ্ট, আর শ্রুতি স্মৃতির চেয়ে পুরাণের প্রয়োজন হল বেশি। শঙ্করকে তিনি নাস্তিক বললেন, আর বললেন ভক্তিমার্গে জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।

মামা বললেন : মনে পড়েছে, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে মাধবাচার্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

আমি কিছু বলবার আগেই মামী বললেন : তোমার স্মৃতিশক্তি দেখছি দিনে দিনে প্রখর হচ্ছে।

মামাকে উত্তর দেবার অবকাশ আমি দিলুম না, বললুম : সকলের শেষে এলেন আচার্য বল্লভ। জন্ম দক্ষিণ দেশে, বাস গোকুলে, দেহরক্ষা করেছেন কাশীধামে। লোকে বলে, ইনি বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পান আর কাশীর হনুমান ঘাটে গঙ্গালাভ করেন সজ্ঞানে। তাঁর শুদ্ধাদ্বৈতবাদে যে নতুন উপাসনা প্রণালী দেখালেন তার নাম পুষ্টিমার্গ। তিনি বললেন যে ভগবানের উপাসনার জন্যে উপবাস বা কোন শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের দরকার নেই, ভোগবিলাস ও দেবসেবা একই সঙ্গে চলতে পারে।

চমৎকার ব্যবস্থা, কী বল?

বলে মামা মামীর দিকে তাকালেন সকৌতুকে।

জো বললেন : অদ্ভুত!

বললুম : পুষ্টিমার্গ বাঙলা দেশে কেন পুষ্ট হল না, সে কথা নাথদ্বারের সেই ভদ্রলোককে বলেছি। বাঙলা গরীবের দেশ। অনুষ্ঠানের ত্রুটি বাঙালী আচার ও ভক্তি দিয়ে ঢাকে। তারা মন্দির গড়ে না, ধর্মশালা চালায় না। কিন্তু ঘরের এক কোণে আছে একটি ঘট বা পট। তারই ওপর একটু ফুল জল দিয়ে তার দিনের শুরু। তিথি পার্বণ মানেই তো নিরম্বু উপবাস!

আশ্চর্য হয়ে জো বললেন : সত্যি নাকি!

মামাও আপত্তি জানিয়ে বললেন : এ তুমি বাড়িয়ে বলছ।

বললুম : আমরা যে বাঙলা দেখি তার সঙ্গে আসল বাঙলার অনেক তফাত। কলকাতা শহরটা তো বাঙলা নয়। কলকাতায় আজ বাঙালী কটা!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : তা বটে।

বললুম : সাধারণ বাঙালী ভাবে, বিশেষ করে বাঙালী মেয়ে, যে দান ধ্যান করে পুণ্যার্জন যখন সম্ভব নয়, তখন মন প্রাণ দেবতার পায়ে দিয়ে যেটুকু আদায় করা যায়।

মামী তাঁর বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন।

বললুম : যাঁরা বড়লোক, অগাধ যাঁদের পয়সা, দেবতার পায়ে প্রাণ মন দেবার তাঁদের সময় কোথায়! ইচ্ছাই বা কেন হবে! তাঁরা মন্দিরের মেঝে মার্বেল পাথরে বাঁধিয়ে দেবেন, দরজা মুড়ে দেবেন সোনা রূপোর পাত দিয়ে, হীরে জহরতের মালা পরাবেন বিগ্রহের গলায়। জানেন বোধ হয় যে ধর্মাদায়ের আয় ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়ে না! তাই তাঁরা বিক্রির একটা ছোট অংশ ফেলেন ধর্মাদায় খাতে। সেই টাকায় ধর্মশালা তৈরি করেন, হীরে জহরত কেনেন দেবতার নামে।

জো রায়ের চোখের দিকে চেয়ে আমি উৎসাহ পেলুম। বললুম : ধর্ম সম্বন্ধে ছুটো মানুষের ধারণা এক রকম হয় না। পাপী ও পুণ্যাত্মা একই সঙ্গে বাস করে নিশ্চিন্তে নিরাপদে। তাদের গায়ে কোন ছাপ নেই, মানুষের বিচারে তারা কদাচিৎ ধরা পড়ে। সকলের স্বরূপ বিচার হয় শেষ দিনের পর। সে বিচারকের ভুল কোন দিন হয় নি।

আস্তে আস্তে স্বাতি বলল : রাজস্থান আর সৌরাষ্ট্রের কথায় তুমি বলছিলে বটে যে এই দেশে বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গেরই প্রভাব।

বললুম : বেট দ্বারকা এঁদের একটা মস্ত ঘাঁটি।

গল্পে গল্পে পাঁচটা বেজে গেছে খেয়াল করি নি। একটা ধাক্কা দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল। জো রায় বললেন : অদ্ভুত!

২২

স্বাতি সহসা জো রায়কে জিজ্ঞাসা করল : আপনি মরুতীর্থ হিংলাজ গেছেন ?

বড় বড় চোখে জো স্বাতির মুখের দিকে তাকালেন। বোঝা গেল যে এই অদ্ভুত নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আজও হয় নি। তাই ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন : কী তীর্থ বললেন ?

মরুতীর্থ হিংলাজ। শুনেছি সে তীর্থ নাকি ভারতের পশ্চিম সীমান্তে। ভারতের শেষ প্রান্তে কি আমরা পৌঁছই নি !

বিব্রত ভাবে জো বললেন : তা পৌঁছেছি।

স্বাতি এবারে আমাকে প্রশ্ন করল : হিংলাজ পড় নি গোপালদা ?

বললুম : না।

সে কি, হিংলাজ পড় নি ! অমন অদ্ভুত বই তুমি সত্যিই পড় নি !

বিজ্ঞাপন পড়েছি।

শুধু বিজ্ঞাপন !

হ্যাঁ।

কেন পড়লে না ?

যারা পড়েছে, তারা সে তীর্থে কোন দিন যাবে না। যাত্রার আনন্দের চেয়ে পথের বিভীষিকা নাকি বড় !

মামা যে বই কম পড়েন, সে কথা আমি জানি। তাই তাঁর প্রশ্নটা স্বাভাবিক মনে হল। বললেন : হিংলাজ কি কোন পীঠস্থান ?

বললুম : একান্ন পীঠের প্রথম পীঠ। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র সেখানে পড়েছিল। শক্তি কোট্টরী এবং ভৈরব ভীমলোচন। তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে—

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥

জো বললেন : কোন্ সতী ?

এই প্রশ্ন শুনে স্বাতি হাসল।

বললুম : দক্ষকন্যা সতী।

জো রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে পুরাণের এ গল্প তাঁর জানা নেই। তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হয় নি। কারও ক্ষতি হবে না। ভারতবর্ষে কী ছিল, সে কথা না জানলে কিছু আসে যায় না। কী আছে, সেটুকু জানলেই এ যুগে চলে যায়। কী আসবে, সে প্রশ্নও আজকের মানুষের কাছে অবান্তর। যা আসবে, তাই গ্রহণ করতে হবে। এই তো যুগের নির্দেশ। একদা ভবিষ্যৎ গড়বার যে স্বপ্ন ছিল মানুষের মনে, সে স্বপ্ন দেখবার আজ সময় নেই। মানুষ যাতে আর স্বপ্ন না দেখে, সমাজ আজ সেই চেষ্টাই করছে অহরহ। পৃথিবীটা তবু ঠিক যন্ত্রের মতো চলে না। দু একটা পাগল কোথা থেকে জন্মায়, বাড়ে চোখের আড়ালে, তারপর তার পাগলামি শুরু হলেই সবাই টের পায়। এই সব পাগলের সংখ্যা দিনে দিনে বিরল হয়ে আসছে। তবু তো আছে। একটা পাগল থাকলেই একটা যুগ চলবে। পৃথিবীকে তার পথ ভুলতে কিছুতেই দেবে না।

স্বাতি আমাকে বলল : কী ভাবছ বল তো! দক্ষযজ্ঞের গল্পটা কি বলবে ?

এ কথার পিছনে যে একটু বিদ্রূপ আছে তা বুঝতে আমার কষ্ট হল না। হয়তো বিদ্রূপ নয়, হয়তো তার কথা বলারই এই ধরন। এমনি করে কথা বলে একটুখানি আনন্দ পায়। আমি তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলুম : কিসের যজ্ঞ বল তো! রাজসূয়, না অশ্বমেধ ?

স্বাতি ভয় পেয়ে বলল : ওরে বাবা, অত শত আমি জানি নে।

ঘরে বসে হোম করলে তো আর পৃথিবীর মানুষকে নিমন্ত্রণ করবার দরকার হয় না। দক্ষ নিশ্চয়ই একটা বড় যজ্ঞ করেছিলেন, তাতে নিজের মেয়ে জামাই সতী ও শিবকে বাদ দিয়ে আর সবাইকে ডেকেছিলেন যোগ দিতে।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : উত্তরটা তুমিই দাও গোপাল।

বললুম : তার নাম বৃহস্পতি যজ্ঞ। সত্য যুগে শিবের কাছে অপমানিত হয়ে দক্ষ প্রজাপতি এই যজ্ঞের আয়োজন করেন। তারপরের ঘটনা তো সকলের জানা। নিমন্ত্রণ না পেয়েও সতী বাপের বাড়ি এলেন, কিন্তু বাপের মুখে স্বামীর নিন্দা সইতে পারলেন না। যজ্ঞস্থলেই দেহত্যাগ করলেন।

মামা মামীর শ্রবণ বাঁচিয়ে বললুম : একালের সতী হলে নিন্দেটা নিশ্চয়ই উপভোগ করতেন।

স্বাতিও অস্পষ্ট ভাবে বললী : উপভোগ কেন, উঠতে বসতে স্ত্রী নিজেই তো স্বামীকে সে সব কথা শোনাবে।

জো রায় বোধ হয় শুনতে পান নি, বললেন : ব্রহ্মরন্ধ্রের কী হল ?

বললুম : সতীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শিব তো প্রায় পাগল। মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেন। পৃথিবী রসাতলে যায় আর কি।

জো রায় চমকে উঠে বললেন : বলেন কি।

কিন্তু বিষ্ণু তা দেবেন কেন। তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে লাগলেন। একান্নটি খণ্ড পৃথিবীতে পড়ে একান্ন মহাপীঠ হল। হিঙ্গুলা বা হিংলাজে পড়েছিল সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র, এইটিই প্রথম পীঠ। দুর্গম বলে কম পরিচিত।

মামী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : রেল যায় না ?

স্বাতি হেসে বলল : রেল কি মা, পায়ে হেঁটেও যে যাওয়া যায় না। যেতে হয় উটের পিঠে চেপে। সাংঘাতিক মরুভূমির ভেতর একেবারে দুর্গম জায়গা।

এমন কঠিন জায়গা বলে আমার জানা নেই। মক্রান প্রদেশের মরুভূমির ভিতর একটি প্রাচীন তীর্থ। সিন্ধুর মোহনা থেকে আশি মাইল পশ্চিমে, আরব সাগর থেকে বারো মাইল দূরে। মক্রান ও লুখের মাঝখানে যে পাহাড়, তারই প্রান্তে হিঙ্গল নদীর পশ্চিম

তীরে এই হিংলাজ তীর্থ। পাহাড়ের উপর এক কালী মন্দির, স্থানীয় লোক তাকে নানী বা মহামায়ী বলে।

স্বাতির মুখ দেখে সন্দেহ হল যে এ গল্প তার পড়া মনে হচ্ছে না।

বললুম: কেন, ঠিক হল না বুঝি?

স্বাতি প্রতিবাদ না করে বলল: ঠিক মনে পড়ছে না।

হিংলাজ তীর্থের কথা আমি আর এক জায়গায় পড়েছি। শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। জাহাজে চেপে তিনি করাচী যান, সেখান থেকে নগর ঠাট্টা। তারপর মরুভূমি। সেথোর সঙ্গে উটের পিঠে চড়ে হিংলাজ। যাতায়াতে বারো চৌদ্দ দিন সময় লেগেছিল।

তীর্থের বর্ণনা কিন্তু অন্য রকম। কালী মন্দিরের উল্লেখ নেই, আছে একটি কুণ্ডের কথা। এক মুসলমান বৃদ্ধা প্রদীপ জ্বেলে অপেক্ষা করে। যাত্রীরা স্নান সেরে বিভূতি মাখে, পরে জ্যোতি দর্শন ও দান পুণ্য করে ফিরে আসে। আদায়ের কথাও স্বামীজী লিখেছেন। সমস্তই নগর ঠাট্টার মোহান্তের লভ্য, ভাগ পায় সেথো আর সেই মুসলমান বৃদ্ধা।

জো রায় কী বুঝলেন জানি নে, মন্তব্য করলেন: অদ্ভুত!

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললুম: অদ্ভুত কী?

জো বললেন: আশ্চর্য আপনার মনে রাখবার ক্ষমতা।

স্বাতি ঠোঁট উল্টে এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে লজ্জা পাবার কথা। কিন্তু আমি সপ্রতিভ ভাবেই উত্তরটা দিলুম। বললুম: মনের ক্ষমতা দেহেরই মতন। কসরৎ করে ক্ষমতা যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি মনের ক্ষমতা বাড়ে অনুশীলনে। মনে রাখব, এই ইচ্ছাই মনে রাখবার উপায়।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: তা ঠিক।

ট্রেন কখন একটা স্টেশন পেরিয়ে এসেছিল, খেয়াল করি নি। এবারে মিঠাপুরে এসে ঢুকল। জো রায়ের এখানে নামবার কথা ছিল। এখানেই তাঁর কাজ। কিন্তু সকাল বেলায় নামেন নি,

আমাদের সঙ্গে বেট দ্বারকায় গেছেন। ফিরছেন আমাদের সঙ্গেই। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে মিঠাপুরের কথা তাঁর বোধ হয় মনে নেই। বললেন: সকলে কি তা পারে গোপালবাবু! আপনিই বলুন!

বলে স্বাতির দিকে তাকালেন।

বাধা দিয়ে আমি বললুম: আপনার মিঠাপুরে যে পৌঁছে গেছি!

অ্যাঁ!

বলে জো রায় চমকে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর চমকানি দেখে দুঃখ হল। কথাটা না বললেই যেন ভাল হত। দরজা খুলে ভদ্রলোক নামবার উদ্যোগ করলেন।

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম যে সকালের সেই ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন। একজন বেয়ারার হাতে অনেক খাতা-পত্র, অনেক ফাইল বয়ে এনেছে আর একটা লোক। গাড়ি থামবার আগেই জো লাফিয়ে নামলেন, ঠিক সেই ভদ্রলোকের সামনেই। তারপর পকেট থেকে কলম বার করে এলোপাতাড়ি সই করতে লাগলেন। বই খাতা বেয়ারার হাতে, ভদ্রলোক পাতা ওল্টাচ্ছেন, আর সই করছেন জো রায়। মাঝে মাঝে বলছেন: বড় নোংরা, বিশ্রী লেখা—

জো রায় যে কৈফিয়ৎ চান না ভদ্রলোক তা জানেন, বললেন: খাবারের ব্যবস্থা রেখেছি। ওরে ও মদনরাম—

খাবারের কী দরকার?

দরকার নেই! জামনগর পৌঁছবেন তো রাত বারোটায়, এর মাঝে কোনও স্টেশনে কিছু পাবেন না।

একই নিঃশ্বাসে বললেন: পাঁচজনের খাবার এনেছি এক সঙ্গে, আপনার আর্দালির আলাদা।

বলে গাড়ির ভিতর তাকালেন।

আমি এ দিকেও কান রেখেছিলুম। মামী মামাকে বলছিলেন চুপি চুপি: বেশ ছেলেটি, তাই না!

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : হুঁ।

মামী থামলেন না, বললেন : এত বড় চাকরি, অথচ অহংকার নেই এতটুকু!

এবারেও মামা বললেন : হুঁ।

মামী পরামর্শ দিলেন : ওর ঠিকানাটা লিখে রাখ, সেই সঙ্গে ওর বাপের নাম ঠিকানাও।

সংক্ষেপে মামা বললেন : হুঁ।

মামী বিরক্ত হয়ে বললেন : হুঁ মানে! বুদ্ধিটা পছন্দ হল না বুঝি?

মামা উত্তর দিলেন না।

উত্তর দিচ্ছ না যে!

তোমার সব বুদ্ধিই পছন্দ হয়, আর এটা হবে না!

মামী কী বুঝলেন তিনিই জানেন, বললেন : বুঝেছি।

স্বাতির দিকে চেয়ে আমার হাসি পেল। দেখলুম যে ডান পায়ের উপরে বাঁ পাটা তুলে সে দোলাতে শুরু করেছে। বসেছে সোজা হয়ে, বেশ গর্বের ভঙ্গিতে। আমি তাকাতেই সে একটা কটাক্ষ দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তার একটা দাম আছে, যা আমি ছাড়া আর সকলেই ভাল বোঝে।

আমি কিছু বললুম না দেখে স্বাতি নিজেই প্রশ্ন করল : কেমন দেখছ?

বললুম : ভাল।

ভাল মানে?

ঠিক বড়লোকের দুর্গা পূজোর মতো। চমৎকার মূর্তি, ঢাক ঢোল, হৈ হৈ রৈ রৈ, গড় হয়ে প্রণাম করছে সবাই। তারপরেই বিসর্জন একেবারে এঁদো ডোবার পচা জলে, বরাত জোর থাকলে নদীতে। আর তারই পাশে গরিবের ঘরে লক্ষ্মীর পাটের কথা ভাব। ঘরের এক কোণে কিংবা উঠোনে গাছের নিচে লক্ষ্মীর একটুখানি উঁচু জায়গা, সিঁদুর লেপা, তার ওপর দুটো ফুল। কিন্তু সমস্ত পরিবার তাকে বুক

দিয়ে আগলে রেখেছে। এক দিন দু দিন নয়, সারা জীবন, বোধ হয় জন্মান্তরেও। সেই তো পূজো, সেই তো প্রেম।

শেষ শব্দটি বলবার সময় যথেষ্ট সাবধান হয়েছিলুম। মামা মামী যাতে শুনতে না পান, সেই চেষ্টায়। তবু মামা প্রশ্ন করলেন: গোপাল কী বলছ?

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। সামলে নিয়ে বললুম: লক্ষ্মী-পূজোর গল্প। একবার গ্রামে এক নতুন বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ হয়েছে। কী সব কারবারে ভদ্রলোক লাল হয়ে গেছেন। তাই লক্ষ্মীপূজো, মহা ধুমধাম। খেতে বসে ভাল ভাল খাবারের গন্ধেই আমার বমি হয়ে গেল। সে কী লজ্জা!

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: বল কি!

বললুম: আমি উঠে পড়লুম যখন বেরিয়ে আসছি এক চাষী আমাকে বলল, গ্রাম থেকে কিছু না খেয়ে যাবেন তা হয় না। আমার বাড়িতে আসুন। সেইখানেই লক্ষ্মীর পাট দেখলুম। একখানা ছোট রেকাবিতে নারকেলের নাড়ু দিল আর এক গেলাস জল। বলল, অন্য দিন বাতাসার ভোগ হয়, আজ নারকেলের নাড়ু।

স্বাতি খুব কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। তা উপেক্ষা করে বললুম: তখনও আমার পেটের ভেতরে মোচড় দিচ্ছিল। সেই নাড়ু আর জল খেয়ে শান্ত হল। মনে হল যে অনেক দিন পরে বুঝি মায়ের হাতের তৈরি নাড়ু খেলুম।

স্বাতি কথা কইল না, কিন্তু মামা বললেন: নাড়ুটা গ্রামের লোকেরাই ভাল করে।

মিঠাপুরে ট্রেন কতক্ষণ দাঁড়ায় টাইম টেবলে তা লেখা নেই। কিন্তু জো রায় অনেকক্ষণ পরে গাড়িতে উঠলেন। ট্রেন তখন চলছে। কোন্ ফাঁকে এক বুড়ি খাবার গাড়িতে উঠেছে তা দেখতে পাই নি। সেই বুড়ির দিকে তাকিয়ে জো বললেন: এরা আমাকে খাতির করে খুব।

মামা কিছু বলছেন না দেখে উত্তরটা মামী দিলেন: তা করবে বৈকি, কত বড় চাকরি!

গদগদ ভাবে জো রায় তাঁর জামার কলারটা একটু উঁচু করলেন স্বাতির দৃষ্টি আরও কঠিন হল।

রাতে খাবার সময় জো বললেন: আপনাদের পাঁউরুটি মাখন আজ থাক। এই ঝুড়িতে অনেক খাবার আছে।

বলে ভদ্রলোক ঝুড়ি খুললেন।

প্রথমেই আচার বেরল। স্বাতির চোখ জোড়া চক চক করে উঠেই নিবে গেল। আর কেউ দেখতে না পেলেও আমি দেখেছিলুম এই পরিবর্তনটা! বললুম: কী হল?

স্বাতি বলল: আজ রাতে আমি খাব না। সকালের খাবার এখনও হজম হয় নি।

ঠিক এই মুহূর্তে স্বাতিকে আমি স্বচ্ছ ভাবে দেখতে পেলুম। শ্রদ্ধায় আমার দু চোখ জলে ভরে গেল, কণ্ঠরোধ হল অদ্ভুত এক বেদনায়।

জো রায় চমকে উঠে বললেন: এই বয়সে ক্ষিধের অভাব!

মামা বললেন: গোপালেরও বোধ হয় ক্ষিধে নেই?

মামা যে সবই বুঝতে পেরেছেন তা আর গোপন রইল না। বললুম: শুধু ফল খাব ভাবছি।

মামী স্বাতির জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন, বললেন: কিছু না খেয়ে সারা রাত থাকবি, সে কেমন কথা হল!

স্বাতি তখন একটা পেঁপে বার করেছে। মামা বললেন: পাঁউরুটিও বার কর।

আফসোস করে মামী বললেন: এমন সুন্দর খাবার থাকতে—

স্বাতি কোন উত্তর দিল না।

২৩

রাজকোটে গাড়ি পৌঁছয় ভোর পৌনে পাঁচটায়। ভোর না বলে রাতই বলা উচিত। তখনও বেশ অন্ধকার থাকে। আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিলুম। রাজকোট থেকে এ গাড়ি ছাড়ে কয়েক ঘণ্টা পরে। আমরা নেমে কীর্তি এক্সপ্রেস ধরব। সে গাড়ি ছটায় এসে সাড়ে ছটায় ছাড়বে। ট্রেনের গার্ড সাহেব বলেছিলেন, তাঁর কাজকর্ম চুকে গেলে আমাদের জাগিয়ে দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দরকার হল না। কুলিরাই হল্লা করে জাগিয়ে দিল। আমরা বাতি জ্বেলে নামবার জন্য তৈরি হয়ে নিলুম।

স্বাতি এগিয়ে গিয়ে পাশের কামরাটা দেখে এল। বললুম : কী দেখলে ?

এ কথার উত্তর স্বাতি দিল না, দিলেন মামা নিজে। বললেন : জামনগরেই যে নেমে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

বেচারা জো রায় !

মামী অসন্তুষ্ট ভাবে বললেন : স্বাতির সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

স্বাতি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। মায়ের অভিযোগের কোন উত্তর দিল না।

মামী তার হাসিটা দেখে ফেললেন। বললেন : হাসতে তোর লজ্জা করে না! ভদ্রলোকের ছেলেকে তুই তাড়িয়ে দিলি !

সেকি, আমি তাড়াব কেন ! তিনি তো নিজেই নেমে গেলেন !

মামী ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন : না নেমে তার উপায় ছিল !

মালপত্র কুলিরা তখন মাথায় তুলে নিয়েছে। মামা বললেন : ওয়েটিং রুমেই চল।

রাতের কথা আমার সবই মনে ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর জো

রায় বলেছিলেন, সোমনাথ তাঁর দেখা হয় নি। মামী বললেন : বেশ তো, চলুন না আমাদের সঙ্গে।

হাত জুটো কচলে জো রায় বললেন : আমাকে আপনি বলবেন না।

উত্তর শুনে মামী খুশী হলেন, বললেন : তা বটে, তুমি তো আমার ছেলেরই মতো।

আমিও মামীকে খুশী করবার জন্য জো রায়কে বললুম : একটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটালে কাজের আর এমন কী ক্ষতি হবে! বাবা সোমনাথই সব পূর্ণ করে দেবেন।

তারপরে স্বাতির দিকে চেয়ে বললুম : আপনি এই গাড়িতেই থাকুন, আমি পাশের গাড়িতে যাব।

মামা গভীর ভাবে পাইপ টানছিলেন। আমার প্রস্তাবে মামী সত্যিই খুশী হলেন।

জো বললেন : আমার জন্যে আপনি কেন কষ্ট করবেন!

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, কষ্টের কী আছে! কিন্তু স্বাতির চোখের দিকে চেয়ে মুখে কথা জোগাল না। বুঝতে পারছিলুম যে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে এবং শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল : সোমনাথ পরে দেখলে আপনার চলবে না?

মামী রুখে উঠে বললেন : এক সঙ্গে যদি দেখতে পারা যায় তো পরে দেখবে কেন!

কাজের চেয়ে কি আর কিছু বড় আছে!

স্বাতির এই উত্তরে কোন উষ্মা প্রকাশ পেল না, বরং আরও নম্র ও মিষ্টি শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

ব্যস্ত ভাবে জো রায় বললেন : সে খুব ঠিক কথা। আমি তো এ দিকেই আছি, আমি অন্য সময়ে সোমনাথ দেখব।

পরের স্টেশনেই জো রায় নেমে পাশের গাড়িতে গিয়েছিলেন। আর মামী অনেকক্ষণ ধরে স্বাতিকে বকেছিলেন। স্বাতি একটি কথারও উত্তর দেয় নি।

ওয়েটিং রুমেই আমরা মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে নিলুম। কীর্তি এক্সপ্রেস এল ছটার পরে। মস্ত লম্বা গাড়ি। খানিকটা ওখা যাবে, খানিকটা পোরবন্দর, বাকিটা ভেরাবল। আমরা পোরবন্দর যাব না. যাব সোমনাথ। তাই ভেরাবলের গাড়িতে উঠলুম। কীর্তি এক্সপ্রেস জেতলসর থেকে পোরবন্দর যাবে। ভেরাবলের এই গাড়িগুলো জেতলসরে সোমনাথ মেলে লাগবে। সোমনাথ মেল আমেদাবাদ থেকে ঢোলকা ধানধুকা বোটাড ও ঢোলা হয়ে ভেরাবলে আসে। পথে এই জেতলসর জংসন।

জেতলসর থেকে পোরবন্দর দূরে নয়, মাত্র আটাত্তর মাইল। কিন্তু আমাদের সেখানে যাওয়া হবে না। মন্দির থাকলে মামী যেতেন, কিন্তু কীর্তি মন্দির দেখতে যাবেন না। আমার তো কৌতূহলের শেষ নেই! রামখেলাওনকে ভেরাবলের গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি উঠলুম পোরবন্দর মার্কা তৃতীয় শ্রেণীতে। নিশ্চয়ই সবাই নূতন যাত্রী নয়। পোরবন্দরের মানুষ পেলে সবই তার কাছে জেনে নেওয়া যাবে।

এক নজরে যাত্রীদের সবাইকে একবার দেখে নিলুম। হিসেবের ভুল হলে চলবে না। ঠিক মানুষটির পাশে গিয়ে বসতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে সময় মতো। সৌজন্যের অভাব ঘটলেও চলবে না। এ কাজ আগে অনেকবার করেছি। খানিকটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে পেলে স্বাতি নিশ্চয়ই কঠিন মন্তব্য করত। বলত, এমন ঘটনা কী করে ঘটে! প্রয়োজন মতো মানুষ কেমন করে তৈরি থাকে!

এক ধারে এক ভদ্রলোককে দেখলুম, গভীর মনোনিবেশ করে একখানা মোটা বই পড়ছেন। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেশবাস অত্যন্ত সাদাসিধে, খদ্দরের ধুতির উপরে খদ্দরের পাঞ্জাবি, পায়ে চামড়ার চটি। পাশে আরও খানকয়েক বই। তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বইগুলো কোলের উপরে তুলে জায়গা করে দিলেন বসবার জন্যে। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বসলুম।

নলাখ্যান, সুদামা চরিত্র, ওখা-হরণ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য, দয়ারামের গরবি ও স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের গীতাবলী।

আধুনিক যুগের আরম্ভ হয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। খানিকটা পাশ্চাত্য প্রভাব, আর খানিকটা সংস্কারবাদ। এই নিয়ে ময়দানে নামলেন গুজরাতী অভিধান নর্মকোষ প্রণেতা কবি নর্মদ ও দলপৎরাম, সঙ্গে ছোট বড় আরও অনেক রথী। নর্মদ ও নবলরামের চেষ্টাতেই গুজরাতী গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। নর্মদ ইতিহাস লিখেছেন, বুদ্ধিবর্ধক সভার প্রতিষ্ঠা করে মধ্য যুগের প্রভাবমুক্ত আধুনিক যুক্তিবাদের প্রচার করেছেন। কবিতায় তিনি নূতন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। নবলরামের নাটকগুলিতে ও নন্দশংকরের উপন্যাস 'করণ খেলোয়' নূতন সমাজ চেতনা ফুটে উঠেছে।

গুজরাতী ভাষার প্রথম সাহিত্য পত্র বুদ্ধিপ্রকাশের সম্পাদক ছিলেন দলপৎরাম। তিনি কবি। নূতন কথা শুনিয়েছেন প্রচলিত রীতিতে। অন্যান্য কবিরা হলেন নরসিংরাও, নানালাল, কন্ত, কলপি, খবরদার ও ঠাকোর।

এই যুগে গদ্যসাহিত্য, উপন্যাস বা নবল কথা লিখে যাঁরা খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁরা হলেন মণিলাল, গোবর্ধনরাম, নরসিং রাও, রমণভাই নীলকণ্ঠ, কেশবলাল ধ্রুব, ঠাকোর ও আনন্দশংকর। গোবর্ধনরাম দ্বিতীয় যুগের অদ্বিতীয় লেখক। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সরস্বতীচন্দ্র প্রকাশিত হয়। এপিকধর্মী চারখণ্ডের উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। গুজরাতের সামাজিক জীবনে বিদেশী সভ্যতা যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল, তারই জীবন্ত রূপায়ণ। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন এই সরস্বতীচন্দ্র।

এই বৎসরেই প্রকাশিত হয় এই যুগের সার্থক কবিতার বই কুসুম-মালা। এর কবি নরসিং রাও দিবেতিয়া শুধু কবি নন, প্রাবন্ধিক সমালোচক ও ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবেও তাঁর সমান খ্যাতি আছে।

হঠাৎ আমার কয়েক ছত্র কবিতার পংক্তি মনে এল। বোধ হয় উমাশঙ্কর যোশীর লেখা গুজরাতী কবিতা। রাজনৈতিক নিবন্ধে পড়েছি না সাহিত্যের সমালোচনায়, তা মনে করতে পারলুম না। কিন্তু রসমাধুর্যের জন্য কয়েকটি লাইন আমার আজও মনে আছে।—

রচো রচো অম্বরচুম্বী মন্দিরো
ভুখা জননো জঠরাগ্নি জাগশে
খণ্ডেরণী বসম্‌কনী নলাধশে—

প্রথম দু লাইনের মানে বুঝতে কষ্ট হয় না। অম্বরচুম্বী মন্দির তুমি রচনা কর। কিন্তু ভুখা জনতার জঠরাগ্নি জাগলে সে সব মন্দির ধুলোয় মিলিয়ে যাবে।

গুজরাতী শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধ হবে না জানি, তবু সাহস করে বললুম এই কয়েকটি লাইন। তারই সঙ্গে যোগ করলুম: আমি তো গুজরাতী জানি নে, আমার অশুদ্ধ উচ্চারণ আপনি ক্ষমা করবেন।

দেখে আমি আশ্চর্য হলুম যে ভদ্রলোকের মুখের ভাব একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। মোটা চশমা আর দৃঢ় ওষ্ঠাধরে যে গাম্ভীর্য এতক্ষণ ধরে রেখেছিলেন, অকস্মাৎ তা অন্তর্হিত হল, প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হল তাঁর সৌম্য মুখখানি। বললেন: উমাশঙ্করের কবিতা তবে আপনার ভাল লাগে!

কার না লাগে বলুন!

তা ঠিক। উমাশঙ্কর আজও জনগণের কবি। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন ঘটে নি।

এর পর গুজরাতী সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেক কথাই বললেন। কিঞ্চিদধিক একশো বছরের ইতিহাস। তার আগের ইতিহাস বললেন অত্যন্ত সংক্ষেপে। গুজরাতী সাহিত্যের জন্ম হয়েছে আটশো বছর আগে। মধ্য যুগের সম্পদ হল নরসিংহ ও মীরার ভজন, অখোর অখে-গীতা ও ছপ্পা, প্রেমানন্দের কাদম্বরী, প্রেমানন্দের

২৪

কীর্তি এক্সপ্রেসের একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল অধ্যাপক যোশীর সঙ্গে। জানালা দিয়ে সকালের মিষ্টি রোদ আসছে, আর শীতল বাতাস। এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি তো আমেদাবাদে থাকেন?

অধ্যাপক যোশী আমার মতলব বুঝতে পেরে হাসলেন, বললেন: নতুন আমেদাবাদে, জাহাঙ্গীর যার নাম দিয়েছিলেন গর্দাবাগ।

তারপরেই বললেন: বুঝতে পারলেন না, না! আমেদাবাদ না দেখলে বোঝা মুশকিল। একদা স্মিথ সাহেব তাঁর ইতিহাসে লিখেছিলেন যে তিনশো বছর আমেদাবাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহরের অন্যতম ছিল। ফার্গুসন হ্যাভেল টড সাহেবরা কত কি লিখেছেন তাঁদের বইএ। সাহেবরা কেন, মিরাতী আমেদী বইএ আছে যে এই শহরের উপকণ্ঠ ছিল তিনশো আশিটি। সেখানেও এত বড় বড় বাজার হাট ঘর বাড়ি পথঘাট ছিল যে প্রত্যেকটি উপকণ্ঠই এক একটি বড় শহর। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশাহ এসে নাক সিঁটকেছিলেন। শহরে এত ধুলোবালি আর তার এমনই শ্রীহীন চেহারা যে রাগ করে তার নাম দিয়েছিলেন গর্দাবাগ, মানে ধুলোর বাগান। আমরা এই গর্দাবাগে আছি।

অধ্যাপকের কথার ধরনে আমি হেসে ফেললুম।

শেষ পর্যন্ত আপনি নিশ্চয়ই সোমনাথ যাবেন, আর ফিরবেন সোমনাথ মেলে?

ঠিক বলেছেন।

আমেদাবাদে তবে একটা দিন কাটাবেন। পারলে বরোদা আর

একটুখানি বিশ্রাম করে অধ্যাপক যোশী বললেন: যত নাম আপনাকে শোনালাম, তার চেয়ে বেশি নাম বাদ গেল। যাঁদের নাম করেছি, তাঁদেরও সব কিছু বলা হয় নি। বলা সম্ভব নয়।

মাথা নেড়ে আমি বললুম: সত্যি কথা।

অধ্যাপক আখোর ধর্মপুস্তক ও নরসিং মেহতার পদাবলীর কথা শোনালেন। তারপর বললেন: আপনার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আপনি মুন্‌শীজীর Gujrat and its Literature এবং জাভেরির Milestone in Gujrati Literature পড়ে দেখবেন। আনন্দ পাবেন।

নিশ্চয়ই পাব। আজকের সাহিত্য পড়ে তো আনন্দ পাই নে, সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে নিশ্চয়ই পাব অধ্যাপকের কথা আমি মেনে নিলুম।

২৪

কীর্তি এক্সপ্রেসের একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল অধ্যাপক যোশীর সঙ্গে। জানালা দিয়ে সকালের মিষ্টি রোদ আসছে, আর শীতল বাতাস। এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি তো আমেদাবাদে থাকেন?

অধ্যাপক যোশী আমার মতলব বুঝতে পেরে হাসলেন, বললেন: নতুন আমেদাবাদে, জাহাঙ্গীর যার নাম দিয়েছিলেন গর্দাবাগ।

তারপরেই বললেন: বুঝতে পারলেন না, না! আমেদাবাদ না দেখলে বোঝা মুশকিল। একদা স্মিথ সাহেব তাঁর ইতিহাসে লিখেছিলেন যে তিনশো বছর আমেদাবাদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহরের অন্যতম ছিল। ফার্গুসন হ্যাভেল টড সাহেবরা কত কি লিখেছেন তাঁদের বইএ। সাহেবরা কেন, মিরাতী আমেদী বইএ আছে যে এই শহরের উপকণ্ঠ ছিল তিনশো আশিটি। সেখানেও এত বড় বড় বাজার হাট ঘর বাড়ি পথঘাট ছিল যে প্রত্যেকটি উপকণ্ঠই এক একটি বড় শহর। কিন্তু জাহাঙ্গীর বাদশাহ এসে নাক সিঁটকে-ছিলেন। শহরে এত ধুলোবালি আর তার এমনই শ্রীহীন চেহারা যে রাগ করে তার নাম দিয়েছিলেন গর্দাবাগ, মানে ধুলোর বাগান। আমরা এই গর্দাবাগে আছি।

অধ্যাপকের কথার ধরনে আমি হেসে ফেললুম।

শেষ পর্যন্ত আপনি নিশ্চয়ই সোমনাথ যাবেন, আর ফিরবেন সোমনাথ মেলে?

ঠিক বলেছেন।

আমেদাবাদে তবে একটা দিন কাটাবেন। পারলে বরোদা আর

একটুখানি বিশ্রাম করে অধ্যাপক যোশী বললেন: যত নাম আপনাকে শোনালাম, তার চেয়ে বেশি নাম বাদ গেল। যাঁদের নাম করেছি, তাঁদেরও সব কিছু বলা হয় নি। বলা সম্ভব নয়।

মাথা নেড়ে আমি বললুম: সত্যি কথা।

অধ্যাপক আখোর ধর্মপুস্তক ও নরসিং মেহতার পদাবলীর কথা শোনালেন। তারপর বললেন: আপনার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আপনি মুন্‌শীজীর Gujrat and its Literature এবং জাভেরির Milestone in Gujrati Literature পড়ে দেখবেন। আনন্দ পাবেন।

নিশ্চয়ই পাব। আজকের সাহিত্য পড়ে তো আনন্দ পাই নে, সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে নিশ্চয়ই পাব অধ্যাপকের কথা আমি মেনে নিলুম।

ভৃগু ক্ষেত্র, ভৃগু কচ্ছ। মহাভারতের সভাপর্বে দেখি যে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ এখানে বাস করেছেন। যে পর্বতের উপর বর্তমান শহর অবস্থিত, একদা লক্ষ্মী সেখানে নিজের জন্য নগর নির্মাণ করেছিলেন। তার নাম শ্রীনগর। তারপর সেই পরিত্যক্ত নগর অরণ্যময় হয়ে যায়। মহাভারতের যুগে হিড়িম্বা এখানে বাস করতেন। ভীমের সঙ্গে এখানেই তাঁর বিবাহ হয়।

মহর্ষি ভৃগু নর্মদা তীরে এই হিড়িম্বা বনেই তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আঠারো হাজার শিষ্য এসেছিল। তাই দেখে তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে এই ভৃগু কচ্ছের পত্তন করেন। সেদিন ছিল নন্দন সম্বৎসরের মাঘের শুক্লা পঞ্চমী। স্কন্দ পুরাণের রেবা খণ্ডে এই গল্প আছে।

রেবা নর্মদারই অন্য নাম। নর্মদার উৎপত্তি হয়েছে মধ্য প্রদেশের অমরকণ্টক তীর্থের নিকটে। শিবের স্বেদ থেকে নর্মদার উৎপত্তি বলে প্রবাদ। তার প্রবাহ কখনও চোখের সামনে, কখনও অন্তরালে। এই লুকোচুরির জন্য নয়নাভিরাম, নাম নর্মদা। রেবা নাম হয়েছে ধ্বনির জন্য। নর্মদার প্রবাহ সদা শব্দময়।

নর্মদা নাকি সর্বত্র পবিত্র। মৎস্যপুরাণে আছে:

পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বাহরণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥

গঙ্গা পবিত্র কনখলে, আর সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে। আর নর্মদা গ্রামে বা অরণ্যে সর্বত্র পবিত্র।

লোকে তাই নর্মদার পরিক্রমা করে। সাগর সঙ্গম থেকে নদীর তীরে তীরে অমরকণ্টকে তার উৎস মুখ পর্যন্ত। তার পরে প্রত্যাবর্তন। এক বৎসর সময় লাগে বলে শুনতে পাই। বলি রাজা যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, ব্রোচের সেই দশাশ্বমেধ ঘাট বোধ হয় পবিত্রতম স্থান।

একদা ব্রোচ একটি বর্ধিষ্ণু বন্দর ছিল। পেরিপ্লাসে তার উল্লেখ

কালিকা মাতার মন্দিরের বাহিরটা দেখে বুঝতে পারবেন না যে ভিতরটা কত সুন্দর।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় স্থানটির নাম বললেন মধেরা। জামনগরের পথে ক্যাপ্টেন শাহও আমাকে এই স্থানটির নাম বলেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে সূর্য পুজা একেবারে উঠে গেছে। কিন্তু এক দিন যে সূর্যের আদর ছিল, তার প্রমাণ আছে কোণারকে, কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে আর মধেরায়। এমন অদ্ভুত শিল্পের নমুনা ভারতে কম আছে। মন্দিরে মূল দেবতা নেই, কিন্তু বরোদার আশেপাশে অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। কোণারকের মতো মধেরাতেও অসংখ্য অশ্লীল মূর্তির ছড়াছড়ি।

এই কথায় আমার মনে একটা প্রশ্ন এল, বললুম: এই সব অশ্লীল মূর্তি কি শুধু সূর্যের মন্দিরেই ছিল?

একটু চিন্তা করে অধ্যাপক যোশী বললেন: আরও অনেক মন্দিরে আছে, কিন্তু সেখানে এত বেশি নয়। মনে হয় যে সূর্যের কাছে কিছুই গোপন থাকে না, তারই ইঙ্গিত এই সব মূর্তিতে। সূর্যদেবতা জীবনকে দেখেন সহজ স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে।

হয়তো তাই, হয়তো অন্য কিছু। তর্ক করে লাভ নেই, তাতে সময়ের অপব্যয় হবে। বললুম: এবারে আপনার আমেদাবাদের গল্প বলুন।

অধ্যাপক বললেন: তার আগে আর একটা শহরের গল্প বলি।

বলুন।

পবিত্র নর্মদা নদী যেখানে সাগরে মিলেছে, সেই মোহনায় একটি প্রাচীন শহর আছে, তার বর্তমান নাম ব্রোচ। সেখানে আপনাকে যেতে বলি না, কিন্তু সেখানকার কথা জেনে রাখা দরকার।

আমি কোন উত্তর না দিয়েও তাঁর গল্প শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

অধ্যাপক বললেন: ব্রোচের অনেক নাম। ভরু কচ্ছ, ভৃগুপুর,

ভৃগু ক্ষেত্র, ভৃগু কচ্ছ। মহাভারতের সভাপর্বে দেখি যে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ এখানে বাস করেছেন। যে পর্বতের উপর বর্তমান শহর অবস্থিত, একদা লক্ষ্মী সেখানে নিজের জন্য নগর নির্মাণ করেছিলেন। তাব নাম শ্রীনগর। তারপর সেই পরিত্যক্ত নগর অরণ্যময় হয়ে যায়। মহাভারতের যুগে হিড়িম্বা এখানে বাস করতেন। ভীমের সঙ্গে এখানেই তাঁব বিবাহ হয়।

মহর্ষি ভৃগু নর্মদা তীরে এই হিড়িম্বা বনেই তাঁর আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আঠারো হাজার শিষ্য এসেছিল। তাই দেখে তিনি বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করে এই ভৃগু কচ্ছের পত্তন করেন। সেদিন ছিল নন্দন সম্বৎসরের মাঘের শুক্লা পঞ্চমী। স্কন্দ পুরাণের রেবা খণ্ডে এই গল্প আছে।

বেবা নর্মদারই অন্য নাম। নর্মদার উৎপত্তি হয়েছে মধ্য প্রদেশের অমরকণ্টক তীর্থের নিকটে। শিবের স্বেদ থেকে নর্মদার উৎপত্তি বলে প্রবাদ। তার প্রবাহ কখনও চোখের সামনে, কখনও অন্তরালে। এই লুকোচুরির জন্য নয়নাভিরাম, নাম নর্মদা। রেবা নাম হয়েছে ধ্বনির জন্য। নর্মদার প্রবাহ সদা শব্দময়।

নর্মদা নাকি সর্বত্র পবিত্র। মৎস্যপুরাণে আছে :

পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বাহরণ্যে পুণ্যা সর্বত্র নর্মদা॥

গঙ্গা পবিত্র কনখলে, আর সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে। আর নর্মদা গ্রামে বা অরণ্যে সর্বত্র পবিত্র।

লোকে তাই নর্মদার পরিক্রমা করে। সাগর সঙ্গম থেকে নদীর তীরে তীরে অমরকণ্টকে তার উৎস মুখ পর্যন্ত। তার পরে প্রত্যাবর্তন। এক বৎসর সময় লাগে বলে শুনতে পাই। বলি রাজা যেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, ব্রোচের সেই দশাশ্বমেধ ঘাট বোধ হয় পবিত্রতম স্থান।

একদা ব্রোচ একটি বর্ধিষ্ণু বন্দর ছিল। পেরিপ্লাসে তার উল্লেখ

কালিকা মাতার মন্দিরের বাহিরটা দেখে বুঝতে পারবেন না যে ভিতরটা কত সুন্দর।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় স্থানটির নাম বললেন মধেরা। জামনগরের পথে ক্যাপ্টেন শাহও আমাকে এই স্থানটির নাম বলেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে সূর্য পুজা একেবারে উঠে গেছে। কিন্তু এক দিন যে সূর্যের আদর ছিল, তার প্রমাণ আছে কোণারকে, কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে আর মধেরায়। এমন অদ্ভুত শিল্পের নমুনা ভারতে কম আছে। মন্দিরে মূল দেবতা নেই, কিন্তু বরোদার আশেপাশে অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। কোণারকের মতো মধেরাতেও অসংখ্য অশ্লীল মূর্তির ছড়াছড়ি।

এই কথায় আমার মনে একটা প্রশ্ন এল, বললুম: এই সব অশ্লীল মূর্তি কি শুধু সূর্যের মন্দিরেই ছিল?

একটু চিন্তা করে অধ্যাপক যোশী বললেন: আরও অনেক মন্দিরে আছে, কিন্তু সেখানে এত বেশি নয়। মনে হয় যে সূর্যের কাছে কিছুই গোপন থাকে না, তারই ইঙ্গিত এই সব মূর্তিতে। সূর্যদেবতা জীবনকে দেখেন সহজ স্বচ্ছ উদার দৃষ্টিতে।

হয়তো তাই, হয়তো অন্য কিছু। তর্ক করে লাভ নেই, তাতে সময়ের অপব্যয় হবে। বললুম: এবারে আপনার আমেদাবাদের গল্প বলুন।

অধ্যাপক বললেন: তার আগে আর একটা শহরের গল্প বলি।

বলুন।

পবিত্র নর্মদা নদী যেখানে সাগরে মিলেছে, সেই মোহনায় একটি প্রাচীন শহর আছে, তার বর্তমান নাম ব্রোচ। সেখানে আপনাকে যেতে বলি না, কিন্তু সেখানকার কথা জেনে রাখা দরকার।

আমি কোন উত্তর না দিয়েও তাঁর গল্প শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

অধ্যাপক বললেন: ব্রোচের অনেক নাম। ভরুকচ্ছ, ভৃগুপুর,

অধ্যাপক যোশী কিন্তু গান্ধীজীর কথা বললেন না, বললেন সস্তা সাহিত্যবর্ধক কার্যালয়ের কথা ও ভিক্ষু অখণ্ডানন্দের কথা। অদ্ভুত মানুষ! হিমালয়ে তপস্যা শেষ করে তিনি বম্বেতে ফেরেন। এক দিন একখানি ভজনাবলী কিনতে গিয়ে দেখেন যে সেই ছোট বইটির অত্যধিক দাম। আমেদাবাদে এসে সস্তা সাহিত্যবর্ধক কার্যালয় খুললেন। ধার করে প্রথম বই বার করলেন ভাগবতের একাদশ স্কন্দের অনুবাদ। ছ আনা দাম। চার হাজার কপি এক সপ্তাহে বিক্রি হয়ে গেল। তারপর থেকে অজস্র বই বের হচ্ছে। ধর্মগ্রন্থ, সৎ সাহিত্যের অনুবাদ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্যন্ত। অখণ্ডানন্দ আজ নেই, কিন্তু তাঁর কার্যালয় আছে। বহু লক্ষ টাকা মূলধন। পরিচালনা করেন এক বোর্ড অফ ট্রাস্টি।

সত্যিই অদ্ভুত মানুষ!

হঠাৎ চমকে উঠলুম একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে। রুক্ষ কর্কশ শব্দ। একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। জানালা দিয়ে হালদারকে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের উপর। প্রথমে আমার নাম ধরে ডেকেছিলেন। এবারে বললেন: এত ভয় পান আমাকে!

না না, ভয় পেলুম কোথায়!

পেলেনই তো! সে যাক, গল্প করতে গেলে গাড়ি ছেড়ে যাবে।

একই নিঃশ্বাসে বললেন, আপনারা তো সোমনাথ যাবেন বলেছিলেন, তবে এ গাড়িতে উঠেছেন কেন?

একটু গল্প করতে।

গল্প করতে! আর এ দিকে—

কথাটা শেষ না করেই বললেন: শীগগির নেমে পড়ুন। এ গাড়ি আপনার সোমনাথ যাবে না।

জানি। জেতলসরেই নেমে পড়ব।

আর কিছু বলবার অবকাশ হালদার পেলেন না। গার্ডের বাঁশি শুনে লাফিয়ে সরে গেলেন।

প্রাচীরেও ফাটল ধরে। আহমদ শাহ তাঁর স্মৃতিতে এই মন্দির তৈরি করে বাজারের নাম রাখলেন মানিক চক। আজও সেই নাম অপরিবর্তিত আছে। তিন দরওয়াজা, আহমদ শাহের কবর, রাণী সিপ্রির কবর ও মসজিদ এবং অন্যান্য অসংখ্য মসজিদে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এই গুজরাতী স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান শৈলীর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তার কারণ বোধ হয় অন্য কিছু নয়— হিন্দু স্থপতিরা কাজ করেছে মুসলমান রাজার মনোরঞ্জনে, তাইতেই এই সমন্বয়।

অধ্যাপক যোশী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন: চড়ুইভাতির একটা ভাল জায়গা আছে। কাঁকারিয়া তালাও আর তার লাগোয়া বাগান। জলাশয়ের নাম কেন কাঁকারিয়া তালাও হল, তার একটা গল্প আছে। এই তালাও আর বাগান সুলতান কুতব উদ্দীনের তৈরি। জলাশয় যখন খোঁড়া হচ্ছে, তখন বাদশাহ আহমদ শাহের গুরু শাহ আলম শাহ তা দেখতে এলেন। তাঁর পায়ে কাঁকর ফুটল। কাজেই কাঁকারিয়া তালাও নাম না হয়ে আর পারে না।

ভদ্রলোকের কথার ধরনে আমি হাসলুম।

অধ্যাপক বললেন: দিল্লী গেটের বাহিরে আছে হাতী সিংএর মন্দির। জৈন মন্দির। শাদা পাথরে তৈরি তার তিপ্পান্নটা সূক্ষ্ম শিখরওয়ালা গম্বুজ। ভিতরে চব্বিশজন তীর্থঙ্করেরই মূর্তি আছে।

একটু চিন্তিত ভাবেই বললেন: গুজরাতে জৈন প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এই ধর্ম এখানে যত বিস্তার লাভ করেছে, এত আর কোথাও করে নি। আবু ও গির্ণার পাহাড়ে, পলিতানার শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ জৈন মন্দির। গির্ণার ও পলিতানায় তো মন্দিরের এক একটা শহর। এই সব নির্মাণে কত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসেব আজ হবে না।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর কথা আমার মনে এল। তাঁর অহিংস নীতি কি তিনি দেশের জৈনদের কাছে পেয়েছিলেন।

অধ্যাপক যোশী কিন্তু গান্ধীজীর কথা বললেন না, বললেন সস্তা সাহিত্যবর্ধক কার্যালয়ের কথা ও ভিক্ষু অখণ্ডানন্দের কথা। অদ্ভুত মানুষ! হিমালয়ে তপস্যা শেষ করে তিনি বম্বেতে ফেরেন। এক দিন একখানি ভজনাবলী কিনতে গিয়ে দেখেন যে সেই ছোট বইটির অত্যধিক দাম। আমেদাবাদে এসে সস্তা সাহিত্যবর্ধক কার্যালয় খুললেন। ধার করে প্রথম বই বার করলেন ভাগবতের একাদশ স্কন্দের অনুবাদ। ছ আনা দাম। চার হাজার কপি এক সপ্তাহে বিক্রি হয়ে গেল। তারপর থেকে অজস্র বই বের হচ্ছে। ধর্মগ্রন্থ, সৎ সাহিত্যের অনুবাদ, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্যন্ত। অখণ্ডানন্দ আজ নেই, কিন্তু তাঁর কার্যালয় আছে। বহু লক্ষ টাকা মূলধন। পরিচালনা করেন এক বোর্ড অফ ট্রাস্টি।

সত্যিই অদ্ভুত মানুষ!

হঠাৎ চমকে উঠলুম একটা পরিচিত কণ্ঠস্বরে। রুক্ষ কর্কশ শব্দ। একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। জানালা দিয়ে হালদারকে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের উপর। প্রথমে আমার নাম ধরে ডেকেছিলেন। এবারে বললেন: এত ভয় পান আমাকে!

না না, ভয় পেলুম কোথায়।

পেলেনই তো! সে যাক, গল্প করতে গেলে গাড়ি ছেড়ে যাবে।

একই নিঃশ্বাসে বললেন, আপনারা তো সোমনাথ যাবেন বলেছিলেন, তবে এ গাড়িতে উঠেছেন কেন?

একটু গল্প করতে।

গল্প করতে! আর এ দিকে—

কথাটা শেষ না করেই বললেন: শীগগির নেমে পড়ুন। এ গাড়ি আপনার সোমনাথ যাবে না।

জানি। জেতলসরেই নেমে পড়ব।

আর কিছু বলবার অবকাশ হালদার পেলেন না। গার্ডের বাঁশি শুনে লাফিয়ে সরে গেলেন।

প্রাচীরেও ফাটল ধরে। আহমদ শাহ তাঁর স্মৃতিতে এই মন্দির তৈরি করে বাজারের নাম রাখলেন মানিক চক। আজও সেই নাম অপরিবর্তিত আছে। তিন দরওয়াজা, আহমদ শাহের কবর, রাণী সিপ্রির কবর ও মসজিদ এবং অন্যান্য অসংখ্য মসজিদে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এই গুজরাতী স্থাপত্যে হিন্দু ও মুসলমান শৈলীর সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। তার কারণ বোধ হয় অন্য কিছু নয়—হিন্দু স্থপতিরা কাজ করেছে মুসলমান রাজার মনোরঞ্জনে, তাইতেই এই সমন্বয়।

অধ্যাপক যোশী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন: চড়ুইভাতির একটা ভাল জায়গা আছে। কাঁকারিয়া তালাও আর তার লাগোয়া বাগান। জলাশয়ের নাম কেন কাঁকারিয়া তালাও হল, তার একটা গল্প আছে। এই তালাও আর বাগান সুলতান কুতব উদ্দীনের তৈরি। জলাশয় যখন খোঁড়া হচ্ছে, তখন বাদশাহ আহমদ শাহের গুরু শাহ আলম শাহ তা দেখতে এলেন। তাঁর পায়ে কাঁকর ফুটল। কাজেই কাঁকারিয়া তালাও নাম না হয়ে আর পারে না।

ভদ্রলোকের কথার ধরনে আমি হাসলুম।

অধ্যাপক বললেন: দিল্লী গেটের বাহিরে আছে হাতী সিংএর মন্দির। জৈন মন্দির। শাদা পাথরে তৈরি তার তিপ্পান্নটা সূক্ষ্ম শিখরওয়ালা গম্বুজ। ভিতরে চব্বিশজন তীর্থঙ্করেরই মূর্তি আছে।

একটু চিন্তিত ভাবেই বললেন: গুজরাতে জৈন প্রভাব খুবই স্পষ্ট। এই ধর্ম এখানে যত বিস্তার লাভ করেছে, এত আর কোথাও করে নি। আবু ও গির্ণার পাহাড়ে, পলিতানার শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ জৈন মন্দির। গির্ণার ও পলিতানায় তো মন্দিরের এক একটা শহর। এই সব নির্মাণে কত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তার হিসেব আজ হবে না।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর কথা আমার মনে এল। তাঁর অহিংস নীতি কি তিনি দেশের জৈনদের কাছে পেয়েছিলেন!

আজও আছে। অভাব শুধু প্রাণের। আশ্রমের কথা আজ নাই বললাম।

ভদ্রলোক চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন: পোরবন্দর নাম সবার জানার কথা নয়। এমন ছোট রাজ্য সৌরাষ্ট্রে অসংখ্য আছে। বরং এর প্রাচীন নাম সুদামাপুরী এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল। শুধু সুদামার মন্দির নয়, আরও অনেক মন্দির আছে—শ্রীনাথ গোপীনাথ সোমনাথ কেদারনাথ দ্বারকানাথ ও মদনমোহন। সমুদ্রে ঘাট আছে অশ্ববতী। রাজার রাজধানী তো। কাজেই রাজবাড়ি আছে, নূতন ও পুরাতন কোর্ট, হাইকোর্ট, একটি লাইট হাউসও আছে। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে স্বামী বিবেকানন্দ পোরবন্দরে বেদাধ্যয়ন করেছিলেন ন মাস।

আশ্চর্য মানুষ বিবেকানন্দ! দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে শুনেছি যে সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়ে বসে তিনি তপস্যা করেছেন। আর এই পশ্চিম উপকূলে শুনছি তাঁর বেদাধ্যয়নের কথা।

অধ্যাপক বললেন: আজ পোরবন্দরের খ্যাতি কোন মন্দিরের জন্য নয়, বাণিজ্যের জন্যও নয়। পোরবন্দর আজ তীর্থ হয়েছে অন্য কারণে। দ্বারকা থেকে সোমনাথে যাবার রাজপথ পোরবন্দরের উপর দিয়ে যাচ্ছে। শহরে মেয়েদের শিক্ষার জন্য আর্যকন্যা গুরুকুল স্থাপিত হয়েছে, আর কীর্তি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন নানজী কালিদাস। পোরবন্দর মহাত্মাজীর জন্মস্থান।

মহাত্মাজীর গল্প আজ অবান্তর। তবু তাঁর কথা মনে পড়ে। দোসরা অক্টোবর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এক গুজরাতী বৈশ্য পরিবারে মহাত্মাজীর জন্ম। তাঁর বাপ পিতামহ ছিলেন পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান। তের বছর বয়সে বিবাহ করেন কস্তুর বাঈকে, বিশ বছরে বিলেতে গেলেন, ব্যারিস্টার হতে। তিনি বছর পরে ফিরে এসে দেশে ছিলেন এক বছর। তারপর দক্ষিণ :আফ্রিকায় কাটল পুরো বিশ বছর। সে কী নিগ্রহ। দেশবাসীর জন্য সত্যাগ্রহ

করলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত দেশে কাটালেন। যাদের জন্য সব দিলেন, জীবনটাও দিলেন তাদের জন্যই। জগতে এ গল্প আজ সবাই জানে।

আমার অন্য গল্প মনে পড়ল। শিশু গান্ধী। তাঁর সিগারেট খেতে আর মাংস চাখতে সখ হল। পয়সার জন্য ভাইএর সোনা চুরি করলেন। তারপর সেই অন্যায়ের জন্য মর্মবেদনা। মুখে সে কথা বলতে পারলেন না, বাপকে জানালেন কাগজে লিখে। বাপও তেমনি। ছেলেকে বকলেন না, মারলেনও না। শুধু চোখের জল ফেললেন। গান্ধীর নবজন্ম হল।

এই তো সত্যাগ্রহ! অন্যায় করব না, অন্যায়কে মানবও না। সত্যাগ্রহ তো কাপুরুষের ধর্ম নয়, বীরের ধর্ম সত্যাগ্রহ। কামানের পিছনে দাঁড়িয়ে যে গোলা ছোঁড়ে, তার সাহসের কী দরকার! হাসতে হাসতে যে কামানের গোলার সামনে এগিয়ে যায় সেই তো সাহসী।

প্রথম দিন ওকালতি করতে উঠে তিনি কথা বলতে পারেন নি। ভয়ে আদালত ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলির মতো। জীবনে সেই এক দিন পালিয়েছিলেন। তারপর আর তাঁকে পিছিয়ে আসতে কেউ দেখে নি।

গান্ধীজীকে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সবার সে কথা জানা। এ সব কথা আলোচনা করার আর কোন প্রয়োজন দেখি না। নেতাজীর মতো দেশও তাঁকে জাতির জনক বলে মেনে নিয়েছে।

২৫

গল্পে গল্পে জেতলসরে যে পৌঁছে গিয়েছিলুম তা বুঝতে পারি নি। খেয়াল হল হালদারের হুঙ্কারে। বাহিরে দাঁড়িয়ে গর্জন করলেন: নামবেন, না ওখানেই বসে থাকবেন!

অধ্যাপক যোশীর কাছে আমি নিঃশব্দে বিদায় নিলুম। বলার তো কিছু নেই। অধ্যাপক নিজেও কোন কথা কইলেন না। আমি জানি যে পোরবন্দর পর্যন্ত আর তিনি কথা কইবেন না। আজ তিনি প্রয়োজনেব চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছেন।

বাহিরে নেমে আমি তাঁর পুরু লেন্সের চশমা দেখতে পেলুম। আবার তিনি তাঁর বইএর ভিতর ডুবে গেছেন।

হালদার আমার হাত চেপে ধরে বললেন: চলুন এবারে।

কোথায়?

কোথায় আবার! দর্শনটা একবার করিয়ে দিই। খুঁজে খুঁজে শ্রীমতী যে হয়রান হয়ে গেছেন!

.বলে মামার গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন।

আমি কোন কথা বলবার সুযোগ পেলুম না। হালদার নিজেই বলতে লাগলেন: লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির যে কোন যোগ নেই, এবারে তার প্রমাণ পেয়ে গেলুম। তা না হলে ঐ মুখ্যু মেড়ো চাকরটা উঠল ঠিক জায়গায়, আর বি. এ., এম. এ. পাশ কলকাতার বাবু উঠল উল্‌টো গাড়িতে!

এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। অভিযোগটা তাই হাসি মুখেই মেনে নিয়ে বললুম: সত্যিই, আপনি না দেখলে আজ বড় বিপদেই পড়তুম।

ভদ্রলোক কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন : বুঝতে পেরেছেন দেখছি।

মামা আমাকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। বললেন : কোথায় উঠেছিলে তুমি ?

উত্তরটা আমাকে দিতে হল না। হালদার হেঁকে বললেন : আপনার মেড়ো চাকরটাকে এঁর ওপর একটু নজর রাখতে বলবেন।

স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

প্রসন্ন মুখে মামা বললেন : উঠে এস।

এ কথারও উত্তর দিলেন হালদার, বললেন : তার আর দরকার হবে না। এটুকু পথ আমিই নিয়ে যেতে পারব।

ইতিমধ্যে হালদারের সঙ্গে মামার যে সাক্ষাৎ হয়েছে তা বুঝতে পারি। প্রথম দেখায় যে সমস্ত প্রশ্ন মানুষ করে, মামা তার কিছুই করলেন না। আমার দিকে চেয়ে বললেন : তুমি জুনাগড়ে নামবার কথা বলেছিলে না ?

ভেবেছিলুম ঠিকই, কিন্তু বলেছিলুম কিনা মনে নেই।

মামা বললেন : কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো। দেখেই যাওয়া যাক। তোমার মামীর আর আপত্তি নেই।

এই ব্যবস্থার কথায় আমি খুশী হয়েছিলুম। কিন্তু হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিরক্তি দেখতে পেলুম। মুখে সে কথা প্রকাশ করলেন না, বললেন : ঠিক আছে, জুনাগড়েই এঁকে নামিয়ে দেব।

বলে সদর্পে আমায় টেনে নিয়ে গেলেন।

স্বাতির হাসির শব্দ পেলুম পিছন থেকে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমাকে হালদারের পাশে বসতে হল। জুনাগড় এখান থেকে পঞ্চাশ মিনিটের পথ। এই সময়টা আমাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। আমেদাবাদ থেকে সোমনাথ মেল তখন

এসে গেছে। আমাদের গাড়ি কীর্তি এক্সপ্রেস থেকে সোমনাথ মেলে জোড়া হল। হালদার স্বচক্ষে সব দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। বললেন: এবারে একটা বিড়ি ধরানো যাক।

ধীরে সুস্থে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বললেন: এ সব বালাই তো নেই!

আমাকে বিড়ি দেবার জন্যে যে বলছেন না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। বোধ হয় দেশলাই-এর দরকার। কাছের এক ভদ্রলোককে বললেন: ও মশাই, শুনছেন!

সে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বাঙলা বোঝেন না, তবু মুখ ফেরালেন।

দেশলাইটা দেখি। ম্যাচ বাক্স।

বলে বাম হাতটা স্থির রেখে ডান হাতে দেশলাই জ্বালাবার ভঙ্গি করলেন।

দেশলাইটা ভদ্রলোক এগিয়ে দিলেন।

দাঁত দিয়ে বিড়ির কোণা কেটে সযত্নে হালদার সেটি ধরালেন। দেশলাইটিও ছুঁড়ে দিলেন মালিকের দিকে, কিন্তু ধন্যবাদ দিলেন না। তাড়াতাড়ি দু-তিনটে টান দিয়ে বললেন: অনেকগুলো পরীক্ষা পাশ দিয়ে মানুষ যে মুখ্যু হয়, আপনাকে দেখে তার প্রমাণ পেলুম।

কথাটা আপত্তিকর হলেও প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি হল না। হালদার নিজেই বললেন: অমন শাঁসালো মামা, এমন সুযোগ, তার সদ্ব্যবহার করতে পারছেন না! ঐ একটি মাত্র মেয়ের জন্যে—কী বলব—

অসহ্য অবজ্ঞায় হালদার নাক সিঁটকে বললেন: বুড়ি ঐ বাঁদরটাকে পছন্দ করলেন, আর ভাগনে হয়ে এত দিনেও মামীর মন ভোলাতে পারলেন না! ছিঃ!

হালদারে মন্তব্য শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। লোকটা এত খবর পেল কোথায়! তবু কিছু না বোঝার ভান করে বললুম: আপনি কার কথা বলছেন?

এই যে মুখ ফুটেছে দেখছি। অত ঘেন্না কিসের মশাই!

তাঁর কাছে আরও কিছু খবর পাবার আশায় সহাস্যে বললুম: আজ আপনার একটু রাগত ভাব দেখছি!

ভদ্রলোক বোধ হয় এইটুকুতেই খুশী হলেন। বিড়িটা শেষ করে বললেন: আমাদের আবার রাগ অভিমান!

ছি ছি, এ কী কথা!

আমি তাঁকে আরও একটু প্রসন্ন করবার চেষ্টা করলুম। ভদ্রলোকের পেটে যে অনেক খবর আছে তা বুঝতে পেরেছি।

হালদার হাসলেন তাঁর নোংরা দাঁত বার করে। তারপর বললেন: কাল ঐ বাঁদরটাকে দেখলুম আপনার মামার গাড়িতে। কোথায় জোটালেন তাকে?

গাড়িতেই আলাপ হয়েছে। কিন্তু জো রায়কে আপনি চিনলেন কী করে?

কী নাম বললেন! জো রায়! জনার্দন বলতে বুঝি তার মান যায়!

একটা ভেংচি কেটে বললেন: হনুমান বললেও তাকে সম্মান করা হয়, জানেন!

ভদ্রলোকের ভাব দেখলে যে কোন মানুষ হাসবে। কিন্তু আমি হাসলুম না। গম্ভীর ভাবে বললুম: এত রাগ কেন ঐ ভদ্রলোকের ওপর?

ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক! আমি কোন্ ছার! ওর বাপ ওকে কুলাঙ্গার বলে। তবে কিনা—

হালদার হেঁ হেঁ করে হাসলেন রসিয়ে রসিয়ে। তারপর বললেন: আমি আমার কাজ গুছিয়ে নিয়েছি।

বলে পাঞ্জাবির তলা দিয়ে ফতুয়ার পকেটে হাত পুরলেন। লক্ষ্য করে দেখলুম, সে পকেট বাহিরে নয়, একেবারে ভিতরের দিকে। একটি কাগজের মোড়ক বার করে সযত্নে খুললেন। আমার

চোখের উপর মেলে ধরলেন একশো টাকার একখানা ঝকঝকে নোট। তারপরেই আবার কাগজে মুড়ে পকেটে পুরে রাখলেন। বললেন: কী দেখলেন?

একখানা নোট।

নোট নয়, বলুন একশো টাকার নোট। এমনি আরও চারখানি নোটের ব্যবস্থা করেছি।

বলেন কি!

বুদ্ধি! বুঝলেন মশাই, বুদ্ধি! এ বি সি পড়ি নি তো, তাই এখনও করে খাচ্ছি।

আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম। তাই দেখে বললেন: কাল রাতে যখন গাড়ি থেকে ছোঁড়া নামল, কঁ্যাক করে তার গলা টিপে ধরলুম। কালীকেষ্ট হালদারকে ফাঁকি দেবে, এমন ছেলে এখনও মায়ের পেটে আছে।

তা তো বটেই।

হালদার বোধ হয় আত্মপ্রসাদ পেলেন। বললেন: বললুম, ওখানে গিয়ে ভিড়েছ তো! দাঁড়াও, সব ফাঁস করে দিচ্ছি। তবে একটা জিনিস তার দেখলুম, বিপদটা সে টক করে বুঝে নিল, আমাকে বোঝাতে হল না। হাতে পায়ে ধরে বলল, বুড়ো-বুড়িকে রাজী করেছি, আপনি আর বাদ সাধবেন না। বুদ্ধি দেখুন!

বলে আমার দিকে তাকালেন। আমি আশ্চর্য হবার ভান করে বললুম: বলেন কি!

হালদার বললেন: অঘোর গোঁসাইকে সে এখনও চেনে নি। বুড়ি ভুলতে পারে, কিন্তু বুড়ো কম সেয়ানা নয়। যে লোক কালী-কেষ্টকে চিনেছে হাড়ে হাড়ে, সে ঐ বাঁদরকে কি আর চিনবে না! তবু বললুম, কিছু ছাড়ো বাবাজী।

বললেন নাকি!

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন: পঞ্চাশ টাকায় পার পেতে

চেয়েছিল, পাঁচশো টাকায় রফা হল। একশো দিয়েছে, বাকিটা কলকাতার ঠিকানায় পাঠাবে। ফাঁকির পরিণামটাও তাকে জানিয়ে দিয়েছি।

খুশী হবার ভান করে বললুম: এবারে তাহলে ঘটকালি করবেন বুঝি।

হালদার ঠোঁট উল্টে বললেন: আমাব কোন ধর্ম নেই। ঐ বাঁদরের সঙ্গে আমি ঘটকালি করতে যাব। ভাংচি যে দেব না, এই ওর বাপের ভাগ্যি।

আমি আপসোস জানিয়ে বললুম: একটা কথা আপনি আমায় বললেন না হালদার মশাই। জো রায়ের ওপর আপনার এত রাগ কেন?

আবার জো রায়। জনার্দন বলুন।

তারপরই কতুয়ার পকেটে একবার হাত বুলিয়ে বললেন: আমায় কি আপনি ছেলেমানুষ পেয়েছেন।

এ কথা কেন ভাবছেন?

বিরক্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: সবই যদি বলে দেব তো রফা হল কিসের জন্যে।

এক মুহূর্ত কী ভাবলেন, তারপর বললেন: তা আপনাকে বললে কোনও দোষ নেই।

তারপরেই মত বদলালেন: নাঃ, বিশ্বাস নেই কাউকে। সংবাদটা আপনি নিজের কাজে লাগাতে পারেন। নিজেও তো মজে আছেন।

বড় অভদ্র ইঙ্গিত। কিন্তু সহ্য না করে উপায় নেই। এও এক ধরনের মানুষ, যাদের সচরাচর দেখতে না পেলেও সমাজে অসদ্ভাব নেই।

হালদার বললেন: দেখুন, বয়সে আমি আপনার অনেক বড়। তাই একটা উপদেশ আজ দিই।

হালদার আরও খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন:

গোঁসাইজীর সঙ্গে আপনার সামাজিক ব্যবধানটা খুব বেশি। সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হল মনের দিকটা। সেখানে তো আপনাদের কোন ব্যবধান নেই।

আমি ভাল করে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালুম। মনে হল না যে কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার আমার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি নীরবে তাঁর পরবর্তী কথার অপেক্ষা করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: দেশে আজ এইজন্যেই হ্যাংলামি, উঞ্ছবৃত্তি। তা না হলে যাকে ঘেন্না করি, তার পকেটে হাত দেবার আমার কী দরকার ছিল! পেটের জন্যেই তো! ধর্মস্থানে ব্রাহ্মণকে কেউ আর প্রণামী দেয় না, হাত পাতলেও তাকায় না সে দিকে। তাই সেখানে ছেঁড়াছেঁড়ি আর কাড়াকাড়ি। তাতেও সবার ঘেন্না ধরে গেছে। তার চেয়ে এ ঢের ভাল।

বলে নিজের ফতুয়ার পকেটটা আর একবার অনুভব করে বললেন: ভাবছেন, ধর্ম করতে বেরিয়ে কেন অধর্ম করি! অধর্ম কিসের! জনার্দনের কথা যদি আজ আপনাকে বলতুম, তাহলেই অধর্ম হত। আপনাদের কথাও তো কাউকে বলি নি!

ভয়ে আমি খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে বললুম: আমাদের আবার কী কথা?

আমার ভয় দেখে হালদার হেসে বললেন: রামেশ্বরের মন্দিরে আপনাদের রাত কাটাবার কথা! ঐ মেয়েটার সঙ্গে আপনার নাম জড়িয়ে বেশ মুখরোচক কাহিনী বলে বেড়াতে পারতুম। কিন্তু তা তো বলি নি। মিথ্যা বলেই বলি নি। শুধু ভয় দেখিয়ে নিজের কাজ গুছিয়েছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কারও সম্বন্ধেই বলি না। অভাব না থাকলে ভয়ও দেখাতুম না। কালীকেষ্ট হালদারের নাম তাহলে কালীকৃষ্ণবাবু হত। এই হচ্ছে আজকের সমাজ, আজকের সভ্যতা। একটা মুখোস মাত্র। পয়সার মুখোস। পয়সা থাকলে

জানোয়ার আজ মানুষ সাজতে পারে। কিন্তু দুঃখ কিসের জানেন! পয়সার অভাবে মানুষ নিজের পরিচয়ও হারায়। সত্যিকার মানুষটাকে লোকে চিনতে পারে না।

হালদার থামলেন না, বললেন: গোপালবাবু, নিজের পরিচয়টা যদি দিতে পারতেন, তাহলে বুড়োবুড়ি আজ পাত্র খুঁজে বেড়াত না। শুধু ঐ মেয়েটা আপনাকে চিনেছে।

পঞ্চাশটা মিনিট কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, টের পাই নি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ হালদারের হুমকি শুনে চমক ভাঙল: নামবেন না নাকি!

এই তো আমার সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর! এতক্ষণ কি তবে আমি স্বপ্ন দেখেছি!

২৬

সোরঠ দেশ সুহাবনো, সুন্দর গড় গিরনার।
বীর সের পর্বত গুফা যোগী তপেঁ নিহার॥

এই শ্লোকের মানেটা কঠিন নয়। সৌরাষ্ট্র দেশটা মনোরম, সুন্দর গড় গির্ণার। এখানে দেখ বীর বাঘ পাহাড় গুহা আর তপস্যারত যোগী। কী জন্য ও কার পরামর্শে এই জুনাগড় দেখবার ব্যবস্থা হল তা বুঝতে পারলুম না। বেলা এগারোটার পরেই আমরা জুনাগড়ে নেমেছিলুম। মামা মামী স্নান করে খাবেন, আমরাও। বিকেলে সোমনাথের গাড়ি। এইটুকু সময়ের মধ্যে যতটুকু দেখা যায়, ততকুটুই লাভ। স্টেশনে নেমে দ্রষ্টব্যের খবর নিতে গিয়ে এই শ্লোকটি শুনলুম একজন স্থানীয় লোকের মুখে।

জুনাগড় স্টেশনটি বড় নয়, নিতান্ত ছোটও নয়। প্রথম শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রামের ঘর। রিফ্রেশমেণ্ট রুমও আছে। কাজেই মামার পছন্দ হল। বললেন: অসুবিধে এইটুকু হল যে ভেরাবল পৌঁছব রাতে। তখন একটা থাকবার ব্যবস্থা করা কঠিন হতে পারে।

জুনাগড় থেকে ট্রেন ছাড়বে বিকেল ছটার পরে, ভেরাবলে পৌঁছবে রাত সাড়ে নটায়। বললুম: খুব বেশি রাত তো নয়। শুনেছি একটা ডাক বাংলো আছে স্টেশনের ঠিক বাইরেই। কিছু না হলে ওয়েটিং রুম তো আছে! একটা রাত কোনমতে কেটে যাবে।

স্বাতি বলল: ধর্মশালা নেই বুঝি?

ঠোঁটে কৌতুকের রেখা দেখেই বুঝলুম যে এটা তার পরিহাস। বললুম: যাত্রীরা ধর্মশালাতেই থাকে, স্থানের অভাব সেখানে হয় না।

মামা যখন স্নান করতে ঢুকলেন, আমি গেলুম খাবার ও গাড়ির ব্যবস্থা করতে। এখানকার গাড়ি বড় অদ্ভুত। দু চাকার ঘোড়ায় টানা গাড়ি, কিন্তু দেখতে খাঁচার মতো। টাঙ্গার মতো চলে, কিন্তু পা ঝুলিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বসবার উপায় নেই। বসে মনে হবে যে সার্কাস পার্টির বাঘের খাঁচায় বসেছি। বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার। মামা এ গাড়ি যে কিছুতেই পছন্দ করবেন না তা বিলক্ষণ জানি। তাই দরাদরির প্রশ্নই ওঠে না। ট্যাক্সি নাকি আছে, কিন্তু তার স্ট্যাণ্ড নেই। কোথায় পাওয়া যাবে তার হদিস পাওয়া গেল না। কিন্তু দেখবার কী আছে, তার একটা মোটামুটি হিসেব পেয়ে গেলুম। এক স্থানীয় ভদ্রলোক কিংবা উর্দিবিহীন রেলের কর্মচারী বললেন: সুন্দর গড় গির্ণার। জুনাগড়, কথাটার মানেই হল পুরনো গড় বা জীর্ণ গড়। হিন্দুরাজাদের তৈরি দুর্গ, নাম উপরকোট। নিশ্চয়ই দেখবেন। সেখান থেকে গির্ণার পাহাড়ে যাবেন। পথে পড়বে বাগেশ্বরী মন্দির, অশোক লেখ ও দামোদর কুণ্ড। গির্ণার পাহাড়ের উপর জৈন মন্দির, দু হাজার ফুট উঁচু, দশ হাজার সিঁড়ি ভাঙতে হবে। যদি এই সিঁড়ি তীর্থে পৌঁছতে চান তো সকালে উঠবেন।

বললুম: সেখানেই শেষ তো?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: না, দাতার পাহাড়ে হল মুসলমান তীর্থ। সিন্ধু থেকে জমিয়াল শাহ এসেছিলেন ধর্মপ্রচারে, তাঁরই মসজিদ। কুষ্ঠরোগীরা আরোগ্যের আশায় সারাক্ষণ যাতায়াত করছে কাছে একটা কুষ্ঠাশ্রমও আছে। পাহাড়ে না উঠেও অনেক কিছু দেখতে পাবেন—শকর বাগে যাদুঘর ও চিড়িয়াখানা, সিলেখানা আর দরবার হল, উইলিংডন ড্যাম, খাপরা খেদিয়া আর বাওয়া পিয়ারা গুহা।

যাবার আগে ভদ্রলোক বললেন: বাজারে একখানা গির্ণার মাহাত্ম্য কিনে নেবেন। হিন্দী তো রাষ্ট্রীয় ভাষা, নিশ্চয়ই পড়তে পারবেন। দামোদরকুণ্ড, রেবতীকুণ্ড, মুচকুন্দ মহাদেব, ভবনাথ

মহাদেব, আত্মাশক্তি অম্বাজী প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ মাহাত্ম্যের সরস বর্ণনা আছে।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি স্টেশনের ভিতরে এলুম।

স্নান সেরে মামা বেরুচ্ছিলেন। বললেন: ব্যবস্থা হল?

বললুম: খাবার ব্যবস্থা হয়েছে, গাড়ির হয় নি।

সে কি, গাড়ি নেই নাকি এ দেশে!

মামা ভারি উদ্বিগ্ন হলেন।

বললুম: গাড়ির কোন অভাব নেই, কিন্তু চড়বার মতো গাড়ি দেখতে পাচ্ছি নে।

ওয়েটিং রুম থেকেও স্টেশনের বাহিরটা দেখা যায়। কাপড় গামছা কাঁধে ফেলে স্বাতি অপেক্ষা করছিল। আঙুল দিয়ে একটা গাড়ি দেখিয়ে দিল।

গাড়ির চেহারা দেখে মামাও চিন্তিত হয়ে বললেন: এ যে ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ি দেখছি। সোনার পাথর বাটি! পা মুড়ে বসা, না পা ঝুলিয়ে?

হেসে বললুম: ভেতরে গদি আঁটা বেঞ্চি আছে।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: বিপদের কথা।

বললুম: এরা তো খুবই সাহস দিচ্ছে। বলছে, সোমনাথে নাকি এ ছাড়া আর গাড়িই নেই। লোকে এখান থেকেই গাড়ি চড়ার অভ্যাস করে যায়।

এই সময়ে মামীও এলেন পাশের ঘর থেকে। সব দেখে শুনে বললেন যে তিনি যাবেন না, ওয়েটিং রুমেই বিশ্রাম করবেন।

মামা তাঁর সুর পাল্টে বললেন: অত ভয় পেলে চলে না। কী, বল গোপাল?

মামীকে চটাতে পারি নে, অথচ মামারও একটা উত্তর দিতে হবে। বললুম: দেখি, যদি অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারি।

অন্ত কী ব্যবস্থা করবে ! তোমার ব্যবস্থা করতে করতেই ট্রেনে ওঠবার সময় হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে স্বাতি স্নান করতে গেল। আমিও গেলুম।

খেয়েদেয়ে মামী সত্যিই বেরলেন না। বললেন: আমি তোমাদের মালপত্রের পাহারায় আছি। রামখেলাওন বাইরে থাক।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম। মামা বললেন: চল গোপাল, আর কিছু বলে লাভ নেই। একবার যখন যাবেন না স্থির করেছেন তখন বৃথা চেষ্টা।

শেষ পর্যন্ত সেই ঘোড়ার গাড়িতেই ওঠা গেল। সঙ্কীর্ণ জায়গা, তিনজনের স্থান হল কোন রকমে। গাড়োয়ান পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘোড়ার পিঠে একটা চাবুক পড়তেই মামা বললেন: কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

কথাবার্তা মামা সবই শুনেছিলেন। তবু বললুম: শকর বাগ।

আশঙ্কা করছিলুম তিনি এই সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাইবেন। কিন্তু তা চাইলেন না। বললেন: পুরাণ ইতিহাস থেকে কিছু শোনাবে না ?

স্বাতি বলল: রামায়ণ মহাভারত থেকে ?

বললুম: মহাভারতে নেই এমন কথা কিছু আছে বলে আমি শুনি নি।

স্বাতির পরিহাস মামা বুঝতে পারেন নি। বললেন: তা ঠিক।

কিন্তু আমার উত্তর শুনে স্বাতি আশ্চর্য হল। বলল: জুনাগড়ের কথা মহাভারতে আছে !

বললুম: গির্ণারের কথা আছে। অর্জুন সুভদ্রাকে বিয়ে করবেন। কিন্তু বড় ভাই বলদেবের মত নেই, তাই কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করে এনে গির্ণার তীর্থে বিয়ে করেন।

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন: তাই নাকি !

বললুম : ভীম এখানে উন্নক নামে এক অসুরকে বধ করেন।

হঠাৎ পুরাণের একটা গল্প মনে পড়ে গেল। স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে এই গল্প আছে। গির্ণারের নাম ছিল উজ্জয়ন্ত পাহাড়। কাছেই রৈবতক ও বস্ত্রাপথ। গল্পটি বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

বাঁধানো পথ ধরে আমাদের টাঙ্গা চলেছে। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জুনাগড় শহর। সেই দেওয়ালে বড় দরজাও আছে। সে সব ছাড়িয়ে শকর বাগ পৌঁছবার আগেই আমি গল্পটা শেষ করবার চেষ্টা করলুম : কৈলাসে একদিন পার্বতী প্রশ্ন করলেন শিবকে, কিসে তোমার তুষ্টি হয়? শিব বললেন, খুব সহজে। অহিংসা সত্য কথা সৎ কাজ ও যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয়--এতেই আমি সন্তুষ্ট। এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেন সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে। বিষ্ণু বললেন, আপনার জন্যে আর পারি নে। সমস্ত দৈত্যদের যদি বর দেন, আমি কী করে শান্তি রক্ষা করি! শিব বললেন, তা সত্যি। কিন্তু আমার নাম যে আশুতোষ! তারপরেই বললেন, একটা উপায় আছে, আমি সরে যাই। বলে সত্যিই তিনি অন্তর্ধান হলেন। পার্বতী পড়লেন বিপদে। শিবকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না। ফলে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে পার্বতী বেরলেন শিবের খোঁজে।

এ দিকে কৈলাস থেকে শিব এসেছেন বস্ত্রাপথে। এখানে বস্ত্র ত্যাগ করে অদৃশ্য ভাবে তপস্যায় বসেছেন। খুঁজতে খুঁজতে দেবতারাও এলেন। বিষ্ণু উঠলেন রৈবতকে আর পার্বতী উজ্জয়ন্ত পাহাড়ে। শিবকে কী করে পাওয়া যায়। পার্বতী তাঁর সুললিত কণ্ঠে শিবস্তোত্র গাইতে শুরু করলেন। আর যায় কোথা! সুড়সুড় করে শিব বেরিয়ে এলেন। দেবতারা বললেন, আর নয়, এবারে কৈলাসে চলুন। শিব বললেন, যাব, কিন্তু আর সবাইকে এখানে থাকতে হবে। তথাস্তু বলে বিষ্ণু রৈবতকে রইলেন, অম্বা নামে পার্বতী থাকলেন উজ্জয়ন্ত পাহাড়ে। আজও আছেন। গির্ণার পাহাড়ে দশ হাজার সিঁড়ি ভাঙলে অম্বা দেবীর সাক্ষাৎ মেলে।

রৈবতকের গল্প আছে বিষ্ণুপুরাণে। রাজা রৈবতকের কন্যার নাম রেবতী। কার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের দেবেন, এই কথা জানবার জন্য তিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা তখন হাহা ও হুহু নামের গন্ধর্বের গান শুনছিলেন। তাদের অতিতান গান শেষ হলে রৈবতক ব্রহ্মাকে তাঁর প্রশ্ন জানালেন। ব্রহ্মা বললেন, কাকে তোমার পছন্দ বল। রৈবতক দু-একজনের নাম করতেই ব্রহ্মা হেসে বললেন, তাদের বংশের কেউ আর বেঁচে নেই। তুমি তো বহু যুগ এখানে বসে গান শুনছ। রাজা রৈবতক সভয়ে বললেন, তবে উপায় কী হবে প্রভু? ব্রহ্মা একটু ভেবে বললেন, তোমার কুশস্থলীর নাম এখন দ্বারকা হয়েছে। বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিয়েছেন কৃষ্ণ ও বলরাম। বলরামের সঙ্গে তোমার মেয়ে রেবতীর বিয়ে দাও। পৃথিবীতে ফিরে রাজা রৈবতক তাই করলেন।

ততক্ষণে টাঙ্গা এসে প্রশস্ত বাগানের ভিতর দাঁড়িয়েছে। আমরা নেমে পড়লুম।

নেমেই স্বাতি বলল: রেবতীর বয়স বুঝি বাড়ে নি?

বললুম: রেবতী বোধহয় তার বাবার সঙ্গে ব্রহ্মলোকেই গিয়েছিল।

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না।

এগিয়ে যেতে যেতে বলল: তাড়াতাড়ি সব দেখে নিতে হবে বাবা, হাতে আমাদের একেবারেই সময় নেই।

মামা বললেন: দেখবার আর কী আছে! নবাবের একটা সখের ব্যাপার। বিরাট যে কিছু নয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

সত্যিই তাই। গোটা কয়েক সৌরাষ্ট্রের সিংহ আর বাঙলার বাঘ, এই নিয়েই চিড়িয়াখানা। সিংহের বংশ নাকি শেষ হয়ে আসছে। যে কয়েকটা আছে, তা এখানকার অরণ্যেই আছে। ভারতের আর কোথাও নেই। গির ফরেস্টে তাদের সযত্নে পালন করা হচ্ছে। মারবার হুকুম নেই, দেখবার অধিকার আছে। ভেরাবল থেকে

ানিকটা এগিয়ে সাঙ্গির স্টেশন। একটা গেস্ট হাউস আছে ়েকেবারে বনের ভিতর। উৎসাহীরা সেইখান থেকে সিংহ দেখে। মামরা খাঁচার সিংহ দেখলুম।

মামা বললেন ঃ যাত্নঘর দেখে আর কাজ নেই। চল, উপরকোট ়দখি।

এত শীঘ্র আমাদের ফিরতে দেখে টাঙ্গাওয়ালা বিরক্ত হল। তার সঙ্গে ঘণ্টার হিসেব। কাজ না করে পয়সা পাবার স্থখ আছে। সেও কিছু বসে রোজগারের আশা করেছিল। তাইতেই বিরক্তি। মুখে কিছু না বললেও তার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি।

গির্ণার পাহাড়ের পাদদেশে উপরকোট একটি পরিত্যক্ত ছুর্গ। এক সময় কোন এক রাজপুত রাজা এই ছুর্গ নির্মাণ করেন। আজ তার দ্বার মুক্ত, অবারিত। সশস্ত্র প্রহরী আজ কোন মানুষকে বাধা দেয় না, আমাদেরও দিল না। সিংহদ্বারের বাহিরে আমাদের টাঙ্গা দাঁড়াল। আমরা নেমে ভিতরে ঢুকলুম।

এক জায়গায় প্রহরী বাধা দিল। মানুষকে নয়, স্বাতির ক্যামেরাকে। বলল ঃ এ জিনিসটা বাইরে রাখতে হবে।

মামাও দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলেন অনেকটা উপরে না উঠলে কিছুই দেখা যাবে না। কিন্তু সে কাজে তাঁর উৎসাহ নেই। স্বাতির হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে বললেন ঃ তোমরা দেখে এস। আমি এইখানে অপেক্ষা করছি।

প্রস্তাবটা যে স্বাতির ভাল লেগেছিল, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারছিলুম। তবু বলল ঃ তুমি একটুও উঠবে না বাবা?

মামা বললেন ঃ একটু উঠলে তো আর সবটা দেখতে পাব না মা, বরং চোখ বুজলে সে আশা আছে। তোমরা দেখে এসে গল্প বোলো।

স্বাতি আর অপেক্ষা করল না, তরতর করে এগিয়ে গেল। আমিও গেলুম তার পিছনে।

হঠাৎ মনে হল যে অনেক দিন তার সঙ্গে একা বেড়াবার সুযোগ পাই নি। নিরিবিলিতে বলবার কথা বুঝি অনেক জমেছে। একই মানুষের তো নানা রূপ, এক একজনের কাছে এক এক রকম। খাঁটি রূপটি শুধু তার নিজের কাছে। অন্তরঙ্গের কাছে এই গোপন রূপের খানিকটা ছায়া পড়ে। যত অন্তরঙ্গ, তত স্পষ্ট। একান্ত অকপটে নিজেকে একজনের কাছেও প্রকাশ করা যায় কিনা সে অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। কোন দিন হবে কিনা, তাও জানি না। চলতে চলতে তবু মনে হল যে এই মেয়েটার কাছে অনেক কিছু অকপটে বলা যায়।

স্বাতি বলল: অমন গম্ভীর হয়ে রইলে যে?

তোমার কথাই ভাবছি।

আমার কথা!

স্বাতির বুঝি বিশ্বাস হল না তাই বলল: আমার জন্যে আবার তোমার মাথা ব্যথা কেন?

কেন হবে না বল। জো রায় তো শুধু আমারই হাতে পায়ে ধরে নি, হালদারকেও ঘুষ দিয়ে গেছে মোটা টাকা।

স্বাতি যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল: কী রকম!

বললুম: আকাশ থেকে পড়ছ! তা আমার সামনে কেন! বেচারা জো রায়ের সামনে পড়লে ও হাতে স্বর্গ পেত। আকাশের চাঁদের জন্যেই সে তো মরছে।

কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে স্বাতি বলল: বল কি, আমি তো তোমাকেই বামন বলে জানতাম!

খুব ভুল হল। এ বামনের হাতে চাঁদ নিজেই ধরা দিয়ে আছে।

দিয়েছে ধরা!

বলে স্বাতি ঠোঁট ওল্টাল।

বললুম ঃ আকাশের চাঁদও পৃথিবীতে নামে। যতক্ষণ আকাশে, ততক্ষণই সে চাঁদ।

তাইতেই বুঝি তুমি হাত বাড়াও না!

স্বাতির কণ্ঠে আমি অভিমানের সুর শুনলুম। হেসে বললুম ঃ হাত বাড়ানোর আগে যে আমার চাঁদ আমাকে ধরা দিয়েছে।

স্বাতি বলল ঃ দুঃসাহস ভাল নয়। খাঁচার পাখিও যায় উড়ে।

পোষ মানলে আর উড়ে যায় না, উড়িয়ে দিলেও ফিরে আসে।

তোমার কি পক্ষীতীর্থের পাখি! আফিং খাইয়ে বশ করেছ!

আমি হেসে বললুম ঃ মানুষের মনও যে তীর্থ! সেখানে আফিঙের দরকার হয় না।

স্বাতি বুঝি লজ্জা পেল। বলল ঃ তোমার মুখ দিনে দিনে আলগা হয়ে যাচ্ছে দেখছি।

আমি নীরব থাকতে পারলুম না, বললুম ঃ মন যে আগেই আলগা হয়ে গেছে।

বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে আমরা একটা প্রশস্ত জলাশয় দেখতে পেয়েছিলুম। তার চারিধার বাঁধানো, নানা জাতের ফুলও ফুটে আছে। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য প্রখর না হলে অকাতরে অজস্র সময় কাটানো চলে। একটুখানি ছায়া দেখে স্বাতি বলল ঃ বস এইখানে।

বললুম ঃ মামাবাবুকে যে একা ফেলে এসেছি!

তিনি হারিয়ে যাবেন না।

বলে সে বসে পড়ল।

জায়গাটি আমারও ভাল লেগেছিল। তাই আর আপত্তি না করে আমিও বসে পড়লুম।

চুপ করে থেকে স্বাতি সময় নষ্ট করল না, বলল ঃ এমনি হাল্কা ভাবে আর কত কাল কাটাবে?

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম : যত কাল পারি।

মানে?

মানে খুব সোজা। যত দিন কাটাতে দেবে, ঠিক তত দিনই। তার বেশি একটা দিনও নয়।

স্বাতি বলল : তোমার কী মনে হয় জানি নে, আমার বড় অপমান বোধ হয়।

আমি আরও কিছু শোনবার জন্যে নিস্পন্দে অপেক্ষা করতে লাগলুম। স্বাতি ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর বলল : আমি কি খেলার জিনিস, না বাজারের পণ্য?

আমি কোন উত্তর দিলুম না দেখে স্বাতি বলল : তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না?

যোগ্যতা থাকলে তো প্রমাণ দেব!

এ যুগের বিচারে বোধ হয় সত্যিই তোমার কোন যোগ্যতা নেই।

ঐখানেই তো আমার সান্ত্বনা। এ যুগ এক দিন বদলাবে। সেদিন যদি কিছু করতে পারি, সেই অপেক্ষায় আছি।

স্বাতির দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখলুম। সে আর কথা কইল না।

বললুম : জান স্বাতি, স্বাধীনতা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি, বুকের রক্ত ঢেলে আদায় করি নি। তাই আমরা স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না। কিছু দিন যাক। চূড়ান্ত দুর্দশার ভেতর হাবুডুবু খেয়ে সবই আমরা বুঝতে পারব।

কিন্তু সেদিন কি আর আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসব!

এ কথা তো স্বাতির মতো হল না!

কেন?

এ কথা বলবে অন্য মেয়ে। সাধারণ মেয়ে। আমি তোমাকে সাধারণ ভাবতে পারি নে।

ছোট একটা নুড়ি নিয়ে স্বাতি খেলা করছিল। সেটা হঠাৎ

জলের উপর ছুঁড়ে ফেলেই হেসে উঠল খিলখিল করে। উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসি। বলল: তুমি কী বোকা গোপালদা!

আমি চমকে উঠেছিলুম। হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। তখনি আবার সামলে নিয়ে বললুম: বোকাই তো, তা না হলে তোমার সঙ্গে তর্ক করি!

আঁচলটা জড়িয়ে স্বাতি উঠে পড়ল। বলল: শীগগির নেমে চল। দেরি দেখলে বাবা আবার হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠবেন।

নিঃশব্দে আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

দুপুরের রোদ যে এত তীব্র, ছায়ায় বসে তা টের পাই নি।

২৭

নিচে নেমে মামাকে দেখতে পাওয়া গেল না। স্বাতির দৃষ্টিতে কিছু দুর্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ রইল না। টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল : সাহেব গাড়ির মধ্যে বসে আছেন।

নিশ্চয়ই খুব দেরি হয়েছে আমাদের!

বলে স্বাতি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললুম : দেরি হবে না!

কিন্তু কটাক্ষে স্বাতি আমায় থামিয়ে দিল। আমরাও গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলুম।

মামা আমাদের দেরির জন্য কৈফিয়ৎ তলব করলেন না, বরং উল্টো কথা বললেন : খুব তাড়াতাড়ি নেমে এলে তো, বেশি ওপরে ওঠো নি বুঝি!

উত্তর স্বাতি দিল, বলল : তুমি একা রইলে কিনা!

টাঙ্গাওয়ালা পিছনের দরজা বন্ধ করে সামনে উঠে বসেছিল। সপাং করে একটা চাবুক মারতেই ঘোড়া বেগে ছুটল। ঢালু পথ দেখে মামা হাঁক দিলেন : হুঁশিয়ার!

গাড়ির গতি একটু মন্দ হতে জিজ্ঞাসা করলেন : কী দেখলে?

দেখবার হয়তো অনেক কিছু ছিল। শুনেছি যে জলাশয় আছে চার-পাঁচটি। তারপর প্রাচীন বৌদ্ধ গুহা। বৌদ্ধ প্রভাবের যুগে যে এখানে কোন সংঘারাম ছিল, তার প্রমাণ আছে চারি দিকে ছড়ানো। অনেক পুরানো গুহা পাহাড়ের গায়ে আছে। কোন কোনটা দোতলা বা তিনতলার সমান উঁচু। এ সমস্ত তিনশো খ্রীষ্টাব্দের কথা। এও শুনেছি যে এক আতা বনের ভিতর নাকি সতের ফুট লম্বা একটা

কামান আছে। তার নাম লিলাম তোপ। তুর্কীরা এই কামানটা নাকি দিউএ ফেলে গিয়েছিল। এ ছাড়াও আছে নুরি শাহের কবর আর মসজিদ। কিন্তু আমাদের এ সব কিছুই দেখা হয় নি।

স্বাতি ভয় পেয়েছিল যে আমি সত্য কথা বলে ফেলব। তাই তাড়াতাড়ি বলল: কী সুন্দর জায়গা বাবা। দুপুর না হলে নেমে আসতে পারতাম না। একেবারে ওপরে উঠে সান বাঁধানো পুকুর, তার চারি দিকে ফুলের বাগান। আমাদের দেশে বেড়াবার এমন সুন্দর জায়গা নেই।

হঠাৎ বাহিরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল: এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি গোপালদা?

তার ভাবনা আমি বুঝতে পারি। বললুম: গির্ণার পাহাড়ে।

পাহাড়ে আমরা উঠব তো!

সিঁড়ি মাত্র দশ হাজার।

মামা হাসলেন আমার কথার ধরনে।

স্বাতি বলল: ভাবছ, দশ হাজার সিঁড়ি আমি ভাঙতে পারব না, এই তো!

তা ভাবব কেন? বরং ভাবছি, তুমি ঐ দশ হাজার সিঁড়ি উঠে আমাকে চল্লিশ হাজার সিঁড়ি ভাঙাবে।

মানে?

মানে একটুও কঠিন নয়। ওপরে উঠে তুমি নিশ্চয়ই নামতে পারবে না। তখন আমাকে নেমে এসে ডুলি নিয়ে আবার উঠতে হবে তোমাকে নামাবার জন্যে।

মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। মনে হল যে চলন্তি গাড়িটা বোধ হয় ভেঙেই পড়বে। টাঙ্গাওয়ালা ভয়ে ভয়ে একবার পিছন ফিরে দেখল।

পথে আমরা বাগেশ্বরী মন্দির দেখলুম। তারপর অশোক লেখ।

প্রাচীরে ঘেরা শহর থেকে বেরতে হয় গির্ণার ফটক দিয়ে। গির্ণার রোডের পাশে এই প্রাচীন শিলালিপি। একটি বিরাট কালো পাথরের উপর চৌদ্দটি শিলালিপি। সরকার এগুলি রক্ষা করবার জন্য এই পাথরের উপর একখানি ছোট বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছেন। পাথরটি লম্বায় তিরিশ ফুট, আর চওড়ায় বিশ। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সেখানে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। খ্রীষ্টের জন্মের আড়াইশো বছর আগে পালি ভাষায় লেখা এই শিলালিপি। সম্রাট অশোকের অনুশাসন। প্রজা সাধারণের উপর রাজা প্রিয়দর্শীর আদেশ। সংস্কৃত ভাষায় যে শিলালিপি, তা রুদ্রদামনের এবং স্কন্দ গুপ্তের। অশোকের চেয়ে চারশো ও সাতশো বছর পরের লেখা।

তাড়াতাড়ি এসব দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম। সামনেই দামোদর কুণ্ডের উপর দামোদর মন্দির। টাঙ্গা থেকে নেমে দেখলুম যে কুণ্ডে আর স্নানার্থীর ভিড় নেই, মন্দির প্রাঙ্গণও শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে একজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে বললেন : আসুন।

মামা বললেন : থাক থাক।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে দমলেন না। বললেন : কুণ্ডে স্নান করবেন তো আপনারা ?

প্রশ্ন শুনে স্বাতি হাসল, কিন্তু মামা বিগড়ে গেলেন। বললেন : মাথা খারাপ নাকি !

কিন্তু ব্রাহ্মণও খুব বিস্মিত হয়ে বললেন : সে কি, দামোদর কুণ্ডে স্নান করবেন না ! ভারতের সেরা তীর্থ দামোদর ! গঙ্গার জলে যে গুণ নেই, গোমতী দ্বারকার নেই, এখানে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। মানুষের অস্থি ফেলে দিলে সে অস্থি এখানে গলে মিলিয়ে যায়, গঙ্গার মতো কাই হয় না, গোমতীর মতো চক্রাকারও হয় না।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন : বল কি !

উৎসাহ পেয়ে ব্রাহ্মণ বললেন : কেন হবে না ! স্বয়ং ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করেছিলেন, এবং ঋষি ও দেবতাদের স্নানের জন্যে এই কুণ্ড তৈরি

করেছিলেন। এতে সমস্ত তীর্থের জল আর গঙ্গার জল ঢেলেছিলেন নিজের কমণ্ডলু থেকে। যজ্ঞ শেষে সমস্ত ঋষি ও দেবতারা ফিরে গেলেন, কিন্তু বিষ্ণু রয়ে গেলেন প্রার্থনা পূরণে। তাই এই তীর্থের নাম দামোদর তীর্থ।

তবু আমরা স্নান করলুম না কিন্তু তীর্থস্থানটি ঘুরে ঘুরে দেখলুম।

মন্দিরের ভিতর দামোদর মূর্তি আছে বন্ধ দরজার আড়ালে। তুপুরে দেবতা বিশ্রাম করেন।

টাঙ্গায় উঠবার আগে ব্রাহ্মণকে বিদায় দিতে মামা আর ইতস্ততঃ করলেন না। ব্রাহ্মণ নিজের হাতে দামোদর কুণ্ডের জল এনে মামার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন আমাদের গায়েও।

আরও খানিকটা পথ এগিয়ে গির্ণার পাহাড়। গাড়ি আর যাবে না। এবারে পায়ে হেঁটে ধাপে ধাপে পাহাড়ে উঠতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে দেখলুম যে পরিবেশটি বেশ শান্ত ও সমাহিত। গাছ ও পাহাড়ের ছায়া স্নিগ্ধ মায়া বিস্তার করেছে। তুধারে খান-কয়েক চালাঘরে দোকানপাট। চা মিষ্টি পাহাড়ে ওঠবার লাঠি ও ডুলি আছে। অশক্ত মানুষ ডুলিতে চেপে পাহাড়ে ওঠে। দু হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে ওঠে শুধু ধর্মের টানে।

এ সময়ে আজ যাত্রীর ভিড় নেই। তুপুর বলেই বোধ হয় ভিড় নেই। খান তু-তিন টাঙ্গা আর একখানা খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে। শহর থেকে মাত্র তিন মাইল পথ। কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর এই পথ অতিক্রম করবার ক্ষমতা যাত্রীদের আর থাকে না। তাই পাহাড়ের নিচে টাঙ্গা ও বাস দাঁড়িয়ে থাকে। কখন নামবে, সেই নির্দেশ দিয়ে উপরে উঠতে হয়।

গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি বলল: আমরাও ওপরে উঠব গোপালদা।

মামা তাঁর চোখ কপালে তুলে বললেন: পাগল নাকি!

জোর করে স্বাতি বলল : আমি পারব বাবা।

বললুম : পারার কথা নয়, সময় কোথায়? বইএ পড়েছি, সকাল বেলায় উঠতে শুরু করলে সন্ধ্যের আগে নেমে আসা সম্ভব নয়।

স্বাতি বিশ্বাস করল না আমার কথা, বলল : চল তো, কাউকে জিজ্ঞেস করি।

এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলুম।

উত্তর দেবার আগে সে আমাদের প্রশ্ন করল : আপনারা জৈন না হিন্দু?

বললুম : হিন্দু।

তাহলে গোটা দিনই লাগবে।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার প্রশ্ন বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলুম : জৈন হলে কত সময় লাগত?

এতক্ষণ ফিরে আসতে পারতেন। দেখছেন না, বাস এসেছে যাত্রীদের নেবার জন্যে!

বুঝতে কষ্ট হল না যে জৈন-মন্দির দেখতে সমস্ত পাহাড়টা উঠতে হয় না। তবু সেই দোকানদার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। বলল : পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবার পাঁচশো ফুট নিচেই জৈনকোট। দু'ঘণ্টাতেই পৌঁছে যাবেন, সে একটা ছোটখাট শহর। মন্দিরের শহর পালিতানা দেখেছেন?

না।

আমেদাবাদে হাতী সিং-এর মন্দির?

তাও না।

আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির নিশ্চয়ই দেখেছেন!

তা দেখেছি।

তবে খানিকটা অনুমান করতে পারবেন। দিলওয়ারার মতো অজস্র মন্দির এই পাহাড়ের উপর। বস্তুপাল ও তেজপাল নামে যে দুই ভাই দিলওয়ারার মন্দির তৈরী করেছেন, পালিতানা ও

গির্ণারের তাঁদের তৈরি মন্দির আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় মন্দির এখানে নেমিনাথের। রাজা সাম্প্রতের তৈরি। এ ছাড়াও আছে রাজা কুমার পালের তৈরী অভিনন্দন প্রভুর মন্দির আর সহস্র ফণার পার্শ্বনাথ মন্দির। গত ও অনাগত জিনের মন্দির আছে বাহান্নটি। যত হীরে তত মণিমুক্তা। মন্দিরের মেঝে আর সিঁড়িগুলো শুধু শ্বেতপাথরের।

স্বাতির বিস্ময় লক্ষ্য করে দোকানদারটি হেসে ফেলল, বলল: আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে:

জৈননু চুনা মাঁ,
বৈষ্ণবনু দুনা মাঁ।

প্রবাদের মানে বলবার আগেই প্রশ্ন করল: আপনারা বৈষ্ণব নন তো?

ঘাড় নেড়ে না বললুম।

দোকানদার সাহস পেয়ে বলল: জৈনরা খরচ করেন মন্দিরে, আর বৈষ্ণবরা আহারে। দ্বারকায় দেখেন নি?

আমরা তা দেখতে যাই নি। এ অভিযোগও শুনিনি কারও মুখে। বরং নিজের দেশে অন্য জিনিস দেখেছি। আহার বিহারে সংযমের জন্যই বৈষ্ণবরা সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু স্বাতি হেসে উঠল খিল খিল করে। বলল: কলকাতায় ফিরে মালতীকে বলতে হবে। ওরা বোষ্টম, আমাদের বাড়িতে চা পর্যন্ত খায় না।

আমি অন্য কথা বললুম: পাহাড়ের মাথায় বুঝি হিন্দুদের মন্দির?

তা হলেও রক্ষা ছিল। দ্বিতীয় শৃঙ্গে কালীমন্দির ও সদাব্রত। কুণ্ডে স্নান করে সদাব্রতে ভাজা ছোলা ও খেজুর পাবেন। যদি কচি বাঁশের আচার দিয়ে খিচুড়ি আর রুটি খেতে চান তো পট্টন চটি নামে এক সাধুর আশ্রমে নামবেন।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: কচি বাঁশের আচার!

দোকানদার বলল: এ পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ। বিনি পয়সায় এ

এক উপাদেয় খাদ্য। তারপর গির্ণারের তৃতীয় শৃঙ্গ, সব চেয়ে উঁচু, আর সেইখানে অম্বাদেবীর মন্দির ও কালভৈরব শিব। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণদের কুলদেবতা। সমস্ত হিন্দুর মস্ত তীর্থ।

মামা সঙ্গেই ছিলেন, বললেন, : কোন পীঠস্থান নাকি?

দোকানদার বলল : তা জানি নে।

কিন্তু আমি শুনেছিলুম যে বস্ত্রাপথও পীঠস্থান। দেবী ভুবনেশ্বরী আর ভৈরব ভব। কিন্তু ভয়ে এ কথা আর কাউকে বলি নি। মামী জানতে পারলে আমার আর মুখদর্শন করবেন না।

গির্ণারের খবর সব শোনা হয়েছে ভেবে স্বাতি সেখান থেকে সরে আসছিল। কিন্তু দোকানদার বলল : এখনও ওপরে ওঠা অনেক বাকি আছে।

এখনও বাকি!

হ্যাঁ।

চতুর্থ শৃঙ্গে আছে গুরু গোরক্ষনাথের পদচিহ্ন, আর গুরু দত্তাত্রেয়র পদচিহ্ন আছে পঞ্চম শৃঙ্গে। এ সব জায়গায় যেতে শুধু ওঠা নয়, নেমে উঠতে হয়। বাঁধানো সিঁড়ি উঠছে, নামছে, আবার উঠছে।

স্বাতি বলল : আর তো উঠবে না?

পৌঁছে তাই মনে হবে। কেননা বাঁধানো সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে কালিকা-শৃঙ্গ উঠতে হবে একেবারে খাড়া চড়াই ভেঙে।

আমার মনে পড়ল যে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের একটি নিবন্ধে এই স্থানের বর্ণনা পড়েছি। অদ্ভুত শোভা! .নির্জন স্তব্ধ পরিবেশে মন অন্তর্মুখী হবে, ধ্যানমগ্ন হয়ে আনন্দময় হবে। দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি গেছে প্রসারিত হয়ে, মন ভরে গেছে উদার প্রশান্তিতে।

দোকানদারের গল্পে এইবারে বাধা পড়ল। আর একজন লোক এসে তাকে উঠতে বলল। গদি থেকে নেমে এসে সে বসল বাহিরের বেঞ্চিতে। বোঝা গেল যে সে দোকানদার নয়, দোকানে বসে পাহারা

দিচ্ছিল মাত্র। এবারে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল: খানিকটা উঠে দেখে আসুন না!

স্বাতি খুশী হল এই প্রস্তাবে, বলল: সেই ভাল গোপালদা।

মামা বললেন: কিন্তু বেশি দেরি কোরো না যেন! আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি।

বেশ জোরের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে স্বাতি বলল: না বাবা, আমাদের একটুও দেরি হবে না। একটুখানি উঠেই আমরা নেমে আসব।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: তোমার হাতের ঘড়িটা ঠিক চলছে তো?

ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললুম: ছটায় আমাদের ট্রেন। ঘণ্টাখানেক আগে পৌঁছলেই চলবে।

তর তর করে স্বাতি এগিয়ে গিয়েছিল। আমি তার পিছনে ছুটলুম।

এক বৃদ্ধা নামছিল উপর থেকে। তার কোমর বাঁকা। মাঝে মাঝে হাত দুটো হাঁটুর উপর রেখে দম নিচ্ছে, আবার নামছে। স্বাতি বলল: দেখ।

দেখবার কী আছে!

শুধু শুধু তুমি ভয় দেখাও। ওর চেয়ে কি আমি শক্ত নই?

সংক্ষেপে বললুম: না।

না মানে! আমি কি ওর চেয়েও বুড়ি!

দেহে না হলেও মনে বটে। তোমার মনে অত উত্তাপ নেই।

উত্তাপ আবার কী!

প্রশ্নেরটা উত্তরটা আমি এড়িয়ে গিয়ে বললুম: তুমি এ যুগের মেয়ে। তোমার সমস্ত চাওয়ার পেছনে যুক্তির যাচাই আছে। যা পাব, তার মূল্য কতটুকু! পাবার জন্যে যে পরিশ্রম, তার মজুরিটা পোষাবে তো! এদের তো সে বালাই নেই। সামান্য কিছু পেয়েই এদের ছোট ছেলের মতো মন ভরে যায়। বিশ্বাসও বড়।

যদি বল এই দশ হাজার সিঁড়িতে দশ হাজার বার মাথা ঠুকলে স্বপ্নে দেবতা দর্শন দেবেন, এই বুড়ি বিশ হাজার বার মাথা ঠুকবে কোন দ্বিধা না করে। তুমি পারবে?

স্বাতি কী ভাবছিল, সেই জানে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: আমার একটা কথার জবাব দিতে পারবে?

হেসে বললুম: প্রশ্নটা শুনলে চেষ্টা করব।

তোমার ওপর মার এত রাগ কেন?

ওটা রাগ নয়, ভয়। মেয়ে যা বেহায়া, বেশি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিলে পাছে কি গণ্ডগোল বাঁধায়, সেই ভয়েই সতর্ক থাকেন।

আমি বেহায়া!

বারুদের মতো স্বাতি জ্বলে উঠল।

তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দিলুম: ও ধারণাটা তো আমার নয়, ওটা তোমারই মায়ের। প্রতিবাদ করতে হয়, তাঁর কাছেই কোরো।

তোমাকে বলেছেন বুঝি?

বুঝতে দিয়েছেন।

স্বাতি বলল: আর একটা কথার জবাব দাও।

কথা ছিল একটা প্রশ্নের জবাব দেবার।

এ কথায় কান না দিয়ে স্বাতি বলল: জো রায়কে তো মা ভয় পান না, তোমাকে কেন ভয় পান?

সে কথা কি তোমার জানা নেই?

চলতে চলতে স্বাতি ভাবছিল। কোন উত্তর দিল না।

বললুম: শাস্ত্রের কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়।—মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্! আমার বিত্ত থাকলে তোমার মাও আর আমাকে ভয় পেতেন না। যেমন তোমার বাবা। তবে আশঙ্কার কথা এই যে পৃথিবীটা তো খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। এক দিন সবাই শুধু বিত্তই চাইবে। তখন তোমার মার সঙ্গে তোমার বাবা বা তোমার নিজেরও কোন মতের অমিল থাকবে না।

ভুল কথা।

ভুল হলেই মঙ্গল। তাতে শুধু তোমার আমার নয়, সমস্ত জগতের কল্যাণ হবে।

স্বাতি বলল: তোমার দার্শনিক মন্তব্যে আমার প্রশ্নের মীমাংসা হল না। মা তোমাকে কেন এড়িয়ে চলবেন?

বললুম: তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আর এড়িয়ে চলবেন না। তুমি শ্বশুর বাড়ি গেলে তোমাদের বাড়িতেই আমার স্থান হবে, আর আমাকে ডেকে আনবেন মামীমা নিজে।

তোমাকে ডাকবেন কেন?

হাজার হলেও আমি ভাগনে তো! তাঁদের বুড়ো বয়সে দেখাশুনো করতে পারব। মামার কাজকর্ম কিছু করে দিলে তাঁর স্বাস্থ্যটাও ভাল থাকবে।

সে তো এখনও পার।

কিন্তু তাতে ভয় আছে। নিজের বেহায়া মেয়েটাকে বিশ্বাস নেই।

স্বাতি এবারে আর রাগ করল না, প্রতিবাদও করল না। বলল: এবারে আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর দাও।

বললুম: প্রশ্নের শেষ নেই। তবু বল।

মার ভয়ের কারণটা যদি সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ক্ষতি কিসের?

প্রশ্ন শুনে আমি হেসে উঠলুম। বললুম: বেশ বলেছ। তোমাদের কি সমাজ নেই? সে সমাজে আমার স্থান কোথায়? এ দেশে এক দিন পেশা দিয়ে বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল, আজ পয়সা দিয়ে আমরা বর্ণভেদটা বাঁচিয়ে রাখছি। মানুষে মানুষে প্রভেদ না থাকলে পৃথিবীতে যে অনাসৃষ্টি বাধবে।

স্বাতি গম্ভীর হয়ে রইল।

বললুম: এই আমার কথা ধর। আমি কেরানী, একটা কারখানার

মজুরের চেয়ে কম মাইনেই পাই। কিন্তু পারি আমি একটা মজুরের মেয়েকে ঘরে আনতে! লোকে বলবে কি! সমাজে আমি যে ছোট হয়ে যাব।

চেষ্টা করে আমি হেসে উঠলুম। কিন্তু টনটন করে উঠল বুকের ভিতরটায়।

স্বাতি বলল: দাঁড়াও গোপালদা। এইখান থেকে বোধ হয় মন্দিরগুলো সব দেখা যাবে।

মন্দির না দেখতে পাই, অসত্যকে দেখতে পাচ্ছি। সত্য কি কোন দিন দেখা দেবে না!

২৮

ভারত সরকারের গাইড বইএ আমরা জৈনকোটের ছবি দেখেছিলুম। পাহাড়ের নিচে থেকে চোখে দেখে এই বিরাট কীর্তির কোন ধারণা হয় না। দেখতে হয় পাহাড়ের উপরে উঠে, খানিকটা উঁচু থেকে। সেইখান থেকে ছবি নিতে হয়। মনে হবে, সমুদ্রের তীরে একটা শহর দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের পিছনে যে অনন্ত নীল আকাশ, ছবিতে তাকে অকূল সমুদ্র মনে হবে। আকাশ আর সমুদ্র তো একই রকম। কারও শেষ নেই। কিছুরই কি শেষ আছে!

নিচে নেমে আসতেই মামা বললেন: কেমন দেখলে?

স্বাতি এ কথার উত্তর দিল না, বলল: ভয়ে তুমি উঠলে না বাবা, এখানকার সিঁড়ি ভাঙতে তোমার একটুও কষ্ট হত না।

উঠতে কষ্ট হয় না, সে আবার কেমন সিঁড়ি!

বলে মামা জিজ্ঞাসু চোখে স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি বলল: এক ধাপ দু ধাপ তিন ধাপ, আবার খানিকটা সোজা পথ। ধাপগুলোও ত্রিচির রক টেম্পলের মতো উঁচু উঁচু নয়। দশ হাজার সিঁড়ি কি অমনি হয়েছে!

আমার দিকে চেয়ে মামা বললেন: পলিতানার গল্প শুনেছ গোপাল?

বললুম: না।

সে নাকি মন্দিরেরই শহর। পলিতানায় গিয়ে শত্রুঞ্জয় পাহাড় একবার দেখে এলে কাশীকে আর কেউ মন্দিরের শহর বলবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে মামার মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন: সত্যিই তাই! বিদেশীরাও স্বীকার করেছেন যে পৃথিবীতে এমন শহর আর একটি নেই।

যে ভদ্রলোক আমাদের গির্ণার পাহাড়ের গল্প শুনিয়েছিলেন তিনি কাছেই ছিলেন। বললেন: ফেরার সময় দেখে যাবেন পলিতানা।

মামা বললেন: হাতে সময় আছে নাকি দেখ তো!

তিনি বোধ হয় পলিতানার গল্প শোনার কথা ভাবছিলেন। তাই ঘড়ি দেখে বললুম: যথেষ্ট সময় আছে।

মামা বললেন: তবে এস, এক ভাঁড় চা নিয়ে বসে গল্পটা শুনেই যাই।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে বলল: এই নোংরা দোকানে বসে চা খাবে বাবা!

মামা বললেন: দোকান নোংরা বলে কি চা-ও নোংরা দেবে নাকি! এসো এই দিকে।

বলে একটা চায়ের দোকানের সামনে এসে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। আমরাও বসলুম। তারপরে চায়ের অর্ডার দিয়ে গল্প শুনতে লাগলুম ভদ্রলোকের।

প্রায় দু হাজার ফুট উঁচু একটি পাহাড়, তারই মাথায় শত্রুঞ্জয়। একটি অধিত্যকার দুধারে দুটি শৃঙ্গ, আর নিচে শত্রুঞ্জয় নদী। জৈনদের কাছে গঙ্গার মতো পবিত্র এই নদী। যাত্রীরা এসে পাহাড়ের নিচে ধর্মশালায় ওঠেন, স্নান করেন শত্রুঞ্জয় নদীতে, তারপরে অগণিত সিঁড়ি ভেঙে ওঠেন পাহাড়ের উপরে। তিন মাইল পথ, বিশ্রাম করতে হয় স্থানে স্থানে, দম ফুরিয়ে যায় অনেক যাত্রীর। অশক্ত যাঁরা, তাঁরা ওঠেন ডুলিতে চেপে।

মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন গম্ভীর ভাবে। আমি কোন কথা বললুম না।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন: উপরে এই মন্দিরের শহর শত্রুঞ্জয়। বড় মন্দির আছে একশো ছটি, ছোট মন্দিরের সংখ্যা সাতশো সাতান্ন।

বলেন কি!

স্বাতি যেন আর্তনাদ করে উঠল।

ভদ্রলোক সকৌতুকে বললেন: এতেই শেষ নয়। তীর্থঙ্করের ও অন্যান্য মূর্তি আছে এগার হাজার, আর নশোটি পাদুকা বা তীর্থঙ্করদের চরণ প্রতিষ্ঠা। ধারণা করতে পারেন?

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন: না।

ভদ্রলোক বললেন: শুধু পাহাড়ের শৃঙ্গ দুটি নয়, অরণ্যময় অধিত্যকাটিও এখন মন্দিরে পূর্ণ হয়ে গেছে। হনুমানের মন্দিরে পৌঁছে যাত্রীরা প্রথমে উত্তর শিখরে যান, তারপর অধিত্যকা হয়ে যান দক্ষিণ শিখরে।

আমি বললুম: আমাদের যাতায়াতের পথে তো এই পলিতানা দেখলুম না!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: দ্বারকা সোমনাথের পথে অবস্থিত হলে সাধারণ যাত্রীর কাছেও সুপরিচিত হত। শাখা লাইনে বলেই অসুবিধা হয়েছে।

তারপরে পলিতানার অবস্থান আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। দিল্লী আমেদাবাদ লাইনে মেহসানা জংসন থেকে ভাবনগরের ট্রেন চলে। ভিরমগাঁও সুরেন্দ্রনগর হয়ে ভাবনগরের পথ। সেই পথের উপর সিহোর থেকে এক শাখা লাইন বেরিয়েছে পলিতানা পর্যন্ত। পলিতানাতেই শত্রুঞ্জয় পাহাড়। ছায়াশীতল পথ ধরে মাইল দেড়েক যেতে হয়। পাহাড়ের পাদদেশে একটি হাতির মূর্তি। হিন্দু মন্দিরও আছে হিঙ্গলাজ মাতার।

এই সময় আমরা চায়ের গেলাস পেলুম হাতে। ভদ্রলোক এক চুমুক চা মুখে নিয়ে বললেন: পলিতানা সৌরাষ্ট্রের একটি স্বাস্থ্য-নিবাসও বটে। আবু পাহাড়ের মতো তার আকর্ষণ নেই, কিন্তু অনেকের কাছেই এই জায়গাটি খুব প্রিয়। জৈনদের কাছে তো এর চেয়ে জনপ্রিয় জায়গা আর নেই। সারা ভারতবর্ষ থেকে জৈনরা এখানে আসে। শুধু হাওয়া বদলের জন্য নয়, আসে তীর্থ মহিমার

টানে। নাগার্জুনের গুরু ছিলেন পদলিপ্ত বা পলিত্ত। গুরু পলিত্তের নামেই এই পলিতানার পত্তন করেছিলেন নাগার্জুন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: নাগার্জুন তো বৌদ্ধ ছিলেন!

ভদ্রলোক বললেন: তা জানি নে। জৈনদের কাছেই আমি এই গল্প শুনেছি।

তারপরে বললেন: শুনে আশ্চর্য হবেন যে শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের উপরে কোন বাসস্থান নেই, কোন যাত্রীকেই সেখানে রাত্রিবাস করতে দেওয়া হয় না। যাত্রীরা থাকেন পাহাড়ের নিচে ধর্মশালায়। পলিতানায় অনেক ধর্মশালা আছে, জৈন মন্দিরও আছে অনেক। প্রত্যেকটি ধর্মশালার সঙ্গেই এক একটি মন্দির।

শত্রুঞ্জয় খুব প্রাচীন তীর্থ সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন বিখ্যাত তীর্থে পরিণত হবার কারণ বোধ হয় খুব হৃদয়গ্রাহী নয়। কোন তীর্থঙ্করের জন্মস্থান নয়, কোনও তীর্থঙ্করও এখানে নির্বাণ লাভ করেন নি। প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভদেব এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। একাধিকবার এসেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর প্রথম শিষ্য ও গণধর পুণ্ডরীক এখানে দীর্ঘকাল তপস্যা করেন এবং এইখানেই তিনি নির্বাণ লাভ করেন। তপস্যার উপযুক্ত স্থান বলে আরও অনেক জৈন মহাত্মা এই পাহাড়ে শেষ জীবন কাটিয়েছেন। এমনি করে শত্রুঞ্জয় একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছে।

ইক্ষ্বাকু বংশ ভারতের প্রাচীনতম রাজবংশ। সূর্যের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর জন্ম সূর্যবংশে, তাঁর নামে ইক্ষ্বাকু বংশ। এই বংশেই জন্মেছেন মান্ধাতা নহুষ সগর রঘু রাম প্রভৃতি বিখ্যাত রাজারা। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে নাভিও ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা, ঋষভ তাঁর পুত্র। ঋষভের মায়ের নাম মেরু। ভাগবতে আছে ঋষভের জন্ম হয়েছিল কৈবল্যোপশিক্ষণার্থ, মানে কৈবল্য বা মোক্ষমার্গের শিক্ষা দেবার জন্য। কাজেই মনে হয় যে শ্রীমদ্ভাগবদোক্ত ঋষভদেবই জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ।

ভদ্রলোক চা খেলেন খানিকক্ষণ, তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন: আবু পাহাড়ে দিলওয়ারা মন্দির দেখেছেন তো!

মামা বললেন: দেখেছি।

সে রকম মন্দির একটিও নেই। কিন্তু তবু বলব, এ দিকে যখন এসেছেন তখন শত্রুঞ্জয় না দেখে ফিরবেন না। নিজের চোখে না দেখলে শত্রুঞ্জয় আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না।

আমি বললুম: সে যে বড় পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার!

কিন্তু তীর্থ দর্শনের জন্য পরিশ্রম তো করতেই হবে। সমস্ত জৈন তীর্থই এই রকম। সম্মেত-শিখর শত্রুঞ্জয় আবু অষ্টাপদ গির্ণার— সমস্তই পাহাড়ের উপর। ধোঁয়া ধুলো নেই। কলহ কোলাহল নেই, এমনি জায়গাতেই তো আমরা দেবতার কথা ভাবতে পারি।

সত্যি কথা।

ভদ্রলোক বললেন: এমন জনশূন্য নিস্তব্ধ পরিচ্ছন্ন তীর্থ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। কয়েকটি মন্দিরের সমষ্টি নয়, মন্দিরের এই শহরকে একটা স্বপ্নপুরী বলে মনে হবে। চারি দিকে শুভ্র মর্মরের সমারোহ। শুধু মূর্তি নয়, মন্দিরের অভ্যন্তরও শ্বেত পাথরের। এমন শান্ত সমাহিত নিস্তব্ধ যে পৃথিবীতে আছি বলে মনে হবে না।

দুর্গের মতো প্রাকার দিয়ে ঘেরা এই মন্দিরগুলো। বড় বড় দরজা আছে, সেই সব দরজা সন্ধ্যার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মন্দিরগুলির নির্মাণ শুরু হয়েছিল একাদশ শতাব্দী থেকে। তারপর মুসলমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য এগুলিকে দুর্গের মতো সংরক্ষিত করা হয়। কিন্তু তাতেও সব রক্ষা পায় নি, অধিকাংশ মন্দিরই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আজ আমরা যা দেখতে পাই, তা ষোড়শ শতাব্দীরও পরে নির্মিত। ধনী জৈনরা অকাতরে অর্থব্যয় করে শুধু জীর্ণ মন্দিরেরই সংস্কার করেন নি, নূতন মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন শূন্য স্থানে। প্রত্যেক জৈনই চান যে তাঁর পয়সায় একটি মন্দির বা কোন তীর্থঙ্করের চরণ প্রতিষ্ঠা হোক।

এমনি করেই এই মন্দির শহরটি গড়ে উঠেছে ও দিনে দিনে বাড়ছে। এক সময় এই পাহাড়ের গায়ে আর একটুও স্থান থাকবে না একটি চরণ প্রতিষ্ঠার।

শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে একটি নতুন কথা শোনা যায়। সে কথাটি হল টুঁক। একটি প্রধান মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি মন্দিরের সমষ্টিকে বলে টুঁক। এমনি টুঁক শত্রুঞ্জয় পাহাড়ে অনেক আছে। গোটা পাহাড়টাই এই রকমের অনেকগুলি টুঁকে বিভক্ত। চৌমুখ টুঁক বিমলবসি টুঁক খরতরবাসী টুঁক ইত্যাদি নাম। সব নাম মনে রাখতে পারি এমন স্মৃতিশক্তি আমার নেই। তবে প্রধান মন্দির-গুলির নাম মনে রাখা কঠিন নয়। চৌমুখ মন্দির আদিনাথ কুমারপাল বিমলশাহ সম্প্রীতি রাজার মন্দির। সবচেয়ে পবিত্র মন্দির আদিশ্বরের, সেখানে তাঁর মাতা মেরু দেবী ও প্রধান গণধর পুণ্ডরীকের মন্দিরও আছে। চৌমুখ মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। এর গর্ভগৃহে একটি বেদীর উপরে চারজন তীর্থঙ্করের মূর্তি চারি দিকে এমন ভাবে বসানো যে সব দিক থেকেই একজনকে মুখোমুখি দেখা যাবে। এই মন্দিরটিই সব চেয়ে বড়। পঁচিশ মাইল দূর থেকেও নাকি দেখা যায়।

চা খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু উঠতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল যে ভদ্রলোক আরও কিছু বলবেন। বললেনও: শত্রুঞ্জয় পাহাড় থেকে নেমে আসবার সময় মন আপনাদের এক অদ্ভুত ভাবনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে। পুরাকালের শ্রমণকণ্ঠের পঞ্চ নমোকার মন্ত্র ধ্বনিত হতে থাকে আপনাদের কানে—

নমো অরিহন্তাণং
নমো সিদ্ধাণং
নমো আয়রিয়াণং
নমো উবজ্ঝায়াণং
নমো লোএ সব্বসাহুণং।

মামা আমার দিকে তাকালেন, আমি তাকালুম ভদ্রলোকের দিকে। তিনি বললেন : মানে বুঝতে পারলেন না বুঝি ?

বললুম : এ ভাষা আমাদের জানা নেই।

ভদ্রলোক বললেন : অর্হৎকে নমস্কার করি, সিদ্ধকে নমস্কার করি, আচার্যকে নমস্কার করি, উপাধ্যায়কে নমস্কার করি, সংসারের সমস্ত সাধুদের নমস্কার করি।

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমরাও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার করলুম।

গাড়িতে উঠে আমরা স্টেশনের দিকে এগোলুম।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে মামা বললেন: দোকানদারের কাণ্ডটা দেখলে!

আমি মামার মুখের দিকে তাকালুম।

মামা বললেন: আমাদের দেশের দোকানদারকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো, চালডালের দাম ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না।

স্বাতি বলল: ও তো দোকানদার নয়!

নয় মানে!

ওকে গদিতে বসিয়ে দোকানদার কোথাও গিয়েছিল। সে ফিরে আসতেই ও উঠে পড়েছিল।

মামা বললেন: দোকানদারের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ওকে বসিয়ে রেখে যাবে কেন!

স্বাতি বলল: আমার মনে হয় যে ও এসেছে যাত্রীদের নিতে। যারা পাহাড়ে উঠেছে, তাদের নিয়ে ফিরবে।

আমি বললুম: সে যেই হোক, ধর্মে যে জৈন তাতে আমার সন্দেহ নেই। জৈন না হলে অত কথা বলতে পারত না।

মামা বললেন: তুমি ওকে জৈন ভাবছ! কিন্তু জৈনদের সম্বন্ধে ও একটা মন্তব্যও করে নি!

কোন মন্তব্য নয়, একটা প্রবাদ শুনিয়েছিল আমাদের।

সেই প্রবাদটি মনে করবার চেষ্টা করে স্বাতি বলল: বল তো গোপালদা। আমার মনে আসছে, কিন্তু মুখে আসছে না।

হেসে বললুম: জৈনমু চুনা মাঁ।

স্বাতি বলে উঠল: মনে পড়েছে এইবারে।

মামা বললেন: মানেটা বল তো আর একবার।

বললুম: জৈনরা খরচ করে মন্দির নির্মাণে।

মামা মাথা নেড়ে বললেন: কথাটা মিথ্যে নয়, কী বল!

মিথ্যা বলবার আর উপায় নেই। দিলওয়ারা দেখে এসেছি, জুনাগড়েরও খানিকটা পরিচয় পেলুম। ওদিকে পলিতানারও খবর পাওয়া গেছে। কাজেই নিঃশব্দে মামার কথা আমায় মেনে নিতে হল।

স্বাতি বলল: জৈনদের ধর্ম মতটা কী?

বললুম: কঠিন প্রশ্ন।

মামা বললেন: প্রশ্নটা কিন্তু খাঁটি।

বললুম: নিজের ধর্ম সম্বন্ধেই কিছু জানি নে, তাতে জৈন ধর্ম।

কৌতুকের সুরে স্বাতি বলল: বল কি গোপালদা, তুমি জান না এমন কথাও কিছু আছে নাকি!

তোমাকে বলবার মতো সামান্য কিছু জানা আছে।

মানে?

মানে বোকা বোঝানো জ্ঞান সর্বদাই সঞ্চয় করে রাখি।

মামা হাসলেন আমার কথার ধরনে। কিন্তু স্বাতি বলল: বোঝাও দেখি, তোমার বিদ্যের দৌড় আজ দেখব!

বাঁধানো রাস্তা দিয়ে টগবগ করে গাড়ি ছুটেছে। বললুম: দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় আমি তোমাকে মহাবীর বর্ধমানের কথা বলেছি। মনে আছে?

নির্বিকার ভাবে স্বাতি বলল: না।

মামা তাকে সমর্থন করে বললেন: তুমি গোড়া থেকেই বল।

বর্ধমান মহাবীর হলেন জৈনদের চতুর্বিংশতিতম তীর্থংকর। তার মানে তাঁর আগে আরও তেইশজন মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রচার করে গেছেন। তীর্থংকর শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। সংসার দুঃখ পার হবার ঘাট বা তীর্থ যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি হলেন তীর্থংকর। জৈন শাস্ত্র সংগ্রহে এই তীর্থংকরের নাম চব্বিশটি পাওয়া গেলেও ঐতিহাসিকেরা শুধু দুজনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। শেষ দুজনকে, পার্শ্ব ও মহাবীর।

পার্শ্ব মহাবীরের প্রায় আড়াইশো বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতকের প্রথম দিকে। তাঁর পিতা কাশীর রাজা অশ্বসেন ও মাতা বামা। বিবাহ করেছিলেন অযোধ্যার রাজকন্যা প্রভাবতীকে। তিনি গৃহত্যাগ করেন ত্রিশ বৎসর বয়সে ও তিন মাস কৃচ্ছ্র সাধনের পর কেবল-জ্ঞান বা সিদ্ধিলাভ করেন। পরবর্তী সত্তর বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করে মহাবীরের আবির্ভাবকে সহজ করে যান।

পার্শ্বনাথ চারটি ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিলেন —অহিংসা, সত্য, অদত্ত-বর্জন এবং অপরিগ্রহ। মানুষ জীব হিংসা করবে না, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না ও বিষয়সম্পত্তির প্রতি কোন আসক্তি রাখবে না। এর সঙ্গে মহাবীর আর একটি মাত্র ব্রত যোগ করেন—সেটি হল ব্রহ্মচর্য। পরবর্তী যুগে নাকি নিগ্রন্থ বা জৈন সম্প্রদায়ের সতর্ক হবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের মতে ব্রহ্মচর্য পার্শ্বের শিক্ষা, আর অপরিগ্রহ মহাবীরের। এই মতের প্রমাণ হল মহাবীরের বস্ত্র ত্যাগ, অপরিগ্রহের চূড়ান্ত আদর্শ।

মহাবীরও একজন ক্ষত্রিয় নায়কের পুত্র। এঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ আর মাতা ত্রিশলা ছিলেন রাজকন্যা। এঁদের বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে একটি জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়। এঁরা প্রায় সবাই উচ্চবংশসম্ভূত। মনে হয় যে ভক্তরা প্রভুর ত্যাগের মহিমা কীর্তনে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। অনুমান করা হয় যে খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশো চল্লিশ বৎসর পূর্বে বর্ধমান মহাবীর প্রাচীন বৈশালী নগরীর নিকট কুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বিষয়ে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রথমে তিনি এক ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসেন। কিন্তু দেবতাদের ইচ্ছায় তিনি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে যান। এ কাহিনীও যে ভক্তদের কল্পনার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। উদ্দেশ্য সাধু। মহাবীর যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের তুল্য ছিলেন, এই কথা প্রমাণের চেষ্টা।

শ্বেতাম্বর মতে মহাবীর বিবাহিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম যশোদা, আর কন্যা অনুজ্জা বা প্রিয়দর্শনা। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন এবং বারো বৎসর কঠোর তপস্যা করে কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। লোকে তাঁকে জিন বলে, তিনি জয়লাভ করেছিলেন। তাই তাঁর সম্প্রদায়ের নাম হয় জৈন।

মহাবীর পার্শ্বনাথের নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হলেও আজীবিক সম্প্রদায়ের কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়ে। গোশাল নামে এক গুরু তখন এই সম্প্রদায়ের চতুর্থ ও শেষ তীর্থংকর। ইনি নগ্ন থাকতেন এবং মহাবীর এঁর সঙ্গে ছয় বৎসর বাস করেন। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে এই কৃচ্ছ্র সাধনের আদর্শ মহাবীর গোশালের কাছে গ্রহণ করেছিলেন।

জৈন ধর্মের ভিত্তি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বহির্ভূত নয়। জৈনরা বেদের অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব জাতিভেদ ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। প্রকৃতি বা এই দৃশ্যমান জীবজগতের পিছনে কোন আত্যন্তিক সত্য নেই। পূর্ব জন্মের কর্মানুসারে জীবের দেহ মন হয় বটে, ভবিষ্যতের নিয়ন্তা সে নিজে। নিজের কর্মফলের জন্যই সংসারে তার দুঃখ ভোগ। মুক্তির জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। সর্বজীবে অহিংসা ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন যাপন এই তপস্যার প্রধান অঙ্গ। সাধনার পদ্ধতিতে জৈনরা চরমপন্থী। বিলাস ও বৈরাগ্যের কোন মধ্য পথ নেই, কৃচ্ছ্র সাধনা ছিদ্রহীন হবে।

জৈন মতকে সাতটি তত্ত্বে প্রকাশ করা যায়। জীব অজীব পুণ্য পাপ আস্রব বন্ধ সংবর নির্জরা ও মোক্ষ। দিগম্বর মতে পুণ্য ও পাপ সংবর ও আস্রবেরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তত্ত্বের সংখ্যা সাত, নয় বলবার কোন প্রয়োজন নেই।

এতক্ষণ স্বাতি নিঃশব্দে সব শুনছিল। এইবারে বাধা দিয়ে বলল: এবারে কি তুমি তত্ত্ব বোঝাতে শুরু করবে?

না। জানবার ইচ্ছা থাকলে বলব, শ্রীঅমূল্য সেনের জৈনধর্ম পড়। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের চটি বই, কিন্তু ভেতরে অমূল্য সম্পদ।

গম্ভীর ভাবে মামা বললেন : হুঁ।

আমি চুপ করে ছিলুম। তাই দেখে মামা বললেন : জৈন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তুমি কিছু বল নি।

বললুম : বেশি জানি নে। মহাবীরের মৃত্যুর পরে অনেক দল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুটি প্রধান সম্প্রদায় দাঁড়িয়ে গেল। দিগম্বররা নগ্নতার ও শ্বেতাম্বররা শ্বেত বস্ত্র পরিধানের পন্থী।

মামা জানতে চাইলেন : তাদের মতের প্রভেদ বলতে পার ?

বললুম : সংক্ষেপে চতুর্বিধ। দিগম্বর মতে মহাবীরের মূর্তি নগ্ন হবে ও জৈন সন্ন্যাসীকে দিগম্বর থাকতে হবে। মহাবীর কুমার ছিলেন এবং স্ত্রী-জাতি মোক্ষলাভের অধিকারী নয়।

মামা দেখতে না পেলেও স্বাতির দৃষ্টিতে আমি কৌতুক লক্ষ্য করলুম। বাহিরের গাম্ভীর্য দিয়ে ভিতরের কৌতুক বোধ সে চাপা দিতে পারে নি। মামা আমার চোখের দিকে চেয়ে না থাকলে আমি দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভৎর্সনা করতুম। বললুম : এ সব কথা তোমার ভাল লাগবে কেন! থিয়েটার সিনেমার কথা হত—

স্বাতি আর গম্ভীর থাকতে পারল না, হেসে উঠল খিলখিল করে।

আমি আশ্চর্য হলুম মামার কথায়। বললেন : হাসবার মতোই কথা বৈকি! মহাবীর কুমার ছিলেন না বিবাহিত, কাপড় পরতেন না নগ্ন থাকতেন, এই তর্ক নিয়ে একটা ধর্মের সম্প্রদায়!

এই মন্তব্যের উত্তর দেবার মতো ধর্মজ্ঞান আমার ছিল না। তাই অন্য কথা বললুম : জৈন সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

হাসি থামিয়ে স্বাতি বলল : আমরা শ্রোতা ভাল। বলতে না পারার দুঃখ তোমার রাখব না।

তার চোখের দৃষ্টি দেখলুম দুষ্টুমিতে ভরা। বললুম : একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে হিন্দু ধর্মের মতো তাদের সমস্ত ধর্ম পুস্তক শুধু সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে লেখা নয়, প্রায় সমস্ত প্রদেশের ভাষাতেই জৈন ধর্মের বই আছে। উত্তর ভারতের হিন্দী মারওয়াড়ী গুজরাতী ভাষাতে আছে, দক্ষিণের তামিল তেলুগু কানাড়া ভাষাতেও আছে। শুধু ধর্ম পুস্তক নয়, সব ভাষাতেই তাদের লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী আছে, আছে কথা সাহিত্য। কাব্য উপন্যাস গল্প উপাখ্যান ও জীবনীকে এরা বলে চম্পূ ধর্মকথা কথা কথানক ও প্রবন্ধ।

উপন্যাসকে এরা ধর্মকথা বলে!

এ কালের উপন্যাস তো নয় যে পড়লে ধর্ম নষ্ট হবে!

স্বাতি আপত্তি জানিয়ে বলল : এ তোমার গোঁড়ামি গোপালদা। এ যুগে জন্মেও তুমি নিজের যুগটাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে না!

মাঝে মাঝে আমিও তাই ভাবি। সব কিছুরই দুটো দিক আছে—ভাল আর মন্দ। অতীতের ভালটুকু দেখব আর বর্তমানের মন্দ, এ খুব অন্যায় কথা। ভালো মন্দয়:মিলিয়ে দেখতে হবে, জীবনকে ভালবাসতে হবে তার নগ্ন রূপে। কিন্তু স্বাতির কথার উত্তর দিলেন মামা, বললেন : এ যুগটা যে শ্রদ্ধার যোগ্য নয়!

আমি এ কথা বললে স্বাতি প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করত। কিন্তু মামার কথার উত্তরে আমাকে বলল : তুমি কী বল?

আমরা সাহিত্যের কথা বলছিলুম। যে সাহিত্য এক সময় এই দেশকে মহিমান্বিত করেছে, আজ সেই সাহিত্যই তাকে অধঃপাতের পথে ঠেলে দিচ্ছে। ভবিষ্যৎ যাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাঁরা ভাবছেন, আর কাঁদছেন। প্রতিবাদ করার সাহস তাঁদের নেই।

স্বাতি এ কথা মানল না। তার পুরনো কথারই পুনরুক্তি করল : এই তোমাদের দোষ। কোন কিছুর বিচারের সময় খানিকটা উদার হবার প্রয়োজন আছে।

মামা বললেন : এ সব তর্কের কথা বাদ দিয়ে তুমি অন্য কথা বল।

গাড়ির ভিতর থেকে বাহিরের রাস্তাটা একবার দেখে নিলুম। অনেকটা পথ আমরা অতিক্রম করে এসেছি। স্টেশনে পৌঁছতে নিশ্চয়ই আর বেশি দেরি নেই। বললুম : ধর্মের কথায় আরও দুটো সম্প্রদায়ের নাম মনে আসছে। কবীর সম্প্রদায় আর স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়।

স্বাতি হাতজোড় করে বলে উঠল : দোহাই তোমার গোপালদা। এখন আর নয়। তোমার দিগম্বর আর শ্বেতাম্বরকে হজম করতে আরও অনেক সময় লাগবে।

তা জানি। সৌরাষ্ট্রে যে আরও দুটো সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি আছে, সেই কথাটিই শুধু জানিয়ে রাখলুম।

মামা বললেন : পরে এক সময় বুঝিয়ে বোলো।

তা বলব।

স্বাতি বলল : জুনাগড় দেখা তাহলে শেষ হল!

তা এক রকম হল বৈকি।

হঠাৎ মামা বলে উঠলেন : বুঝলে গোপাল, দিল্লীতে একজন জুনাগড়ের নবাবের গল্প বলেছিল। রাজ্যটাকে পাকিস্তানে ফেলতে না পেরে যে নিজেই পাকিস্তানে পালিয়ে গেল, তারই একটা পাগলামির গল্প।

গল্পটা শোনবার জন্যে আমরা দুজনেই সচেতন হলুম।

মামা বললেন : ভদ্রলোক নাকি কুকুর-পাগল ছিলেন। রাজবাড়িতে কুকুরদের জন্যে ছিল একশোখানা ঘর। সে ঘর তোমার আমার ঘরের মতো নয়, রীতিমত এয়ার কণ্ডিশণ্ড্।

স্বাতি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ছিল মামার দিকে। বলে উঠল : সত্যি নাকি!

মাথা নেড়ে মামা বললেন : তাইতো শুনেছি। এক একটি কুকুর যত্ন-পেত এক একজন রাজকুমারের মতো। এক দিন রাগের মাথায় নবাব একটা কুকুরকে নাকি গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। তারপর কী দুঃখ! শেষ পর্যন্ত সেই কুকুরের কবরের ওপর স্মৃতিসৌধ তুলে দিলেন

স্বাতি বলল : অদ্ভুত কাণ্ড তো!

বললুম : পুরনো রাজা-রাজড়াদের এমন অনেক খেয়াল থাকত। যত সব বেয়াড়া ব্যাপার।

খুশী হয়ে মামা বললেন : আরও অনেক গল্প জানি। একদিন বলব তোমাদের।

গাড়ির গতি মন্থর হচ্ছিল। তাকিয়ে দেখলুম যে আমরা স্টেশনে এসে পড়েছি। মামা তাঁর ঘড়ি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। ট্রেনের এখনও অনেক দেরি আছে। বললেন : সকাল সকাল ফিরে এসে ভালই হল। একটু চা খেয়ে নেওয়া যাবে।

সে সঙ্গে যোগ করলেন : তারপর বাবা সোমনাথের দয়া। আজ রাতেই আমরা সোমনাথে পৌছব।

৩০

ভেরাবল স্টেশনে ট্রেন পৌঁছল রাত সাড়ে নটায়। আরও দেরিতে পৌঁছতে পারত। তাই রাস্তায় মামা ব্যস্ত হচ্ছিলেন থেকে থেকে। কোথায় আমরা রাত কাটাব তা ঠিক করা নেই। স্টেশনে রিটায়ারিং রুম নেই, স্বামীর প্রবৃত্তি নেই ধর্মশালায়। কাজেই হোটেল বা ডাকবাংলো। ভেরাবলে চলনসই হোটেল আছে বলে তো মনে হয় না। সোমনাথের মন্দির প্রভাস পত্তনে। এরা পাটন বলে। সে অনেক দূর।

গাড়ি থামতেই হালদারের গর্জন শুনতে পেলুম। বললেন: নামুন এইবারে।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামলুম।

ভদ্রলোক বললেন: ভাবতুম আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম।

এখন কি অন্য রকম ভাবছেন?

তা একটু ভাবছি বৈকি। অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পেয়েও যে দূরত্বটুকু বজায় রাখছেন, তাইতেই আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

কোন উত্তর না দিয়ে আমি মামার গাড়ির সামনে গেলুম। জিনিসপত্র নিয়ে তাঁরাও নামছিলেন। হালদারকে সামনে দেখে আজ মামা বিরক্ত হলেন না, বরং কিছু প্রসন্ন হলেন বলেই মনে হল। বললেন: এই যে, কী খবর?

হালদার সবিনয়ে নমস্কার করে বললেন: আপনার আশীর্বাদের জোর আছে।

কী রকম।

রাতের মতো একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

আমাদের জন্যে।

আমার আবার আশ্রয়ের কী দরকার। তাঁর পায়েই যখন ঠাঁই হল না—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না।

মামা বললেন : ধর্মশালায় নয় তো!

আজ্ঞে না। সে স্থান যে আপনাদের পছন্দ হবে না, তা আমার জানা আছে। তবে ডাকবাংলোতেও ঘর খালি নেই।

তবে কি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে জায়গা পেয়েছেন!

আমি জানতে চাইলুম।

এক গাল হেসে হালদার বললেন : সে একেবারে, কি বলে আপনাদের, সেই ঘরের মতো।

রিটায়ারিং রুমের মতো!

হেঁ-হেঁ করে হালদার বললেন : ও সব ইংরিজি কথা আমরা মুখে আনি না তো!

স্বাতি হাসছিল, বলল : কেন আনেন না?

গম্ভীর ভাবে হালদার বললেন : মুখে এ বি সি শুনলে বাবা প্রাশ্চিত্তির করাতেন।

স্বাতি হেসে উঠল। আর মামী গম্ভীর হলেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

কুলিরা সব মালপত্র মাথায় তুলেছিল। শুধু আদেশের অপেক্ষা। মামা বললেন : তবে ওয়েটিং রুমেই চল।

হালদার বললেন : পছন্দ না হয়, ডাকবাংলোতেও জায়গা পাওয়া যাবে। তবে রাত তিনটে পর্যন্ত জাগতে হবে।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : রাত তিনটে কেন? কেউ বুঝি রাতের গাড়িতে যাবেন?

হালদার হাসলেন রহস্যময় ভাবে। বললেন : ঘর খালি আছে, কিন্তু পাবার উপায় নেই।

মামা উৎফুল্ল হয়ে বললেন : খালি আছে! তবে তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হালদার নিম্ন স্বরে বললেন : হালদার যখন পারে নি, তখন সব চেষ্টাই বৃথা হবে।

জোরে জোরে বললেন : ডাকবাংলোর হাতে থাকলে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হত। এক রাজকুমার ঐ ঘর আগলাচ্ছেন।

মামা খানিকটা হতাশ হয়ে বললেন : রাজকুমার আবার ডাক-বাংলোয় কেন! একবার দেখ তো গোপাল।

ঘাড় নেড়ে হালদার বললেন : দেখা নিশ্চয়ই দরকার। ততক্ষণ আপনারা ওয়েটিং রুমেই বিশ্রাম করুন।

ওয়েটিং রুমটি ছোট হলেও শোবার উপযোগী ডিভান আছে দুখানা। বেতের ডিভান। ছারপোকা না থাকলে শুয়ে আরামই হবে। এরই একটার উপর একখানা রঙিন সুজনি বিছানো। মামার চোখ পড়তেই হালদার বললেন : ও আমার চাদর, আমি সরিয়ে নিচ্ছি।

বলেই চাদরখানা টেনে নিয়ে নিচের ঝোলার উপরে রাখলেন।

মামা বললেন : তারপর শোবার কী ব্যবস্থা হবে?

সেজন্যে ভাববেন না। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।

মামা আর ঘাঁটালেন না। অন্য কোন ব্যবস্থা যে সম্ভব নয়, তা তিনি নেমেই বুঝতে পেরেছেন। তবু বললেন : ডাকবাংলোটা এখান থেকে কত দূরে?

এই তো, এরই পিছনে। দেওয়ালে জানালা থাকলে এইখান থেকেই দেখতে পেতেন।

তারপরেই আমার দিকে চেয়ে বললেন : আসুন গোপালবাবু, আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখি।

চলুন।

বলেই আমি বেরিয়ে পড়লুম।

হালদার বললেন : ঘর পাবেন, সে আশা যেন করবেন না।

হালদারের ক্ষমতা তো আপনি দেখেছেন, হালদার অসাধ্য বললে সে কাজ শিবেরও অসাধ্য।

মামা বললেন : গোপালের অসাধ্য নাও হতে পারে। গোপালের তো অনেক ছলা কলা।

চলতে চলতে হালদার আমার মুখের দিকে তাকালেন এবং তার-পরেই হঠাৎ একটা দমকা হাসিতে ভেঙে পড়লেন। আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। বললুম : কী হল!

হালদার তাঁর হাসি সামলে কোন মতে বললেন : ঠিক আপনার জুড়িদার! শুধু বুদ্ধিতে কিছু খাটো বলে ঘর সাজিয়ে বসে আছে।

আপনি কি রাজকুমারের কথা বলছেন?

তা না হলে আবার কার কথা! কত শখ রে, বনের পাখির জন্যে তৈরি করেছেন সোনার খাঁচা!

আমি নিশ্চয়ই জানি, হালদার রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। এ তাঁর মৌলিক মন্তব্য। বললুম : ব্যাপারটা একটু সোজা কথায় বলুন তো!

হালদার একটা ভেংচি কেটে বললেন : কথা বলবারই সময় নেই, তার সোজা কথা।

বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা একটা বড় বাড়ির সামনে পৌঁছেছিলুম। বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল খানকয়েক ঘর পাশাপাশি ঝকমক করছে। হালদার হাঁক দিলেন : চৌকিদার!

চৌকিদার বোধ হয় কাছেই ছিল, সামনে এগিয়ে এল।

হালদার বললেন : রাজকুমার সাহেব কোথায়?

উত্তর এল পিছন থেকে। এক সুদর্শন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন : এই যে!

তিনি আসেন নি তো?

না।

আমি আগেই জানতুম। বোম্বায়ের মেয়ে, প্রভাসে আসবে কোন দুঃখে!

বম্বের মেয়ে তো নয়, বাড়ি তার এই দেশেই। এক সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি। বিলেতে স্ট্রীপ টিজ অ্যাক্ট দেখে'ছি পাশাপাশি বসে।

গোলমাল তো সেইখানেই। একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেছেন। বিয়ে করা বউই এক সঙ্গে থাকতে চায় না—

কথাটা তিনি অসম্পূর্ণ ই রাখলেন।

পূর্বাপর কিছুই আমি জানি নে, তবু জিজ্ঞাসা করলুম: এখানে কেন আসছেন?

সেইটেই বুঝতে পারি নি। লিখেছে, সোমনাথের কাছে মানৎ আছে, আর গরবা নাচ দেখবে। দুটোই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

কেন বলুন তো?

ধর্মে সে মেয়ের মতি কোন দিন দেখি নি। আর ক্যাবারে ব্যালের পর গরবা নাচ কি তার ভাল লাগবে!

স্বাতির কাছে শুনেছিলুম, মামী এখানে দিন কয়েক থাকবেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম: নাচ দেখাবার ব্যবস্থা কি করে ফেলেছেন?

কেন, আপনার দেখবার শখ আছে বুঝি?

লোকে বলে, গরবা ভারতের প্রাচীনতম নৃত্যের অন্যতম। দ্বাপরে কৃষ্ণ এ দেশে রাসনৃত্যের প্রচলন করেছিলেন। তাঁর পৌত্রবধূ উষা আসাম থেকে এনেছিলেন লাস্য নৃত্য গরবা। এখন শুনেছি গরবার পদ্ধতিতে রাস বা কৃষ্ণলীলা হয়। তাতে মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও যোগ দিতে পারে। এত দিন গরবা গানে শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলাই গীত হত। এখন নাকি আধুনিক কাহিনী নিয়েও গরবা গান লেখা হচ্ছে। দণ্ডিয়া রাসে ঘুঙুর-বাঁধা লাঠির ব্যবহার আছে শুনেছি।

বললুম: শখ আমার কিসে নেই!

আপনারা জয়পুরের কথক দেখেছেন? তারপরে গরবা আর ভাল লাগবে না। এ নাচে আবেগ আছে, লালিত্য আছে, এমন কি প্রাণশক্তির প্রাচুর্যও আছে। কিন্তু পায়ের কোন ভঙ্গি নেই। নাচে

পায়ের ভঙ্গিই তো আসল। আপনি এ দেশের কোলি মেয়েদের টিপ্পনি নাচ দেখুন।

এ নাম তো শুনি নি!

অভিজাত কিছু নয় বলেই শোনেন নি। টিপ্পনি মানে একটা লম্বা লাঠি, তার এক ধারে একখানি কাঠের খণ্ড। ছাদ পেটাবার সময় মেয়েরা দুরমুসের মতো ব্যবহার করে। উপরের মাথায় তারা ঘুঙুর বাঁধে আর ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে ছাদ পেটায়। কাজের সঙ্গে নাচ। আপনি তাদের ছন্দ ও তাল দেখে আশ্চর্য হবেন।

বললুম: বেশি পা ঠোকাঠুকির জন্যেই কথক আমার ভাল লাগে না। ভরত নাট্যেও কিছু লালিত্যের অভাব আছে বলে আমার মনে হয়। যেমন খেয়াল গানে।

রাজকুমার আর একটি ত্রুটির উল্লেখ করে বললেন: বড় এক-ঘেয়ে। ঘুরে ঘুরে একই ভঙ্গি, একই গান, একই সুর। খানিকক্ষণ শুনেই বিরক্ত বোধ করবেন।

খানিকক্ষণ দেখতে পেলেও জীবন সার্থক ভাবব।

পিছন থেকে হালদার আমায় একটা ঠেলা দিলেন। মনে হল, তিনি আমায় আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন। বললুম: যদি অপরাধ না নেন, তো একটা প্রশ্ন করি।

বলুন।

আপনি রাজকুমার। যিনি আসছেন তিনিও মনে হচ্ছে রাজকন্যা। কোন রাজপ্রাসাদে না উঠে এখানে কেন উঠছেন?

আশ্চর্য মনে হবেই তো! রাজকন্যা এখন সিনেমায় যোগ দিয়েছেন, সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে থাকবেন।

তাহলে তো আপনাদের ধর্মশালায় থাকা উচিত।

পিছন থেকে হালদার বলে উঠলেন: সাবাস গোপালবাবু, সাবাস!

উৎসাহ পেয়ে আমি বললুম: এই দেখুন না আমাদের। আমরা সাধারণ লোক, ধর্মশালায় যাবার জন্যে ছটফট করছি। অথচ

এ'র যজমানরা সেখানে যেতে পারছেন না। তাঁদের এইখানে আশ্রয় চাই।

রাজকুমার হঠাৎ আমার কথার উত্তর দিতে পারলেন না।

জোর পেয়ে আমি বললুম: আর একটা প্রশ্ন আছে।

বলুন।

আপনাদের দুজনের জন্যে একটি ঘরই তো যথেষ্ট। শুধু শুধু দুখানা ঘর কেন আটকে রেখেছেন?

উত্তরে রাজকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন! মনে হল যে তাঁর কোন বেদনার স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। তবু তিনি উত্তর দিতে বেশি দেরি করলেন না, বললেন: তার এখন অনেক বন্ধু, অনেক ভক্ত। একাও বোধ হয় আসবে না।

কেন জানি না, আমারও মনটা ভারাক্রান্ত হল। বললুম: তবে আপনার দায় কিসের!

দায়! যখন রাজ্য ছিল, তখন ভাবনা ছিল না। রাজকন্যাও রাজরাণী হবার লোভ ছেড়ে সিনেমার অভিনেত্রী হবার চেষ্টা করত না। রাজসুখ তো এখন সিনেমার রাজ্যে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

রাজকুমার বললেন: এই ছোট্ট সৌরাষ্ট্রে দুশো আঠারোটা দেশীয় রাজ্য ছিল। এই সমস্ত পরিবারের ছেলেরা এখন বেকার। এক ঝাঁক পায়রার ভেতর সরকার এক মুঠো চাল ছড়িয়ে দেন। তাতে ক'জনেরই পেট ভরে না। বলবারও কিছু নেই। কাজের মধ্যে আমরা জানি পোলো খেলতে, শিকার করতে, আর—

বাকিটুকু তিনি আর বললেন না।

হালদার রসভঙ্গ করে বললেন: ওঁদের তাহলে নিয়ে আসব?

গম্ভীর ভাবে রাজকুমার বললেন: আসুন।

হালদার আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে চলে গেলেন স্টেশনের দিকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : এর কোন প্রতিকার নেই ?

কী প্রতিকার আছে বলুন !

তাই তো !

রাজকুমার বললেন : তৈরি হবার জন্যে আমরা কোন সময় পাই নি। এই রকম অবস্থা হবে জানলে আগে ভাগে কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারতাম।

সর্দার প্যাটেলই তো এই কাজ করেছেন। তিনি এ দেশের লোক, সবই নিশ্চয় তাঁর জানা ছিল।

তিনি ভালই করেছেন। শুধু আগে থাকতে আমাদের সতর্ক করে দিলে আজ নিজেদের এমন অপদার্থ মনে হত না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম। তারপরেই শুনলুম হালদারের গলা। বললেন : গোঁসাইজী বিছানা বিছিয়ে ফেলেছেন। বললেন, কাল সকাল বেলায় দেখা যাবে।

রাজকুমারকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ফিরে এলুম।

হালদার বললেন : দেখলেন তো ?

বললুম, দেখলুম বৈকি !

হালদার থক করে কেশে খানিকটা থুথু ফেললেন মাটির উপরে। তারপর বললেন : একেই বলে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

আমি উত্তর দিলুম না।

জীবনে ভেড়া অনেক দেখেছি গোপালবাবু, ঠিক এমনটি কখনও দেখি নি। কোথাকার একটা নাচুনি মেয়ে আসবে তার ইয়ার দোস্ত সঙ্গে করে, আর এই ছোকরা একলা বসে তার জন্যে ঘর আগলাচ্ছে !

আপনি বুঝবেন না হালদার মশাই, এ সব বোঝবার বয়স আপনার পেরিয়ে গেছে।

তা গেছে বৈকি। তা না হলে তীর্থ করতে এসে মিথ্যে বলি!

স্টেশনের বারান্দায় আমরা উঠতে যাচ্ছিলুম। হালদার আমার হাত টেনে ধরে বললেন: দাঁড়ান একটু, কথা আছে।

আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

বুড়ি যদি আপনার টাকার কথা জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যাবেন।

কিসের টাকা।

লটারির মোটা একটা টাকা পেয়েছেন, সেই খবর দিয়েছি।

এ যে মিথ্যে কথা। এ কথা আপনি কেন বললেন।

এক ঢিলে দু পাখি মেরেছি। বুড়ো আমাকে সন্দেহ করছিলেন, কোন মতলব নিয়ে তাদের দেখাশুনো করছি। তাইতেই বললুম, খাতির করছি গোপালবাবুকে। এতে আপনারও মঙ্গল হবে মশাই, বুড়ির নজরটা পালটাবে।

গভীর ঘৃণায় বললুম: ছি ছি।

তা বলবেন বৈকি। উপকারটা আপনারই করলুম কিনা।

সত্যি কথাটা এখুনি আমি জানিয়ে দেব।

হালদার এবারে হেসে বললেন: তাতে আমার কথাটা ভাল করে প্রমাণ হবে।

কেন?

আপনি যে কারও কাছে স্বীকার করেন না, তাও আমি বলে রেখেছি।

অদ্ভুত মানুষ! ভদ্রলোক নিরন্তর তাঁর রূপ বদলাচ্ছেন। জোর করে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে বললুম: চলুন।

৩১

রাতে আমরা ওয়েটিং রুমেরই একটা কোণায় স্থান পেয়েছিলুম। ধন্য কালীকেষ্ট হালদার! রাতারাতি নিজেকে এই পরিবারভুক্ত করে ফেললেন। মামা মামীর ঘৃণার কথা আমি জানি। হালদার নিজেও এ কথা জানেন। তাই কিছুতেই এক সঙ্গে থাকতে চান নি। মামা বলেছিলেন, ডাকবাংলোতে একটা ঘর তো পাওয়া যাচ্ছে। আপনারা সেইখানেই থাকুন। আমি ভাড়া দেব।

হালদার জিভ কেটে বললেন: ছি ছি. অত্যাচারের একটা সীমা আছে তো!

এই সময়ে পাশের ওয়েটিং রুম থেকে দুজন ভদ্রলোক এলেন.। লেডিজ ওয়েটিং রুম। তাঁরা সপরিবারে সেখানে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কোন অসুবিধা নেই তো!

মামা ধন্যবাদ দিয়ে বললেন: কিছুমাত্র না।

একজন হেসে বললেন: জবর পেয়াদা পাঠিয়েছিলেন আপনি।

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন: কেমন!

ভদ্রলোক বললেন: আমরা দুজনে দুখানা ওয়েটিং রুম দখল করেছিলাম। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! আমরা রেলের লোক হয়ে হেরে গেলাম ওঁর কাছে! আর উনি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে এই প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমটা জবর দখল করলেন।

মামা অট্টহাস্য করে উঠলেন। আর হালদার ভেংচি কেটে বললেন: চেন না কিনা কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদারকে, তাই লড়াই করতে এসেছিলে!

ভদ্রলোক দুজনও হাসতে হাসতে সরে গেলেন।

আমি স্তম্ভিত হলুম মামীর কথা শুনে। বললেন: আপনিও থাকুন না এখানে।

আমি!

হালদার বিব্রত হলেন। এমন বিব্রত হতে তাঁকে কখনও দেখি নি। এ যেন তাঁর কল্পনার অতীত কোন ঘটনা। আমাদেরও স্বপ্নের অতীত। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম মামার মুখের দিকে। ঠিক এই মুহূর্তে মামাও বোধ হয় তাঁর ঘৃণার কথা ভুলে গেলেন। বললেন: বেশ তো, এখানেই একটু জায়গা করে নেওয়া যাবে।

মনের মিল থাকলে তেঁতুল পাতাতেও জায়গা হয়। কিন্তু সেই মনের মিলটা কখন হল জানি নে। হালদার তো বোকা নন, তিনিও বোধ হয় এই কথাই ভাবছিলেন। বোধ হয় এর কারণও কিছু অনুমান করতে পেরেছেন। বললেন: বাইরের বারান্দাটাও বেশ সুন্দর।

না না, বারান্দায় কেন! নিজের বয়সটা ভুললে কি চলে!

শেষ পর্যন্ত সবাই এক ঘরে রাত কাটালুম।

পরবর্তীকালে এ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে শুনেছি। স্টেশনের ঠিক সামনেই রিটায়ারিং রুম তৈরি হয়েছে। কিন্তু সোমনাথ দর্শনে এসে ভেরাবলে থাকবার আর প্রয়োজন নেই। নূতন মন্দিরের প্রাঙ্গণেই চমৎকার যাত্রীনিবাস নির্মিত হয়েছে। সমুদ্রের ধারে তার অপরিসীম আকর্ষণ। দ্বারকা থেকে সোমনাথে আর কেউ ট্রেনে আসছে না। বাস এসে দাঁড়াচ্ছে সেখানেই। আগে থেকে জানিয়ে রাখলে যাত্রীনিবাসে জায়গার কোন অভাব হয় না।

সকাল বেলায় হালদার আমাকে বললেন: আজকাল স্টেশনে কেন রাত কাটাই জানেন? সকাল বেলায় প্রাতঃকৃত্যটা ভাল হয়।

তারপর বিড়ির একটা কোণা কেটে বললেন: কলকাতায় আজকাল একটি জিনিসেরই সুবিধে।

তাঁর কথার ধরনে বুঝতে পারি নি যে তিনি কোন নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি। বললুম: সুবিধে কিসের?

হালদার জোরে জোরে বিড়িতে টান দিচ্ছিলেন, বললেন: ঐ যে বললুম।

আমি তখনও বুঝতে পারি নি দেখে বললেন: আরে মশাই, প্রাতঃকৃত্যের কথা। তা না হলে আর কী সুবিধে আছে কলকাতায়! চর্ব্য-চোষ্য খাবার গল্প তো ইতিহাস হয়েছে, চার বেলা খাবার কথাও ভুলেছে অনেকে।

খাবার সুখ আজ কোথায় আছে! এ তো উপবাসের যুগ।

বেরবার তাড়া আমাদের আজ ছিল না। সাত সকালে হালদার গিয়ে ডাকবাংলোর খবর এনেছেন। রাজকুমার আজ দুখানা ঘরই ছেড়ে দিচ্ছেন। দুপুরের সোমনাথ মেলে তিনি ফিরে যাবেন। আমরা দুখানা ঘরই পাব। একখানা ঘর তিনি এখনই ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। মামা বললেন: চা-টা খেয়েই যাওয়া যাক।

চা আসছিল।

স্বাতি বলল: এই সুযোগ গোপালদা। পুরাণ ইতিহাস যা শোনাতে চাও, এই বেলা শুনিয়ে দাও।

মামা হেসে বললেন: ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো! শোনবার ইচ্ছে আছে ষোল আনা, কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে মস্ত বাধা।

আমিও হেসে বললুম: বড় হলে এমন ছেলেমানুষি আর থাকবে না।

আমি ছেলেমানুষ

বড় হলে মামাবাবুর মতো বলতে, পুরাণের গল্প বল।

তোমার অহংকারে তাহলে সুড়সুড়ি দেওয়া হত।

মামা বললেন : তর্ক থাক, ওর শেষ নেই। তার চেয়ে প্রভাসের গল্প শুরু কর।

সময় নষ্ট না করে বললুম : ঋগ্বেদের একটি ভারি সুন্দর শ্লোকে সোমনাথের উল্লেখ রয়েছে।—

যত্র গঙ্গা চ যমুনা যত্র প্রাচী সরস্বতী।

যত্র সোমেশ্বরো দেবস্তত্র মামমৃতং কৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।

একই নিঃশ্বাসে বললুম : মানে বুঝেছ?

স্বাতি উত্তর দিল : না।

কিন্তু মামা বললেন : বুঝিয়ে বল।

যেখানে গঙ্গা যমুনা ও প্রাচী সরস্বতীর মিলন, আর যেখানে আছেন সোমেশ্বর দেব, সেইখানে আমাকে অমর কর। হে চন্দ্র, ইন্দ্রের জন্য তুমি অমৃত বর্ষণ কর।

ইন্দ্রের জন্য যদি অমৃত ঝরে, তাতে আমাদের কী?

আমাদের কিছু নয়! কত বড় একটা খবর আমরা পাচ্ছি! বৈদিক যুগেও যে সোমনাথ ছিলেন, তারই প্রমাণ পাচ্ছি এই শ্লোকে।

গঙ্গা যমুনা কোথায়?

প্রভাসে পৌঁছে ত্রিবেণী তোমায় দেখিয়ে দেব।

এ সব কথায় কান না দিয়ে মামা বললেন : শিবের পুজো যে অতি প্রাচীন, তার তো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সত্যিই তাই। সিন্ধু উপত্যকায় পাঁচ হাজার বছর আগেও শিবের পুজো হত। মহেঞ্জোদারোর মাটি খুঁড়ে সেই সত্য সম্প্রতি জানা গেছে।

এই সময় আমার স্কন্দপুরাণের গল্প মনে পড়ল। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত প্রভাসখণ্ডের গল্প। দক্ষ প্রজাপতির সাতাশটি মেয়ে ছিল। তাঁদের তিনি সোম বা চন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। এই মেয়েদেরই একজনের নাম রোহিণী। সব চেয়ে সুন্দরী তিনি। কাজেই সোম তাঁকেই বেশি ভালবাসেন। অন্য বোনেরা এই পক্ষপাতিত্বের জন্য

পিতার কাছে নালিশ করলেন। দক্ষ বললেন, এ সব চলবে না, সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বাস করতে হবে। প্রথমটায় সোম লক্ষ্মী ছেলের মতো রাজী হয়েছিলেন। পরে দেখলেন যে তা অসম্ভব, রোহিণী তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দক্ষ এই কথা জেনে ভয় দেখালেন, সাবধান, আবার গোলমাল করলে শাপ দেব। কিন্তু সোম তখন নাচার! দক্ষ শাপ দিলেন, তুমি ক্ষয় হবে। আর সোম সেই শাপ নিলেন মাথা পেতে।

আর যাবে কোথায়! সোম দিনে দিনে ক্ষয় হতে লাগলেন। অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রম, সবই ব্যর্থ হল। শেষে দেবতারাও ভয় পেলেন। তাঁরা গিয়ে দক্ষকে ধরলেন, তোমার শাপ ফিরিয়ে নাও। দক্ষ বললেন, নিতে পারি এক শর্তে—সব স্ত্রীকে সোম সমান চোখে দেখবে। যদি তা পারে, তবে সরস্বতী যেখানে সমুদ্রে মিলেছে সেই প্রভাস তীর্থে স্নান করে মহাদেবের পূজো করুক। ক্ষয় তাকে হতেই হবে, তবে সে মাসের পনর দিন। বাকি পনর দিন সে দিনে দিনে বেড়ে সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু সাবধান, আর কখনও যেন সে নারী ও ব্রাহ্মণকে হেয় জ্ঞান না করে।

সোম আর দেরি করলেন না। রোহিণীকে নিয়ে প্রভাসে নামলেন। তপস্যা করলেন বার হাজার বছর। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বাড়বার ক্ষমতা দিলেন, আর দিলেন প্রভা। সেই থেকে এই স্থানের নাম হল প্রভাস।

ব্রহ্মা বললেন, তোমরা শিবের মন্দির নির্মাণ কর। বলে মাটি ফাঁক করে দিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার। মাটির নিচে শিবের স্বয়ম্ভু স্পর্শলিঙ্গ। মুরগির ডিমের মতো ছোট, কিন্তু সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান্। নাগবলয় বেষ্টনে মধু ও দর্ভে তা আবৃত ছিল। তারই উপরে সোমনাথের বিরাট লিঙ্গ স্থাপনা করলেন ব্রহ্মা নিজে। বৈদিক মন্ত্রে তাঁর প্রথম পূজা হল।

গল্প শেষ করে বললুম: চাঁদ তাঁর দুর্বলতার প্রায়শ্চিত্ত করলেন,

মানুষ পেল মহাতীর্থ। স্বাতির কাছে আমরাও কিছু আশা করছি।

মামী স্নানের ঘরে ছিলেন, তাই এই রসিকতায় সাহস পেলুম।

আমার কী দুর্বলতা দেখলে ?

শুধু দুর্বলতা নয়, পক্ষপাতিত্বও দেখছি।

আমি যে মামার সামনে এমন কথা বলতে পারি, তা তার কল্পনার অতীত ছিল। কতকটা বিহ্বল চোখে চেয়ে থেকেই সামলে নিল। বলল : তা একটু আছে বৈকি। সংসারে তোমার জুড়ি তো কম আছে!

বললুম : এই ধর, জো রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে, একটু আগেও হালদার মশাইও এখানে ছিলেন—তাঁরাও কত কি গল্প শোনালেন। কিন্তু আমাকে নিয়েই তোমার নানা কৌতুক। কেন এই একচোখোমি বল তো ?

উল্লাসে মামা হেসে উঠলেন। স্বাতিও খানিকটা আরাম পেয়েছে দেখলুম।

বললুম : প্রভাসের উল্লেখ আছে মহাভারতের নানা স্থানে। পাণ্ডবেরা তীর্থ করতে এসেছিলেন, এসেছিলেন কৃষ্ণ বলরাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে এসেছিলেন পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়।

চট করে স্বাতি বলল : রামায়ণে কিছু নেই ?

এমন প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলুম না। কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে না, নামমাত্র উল্লেখ আছে কিনা, তাও বলতে পারি না। কিন্তু উত্তর দিলেই বিপদ। সে একটা মস্ত পরাজয়ের ব্যাপার হয়ে থাকবে। ঠিক এই সময়েই আমাকে রক্ষা করলেন কালীঘাটের হালদার। বাহির থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে খবর দিলেন যে প্রভাসে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। একখানা টাঙ্গায় যাওয়া অসম্ভব। সাত টাকায় দুখানা টাঙ্গা রফা করেছেন। ভাল্কা তীর্থ দেহোৎসর্গ ত্রিবেণী ঘাট সোমনাথের নূতন ও পুরাতন মন্দির এবং আশপাশের

আরও সব তীর্থস্থান দেখিয়ে দেবে। দুপুরের আহারের আগেই ফিরে আসা যাবে।

সহাস্যে মামা বললেন: গোপাল, ইনি দেখছি তোমারও এক ধাপ ওপরে!

তাড়াতাড়ি স্বাতি বলল: ও কথা বোলো না বাবা, গোপালদা দুঃখ পাবেন।

হেসে বললুম: আমি তিন টাকায় রফা করেছিলুম।

বলেন কি! সাড়ে তিন টাকায় নামাতে আমার প্রাণ একেবারে বেরিয়ে গেছে।

আমি তো নিজে চেষ্টা করি নি। আমি ধরেছিলুম রেলের এক ভদ্রলোককে। তাঁরা বোধ হয় আরও কম পয়সায় যান।

গম্ভীর ভাবে হালদার বললেন: তবে তো ঠকাই হল!

মামা রায় দিলেন: ঠিকই হয়েছে। তীর্থস্থানে গরীবকে দুটো পয়সা দিলে ধর্ম নষ্ট হবে না।

চা খেতে খেতে স্বাতি বলল: সোমনাথের ইতিহাস কিছু শোনাও নি গোপালদা, শুধু পুরাণের গল্পই শুনিয়েছ।

মামা বললেন: বছর কয়েক আগে একবার সোমনাথের কথা কাগজে পড়েছিলুম বলে মনে পড়ছে। সে বোধ হয় মন্দির স্থাপনের সময়।

বললুম: ১৯৫০ সালে। একান্ন সালের ১১ই মে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

মামা বললেন: সন তারিখ আমার মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে সোমনাথের গোটা সাতেক মন্দির ধ্বংসের কথা কাগজে পড়েছিলুম।

এ গল্প আমিও পড়েছি। সংক্ষেপে তাই সবাইকে শোনালুম।

প্রথম মন্দির বোধ হয় যীশুখ্রীষ্টের সময় তৈরি হয়েছিল। আর দ্বিতীয় মন্দিরের সময় বোধ হয় ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। তৃতীয় মন্দির তৈরি

হয় দেড়শো বছর পরে। দ্বিতীয় মন্দির আরবেরা ধ্বংস করে যায়, না তা নূতন করে গড়া হয়, আজ তা জানবার উপায় নেই। ইতিহাস বলে যে ভারতবর্ষের উপর আরবদের দৃষ্টি পড়ে ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে। তার তিন বছর পরে আরব সৈন্য ব্রোচ উজ্জয়িনী মালব মারয়াড় ও গুর্জর দেশের দিকে অগ্রসর হয়। তারা বল্লভী ও সৌরাষ্ট্রের রাজাকে পরাস্ত করে, ধ্বংস করে বল্লভীকে। সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দিরও যদি এই সময়েই ধ্বংস হয়ে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেঁকে চালুক্য রাজারা সৌরাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করেছেন। সোমনাথের উন্নতি হয়েছে তাঁদেরই আমলে। সুন্দর লাল পাথরে বেশ বড় মন্দির তাঁরা তৈরি করেছিলেন। অনহিলবাড়ার চালুক্য রাজা অনন্তদেব এসেছিলেন প্রভাসে সোমনাথের সেবায়। কনৌজের প্রতিহারদের সময় প্রভাস কাশীর চেয়েও পবিত্র তীর্থ বলে গণ্য হত। কিন্তু ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দের আটই জানুয়ারী সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগে গজনীর সুলতান মামুদ তার তুর্কী সৈন্য নিয়ে সোমনাথ আক্রমণ করেছিল। প্রবল বাধা দিয়েছিলেন মণ্ডলিক। তুর্কীরা শহরে ঢুকেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে নি। গুজরাটের রাজা ও অন্যান্য ভূস্বামীরা এসে পড়ায় তাদের হঠে যেতে হয়েছিল। হিন্দুদের জয়ের আশা যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তখনই মামুদের সাহস ও রণকৌশলে সোমনাথের পতন হল। পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় বীর এই মন্দির রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে তুর্কীরা দুর্গে প্রবেশ করল। শোনা যায় যে সোমনাথের সেবায়েৎরা তাদের ধনের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বলেছিল, সব নিয়ে যাও তোমরা, কিন্তু দেবতাকে ধ্বংস কোরো না। সোমনাথের ঐশ্বর্য ও শিল্প নৈপুণ্য দেখে মামুদ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলেছিল, না, মূর্তি বিক্রেতা হতে আমি চাই নে, ইতিহাসে আমার নাম থাক মূর্তির ধ্বংসকারী-রূপে। বলে নিজের

:ত সোমনাথের লিঙ্গমূর্তিটি ভেঙে ফেলেছিল। অমন সুন্দর মন্দিরও কবারে ধুলোয় মিলিয়ে দিয়েছিল তারা।

সোমনাথের এক সেবায়েৎ নাকি এই হিংসার প্রতিশোধ নেবার ষ্টা করেছিল। বিপুল ধনরত্ন নিয়ে মামুদ যখন দেশে ফিরছিল, সে ধন পথপ্রদর্শক সেজে চলেছিল সেনাবাহিনীর পুরোভাগে। াজপুতানার মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে চরম দুর্গতির মধ্যে ফেলেছিল বাইকে। দেশে ফিরবার আশা তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্য ক্ষা করেছিল সুলতান মামুদকে।

বেশি দিন নয়, কয়েক বছরের মধ্যেই সোমনাথের চতুর্থ মন্দির তরি হয়ে গেল। অনহিলবাড়ার চালুক্য রাজাদের তখন অনেক ক্ষমতা। হয়তো তাঁরাই তৈরি করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মন্দিরের কথা লিখেছেন জৈন-উল আকবর। আল বীরুনিও এ সম্বন্ধে লিখেছেন। কুমার পালের দাক্ষিণ্যে পঞ্চম মন্দির তৈরি হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে। সে এক বিরাট ব্যাপার। শুধু তো মন্দির নয়, মন্দিরের সঙ্গে যেন একটা শহর তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবার ধ্বংসের লীলা। আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি এসে সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে গেল। মন্দির রক্ষার চেষ্টায় অগণিত হিন্দু বীর অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু অনিবার্যকে তারা ঠেকাতে পারে নি। এ হল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমের ঘটনা। কিন্তু অল্প দিন পরেই জুনাগড়ের রাজা মহীপাল আবার নূতন মন্দির তৈরি করলেন।

এই নূতন মন্দির আর মূর্তি ছিল একশো বছরের কিছু বেশি। তারপর মামুদ বেগ্‌দা মূর্তিকে সরিয়ে মন্দিরটাকে মসজিদে পরিণত করলেন। আবার সংস্কার। বোধ হয় তা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাণী অহল্যা বাঈ নূতন মন্দির করে দিলেন পুরাতন মন্দিরের কাছে। আজও সে মন্দির আছে। সেই মন্দিরে সোমনাথের নিত্য পূজা হচ্ছে। পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর নূতন

মন্দির তো এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কয়েক বছর আগে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ আমরা দুটো মন্দিরই দেখব। প্রভাস পত্তনে আরও অনেক পুণ্যস্থান আছে। তাও আমরা দেখব। হালদার টাঙ্গা ঠিক করে রেখেছেন।

স্নান সেরে মামী কখন বেরিয়েছিলেন দেখতে পাই নি। তাড়া দিয়ে বললেন: তোমরা কি বেরবে না?

তৎপর ভাবে মামা বললেন: তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করে আছি।

সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পরতে মামী বললেন: কে যে কার জন্যে অপেক্ষা করছে, তা তো বুঝতে পারছি না।

উঠে দাঁড়িয়ে মামা বললেন: তা বোঝবারও দরকার নেই।

এ সব কথা শুনে শুনে আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আমরা তাতে যোগ না দিয়ে তৈরি হতে লেগে গেলুম। হালদার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে যাবার আগে আমাদের মালপত্র ডাকবাংলোয় রেখে যেতে হবে।

৩২

পথে বেরিয়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে প্রভাস শুধু শিবেরই স্থান নয়, এ স্থান বৈষ্ণবদেরও পরম তীর্থ। দ্বারকার যাদবেরা খুনোখুনি করে মরল। দেহত্যাগের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম বেছে নিলেন প্রভাস তীর্থ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থান। এর চেয়ে পবিত্র স্থান এ দিকে আর নেই। জীবনের শেষ কয়েক দিন কৃষ্ণ এই স্থানে অতিবাহিত করেছেন। প্রভাস তাই মথুরা ও দ্বারকার মতোই বৈষ্ণবদেরও তীর্থ।

মহাভারতের গল্প আমরা ছেলেবেলায় পড়ি, বড় হয়ে ভুলে যাই। বড় হয়ে মহাভারত পড়বার রেওয়াজ বুঝি ভারত থেকে উঠে গেছে। নূতন করে গল্প বললে অনেক সময় নূতনই মনে হয়। ভালকা তীর্থে মামা আমাকে এই কথা বললেন।

ভালকা বা ভাললা তীর্থ ভেরাবল থেকে প্রভাসে যাবার পথে। গাড়িতে মামার সঙ্গে কথা হবার উপায় ছিল না। তিনি মামী ও স্বাতিকে নিয়ে একখানা টাঙ্গায় উঠেছিলেন। আর আমরা উঠেছিলুম আর একখানা টাঙ্গায়—আমি, হালদার আর রামখেলাওন। গাড়ি থেকে নেমে মামা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা নামতেই বললেন: বুঝলে গোপাল, এই সব স্থানে এলে নতুন করে মহাভারত পড়তে ইচ্ছে করে।

হালদার বললেন: আজ্ঞে তীর্থের ঐ তো মাহাত্ম্য।

একটি ছোট মন্দিরে কৃষ্ণের অদ্ভুত মূর্তি দেখা গেল। মাটির কৃষ্ণ একটি অশ্বত্থ গাছে হেলান দিয়ে আছেন, তাঁর একটি পায়ের পাতায় রক্তের দাগ। মামা বললেন: গল্পটা তোমার মনে আছে তো?

বললুম: আছে।

আছে তো বলছ না কেন!

হেসে বললুম: যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর কৃষ্ণ এসেছেন প্রভাস তীর্থে।

মাঝখান থেকে কেন শুরু করলে! গোড়া থেকেই বল না!

তাহলে মহাভারতের স্ত্রী পর্ব থেকে শুরু করতে হয়।

স্ত্রী পর্ব কেন, পুরুষ পর্ব থেকে শুরু করলেও আমাদের আপত্তি নেই। তুমি কী বল?

বলে মামা স্বাতির দিকে তাকালেন।

স্বাতি হেসে বলল: বল এইবারে।

বললুম: কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নায়িকা কৌরবমাতা গান্ধারী এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁর একশোটা ছেলে এই শ্মশানে হারিয়ে গেছে। আর কোন দিন তারা মা বলে ডাকবে না, আসবে না তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে। পাণ্ডবেরা প্রমাদ গুণছেন। এই মহীয়সী মহিলার মুখে যদি কোন অভিশাপ বাক্য উচ্চারিত হয়, তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর হবে। গান্ধারী অন্ধ ছিলেন না, কিন্তু স্বামীর সহধর্মিণী ছিলেন। স্বামীর দুঃখকে সমভাবে অনুভবের জন্য চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সেজেছিলেন। ধর্মের জয়গান করেছেন নিজের জীবন দিয়ে। এই তো কয়েক দিন আগে যখন দুর্যোধন এসেছিলেন মায়ের আশীর্বাদ নিতে, গান্ধারী তাঁকে জয়ী হও বলতে পারেন নি। বলেছেন, ধর্মের জয় হোক। শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হল। তাঁর চারি দিক ঘিরে কৌরব কুলনারী আজ কাঁদছে। আশঙ্কায় কৃষ্ণ পর্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে আছেন।

কিন্তু পাণ্ডদের তিনি অভিশাপ দিলেন না তারা তো অধর্ম করে নি। তিনি অভিশাপ দিলেন কৃষ্ণকে—তোমার ছলেই কুরুবংশ ধ্বংস হল, তোমার যদুবংশও তোমারই চোখের সামনে ধ্বংস হবে। আর আমার বধূদের মতো তোমার বধূরাও এমনি করে কাঁদবে। তারপর—

আমি মামীর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেলুম।

মামা বললেন : তারপর?

তার পরের কথা আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। বললুম : তারপর মৌষল পর্ব। যদুবংশের যুবকেরা এক দিন ঋষিদের অপমান করেছিলেন। বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ দ্বারকায় এলে যাদবেরা শাম্বকে কন্যা সাজিয়ে ঋষিদের জিজ্ঞাসা করেন, এর কী সন্তান হবে—পুত্র না কন্যা? মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দেন যে শাম্ব যে মুষল প্রসব করবে তারই আঘাতে যদুবংশ ধ্বংস হবে। পর দিনই শাম্ব লোহার মুষল প্রসব করল। ভয় পেয়ে সবাই ভাবল সেই মুষলটাকে নষ্ট করা দরকার। কাজেই ঘষে ঘষে সেটাকে ক্ষইয়ে তারা সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। কিন্তু ঋষিবাক্য মিথ্যা হবার নয়। সেই লোহার চূর্ণ থেকে নদীর জলে শর-বন গজাল। তারপর এক দিন তাদের মধ্যে কলহ শুরু হল। শেষ পর্যন্ত জল থেকে শর তুলে রীতিমতো যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেই যদুবংশ শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ সবই জানতেন। শুধু ঋষির শাপ নয়, গান্ধারীর অভিশাপও আছে। কাজেই কৃষ্ণ বলরাম সমস্ত যাদবদের নিয়ে আগেই এসেছিলেন এই প্রভাস তীর্থে। প্রভাসেই যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল।

মামী বললেন : বলরামের কী হল?

বললুম : ধ্যানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

স্বাতি বলল : কৃষ্ণও কেন তাই করলেন না?

তিনি যে মানুষের মতো মরতে চেয়েছিলেন। জীবন যাপনও করেছিলেন মানুষের মতো। শৈশবে ননী চুরি করেছিলেন, যৌবনে রাসলীলা। তারপর যুদ্ধ ও রাজনীতির খেলা, শেষে ধর্ম ও দর্শন।

মন্দির প্রাঙ্গণে এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে বাধা দিয়ে বললেন : এই দেখুন, এই গাছের নিচে কৃষ্ণজী বিশ্রাম করছিলেন। দূর থেকে জরা ব্যাধ ভাবল যে হরিণ চরছে। তখুনি বাণ নিক্ষেপ করল। আর সেই বাণ এসে কৃষ্ণজীর পায়ে লাগল।

বললুম : দুর্বাসার আশীর্বাদ ! ঋষিকে তিনি গরম পায়স খেতে দিয়েছিলেন, ঋষি তাঁকে বললেন নিজের গায়ে মাখ। কৃষ্ণ তাঁর সারা গায়ে মাখলেন, মাখলেন না শুধু পায়ে। সে ঋষিরই সম্মানের জন্য। দুর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন, তোমার দেহ দুর্ভেদ্য হবে। কিন্তু পায়ে পায়স মাখেন নি বলে সেখানটা সাধারণ মানুষের মতো দুর্বল রয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ এই গল্প বুঝলেন কিনা জানি না, বললেন : এখান থেকে আপনারা দেহোৎসর্গে যাবেন। সেখানে তাঁর দেহোৎসর্গের স্থান দেখতে পাবেন। ত্রিবেণীর ধারে তাঁর সংকার হয়েছিল। সেখানে বলদেবজীর গুহাও দেখতে পাবেন। এইবারে এই দিকে আসুন।

বলে আমাদের একটা জলাশয়ের কাছে নিয়ে এসে বললেন : এই কুণ্ডের নাম হল ভাল্‌কা কুণ্ড। দ্বাদশীর দিন যিনি এই কুণ্ডে স্নান করবেন, তাঁর অনেক পুণ্য। কাপড় গামছা আছে ?

বলে আমাদের দিকে তাকালেন।

বললুম : আজ তো দ্বাদশী নয়, আজ পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা !

স্বাতি চমকে উঠল।

মামী বললেন : আজ লক্ষ্মীপূজো !

উত্তর আমি স্বাতিকে দিলুম, বললুম : দেখলে তো, সত্যি কথাটা মানুষ ভুলেই থাকে। কেউ না বলে দিলে সেটা মনে পড়ে না। মামুলী লক্ষ্মীপুজো না হয়ে এ একটা বিরাট রহস্যের ব্যাপার হলে আমি অমর হয়ে যেতুম।

মামা হাসলেন আমার কথা শুনে। তারপর কুণ্ডের দিকে পিছন ফিরে বললেন : চল, এইবার অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

এর পর দেহোৎসর্গ। হিরণ্য নদীর তীরে ছায়াশীতল অপূর্ব রম্য

স্থান। নদীর ধারে এমন একটি নিরিবিলি নির্জন স্থান এমনিতেই ভাল লাগে, তাতে আবার কৃষ্ণের দেহরক্ষার স্মৃতি বিজড়িত। একদা বল্লভাচার্যও এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পুরশ্চরণ করেছিলেন সপ্তাহব্যাপী। এক ধারে তাঁর মন্দির আছে। তার নাম মহাপ্রভুজীর বৈঠক। আর এক ধারে আছে বলদেবজীর গুহা। কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এই স্থান থেকে পাতালে প্রবেশ করেছিলেন।

ত্রিবেণী ঘাটের পথে হালদার বললেন: সেকালের লোকের বুদ্ধিকে বলিহারি। সারা দেশেই ত্রিবেণী সঙ্গম।

বললুম: তাতে দোষ কী! তিন নদীর মিলন হলেই তা ত্রিবেণী হল।

এখানে তিন নদী কোথায়?

কেন থাকবে না! হিরণ্য নদী দেখে এলুম, তারই সঙ্গে মিলেছে কপিলা আর সরস্বতী।

হালদার একটা ভেংচি কাটলেন: হুঁ, ভারতবর্ষের সর্বত্র সরস্বতী নদী।

বললুম: দোষ কী! একই নাম যদি অনেক মানুষের থাকে, তো নদীরও না হয় থাকল!

এ সব নাম আমি কোথায় জানলুম, হালদার সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন না। আমিও বললুম না যে প্রভাস-ফেরৎ এক ভদ্রলোকের হাতে আমি সোমনাথের গাইড বই একখানা দেখেছি। তাতে আরও অনেক তীর্থের নাম আছে। শশিভূষণ মহাদেবের মন্দির। সেখানে নাকি সোম যজ্ঞ করেছিলেন। আর জরা ব্যাধ সেইখান থেকেই কৃষ্ণকে বাণ মেরেছিল।

শিবের মন্দির আরও আছে। রুদ্রেশ্বর মহাদেব আর বাণেশ্বর মহাদেব। বিষ্ণু আছেন দৈত্য সূদন। কালীও আছেন। অহল্যা বাঈ-

এর মন্দিরের কাছে মহাকালী মন্দির, আর ত্রিবেণী সঙ্গমের শ্মশান ঘাটের নিকট মহাকালিকা মন্দির।

ত্রিবেণীর তীরে পৌঁছে ভারি ভাল লাগল। ঝির ঝির করে সকালের হাওয়া বইছে। রৌদ্রের উত্তাপ একেবারে বাড়ে নি। কয়েকজন যাত্রী ঘাটে স্নান করছিল। তাদের মধ্যে মেয়েও আছে। স্নান সেরে তারা মহাকালীর পূজো করবে।

মামা বললেন: কতটা দেখা হল?

বললুম: সোমনাথ দর্শনই তো বাকি আছে।

মামা বললেন: তোমার মামী এখানে দিন তিনেক থাকবেন। রোজই কি আমরা সোমনাথ দর্শন করব?

বললুম: দূরে যাবারও জায়গা আছে। প্রাচী এখান থেকে তের মাইল দূরে। সেখানে আছে মোক্ষ পিপলা। মানে অশ্বত্থ গাছ। কৃষ্ণ নাকি তাঁর পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য এই অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় জল দিয়েছিলেন। কাজেই ত্রিবেণীতে স্নান করে যাত্রীরা দৌড়ন প্রাচীতে।

মামা বোধ হয় এই টাঙ্গায় চড়ে তের মাইল রাস্তা যেতে ভয় পেলেন। বললেন: আমাদেরও কি সেখানে নিয়ে যাবে নাকি?

তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি হাসলুম।

মামা বললেন: হাসছ যে!

বললুম: আপনার ইচ্ছে হলে যাবেন, না হলে যাবেন না। আমি কেন জোর করে যেতে বলব!

উত্তর শুনে মামা খুশী হলেন না। বললেন: যাবার মতো জায়গা হলে যেতে বলবে বৈকি।

কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি হালদারের আচরণে। আমার কাছে ভদ্রলোক সব কথাতেই কঠিন মন্তব্য করেন। কিন্তু মামার সামনে একটিও কথা বলছেন না। নিঃশব্দে তিনি এখন শুনেই যাচ্ছেন।

আমি আরও আশ্চর্য হলুম মামার কাণ্ড দেখে। উত্তরের জন্য তিনি হালদারের দিকে তাকালেন।

হালদার কথা কইলেন এই ইঙ্গিতটুকু পেয়ে। বললেন: বাবা সোমনাথের মাথায় জল দিয়ে যার পুণ্যি হবে না, তার হবে গাছের গোড়ায় জল দিয়ে!

বললুম: পিতৃপুরুষের ব্যাপার কিনা!

হালদার বললেন: পিতৃপুরুষকে তো পুষ্করেই উদ্ধার করা গেছে। মোক্ষ পিপলা আমার মাথায় থাক।

মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন: যুক্তিটা মন্দ নয়, বুঝলে গোপাল। বরং শহরের ভেতর যদি কিছু থাকে, তাই দেখাও।

বললুম: ভেরাবল শহরটি ভাল শুনেছি। বন্দরটিও ভাল। সমুদ্রের তীরে জুনাগড়ের রাজবাড়ি পিয়ার জেটি কাস্টমস ও পোর্ট কমিশনার অফিস। বন্দরের প্রাচীরের উপর থেকে সমুদ্রে সূর্যাস্ত নাকি দেখবার মতো।

এ সব কথা মামার ভাল লাগছিল না। তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। মামা বললেন: এবারে কোথায়?

বললুম: সূর্য মন্দির।

এখান থেকে সূর্য মন্দির খুবই কাছে। রাস্তার ধারে টাঙ্গা রেখে পায়ে চলা পথে আমরা এগিয়ে গেলুম।

মামা বললেন: ভারতবর্ষে এক সময় সূর্য পূজার ঘটা ছিল।

বললুম: সূর্য পূজা হল প্রাগৈতিহাসিক। সভ্যতার বিকাশ হবার আগে থেকেই মানুষ সূর্যের পূজা করছে। সকালে উঠে আজও আমরা সূর্যকে প্রণাম করি।

হাত জোড় করে হালদার বললেন:

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

মামা বললেন: কোনারকের সূর্য মন্দিরই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ।

বললুম: সূর্যের মন্দির কাশ্মীরে ছিল, মথেরায় ছিল। এখানেও দেখছি।

এও পরিত্যক্ত মন্দির। জীর্ণ অনাদৃত। মন্দিরের ভিতর কোন মূর্তি দেখা গেল না। কোনারকের মতো শিল্পসৌন্দর্যেরও পরিচয় নেই। হঠাৎ আমার শিলাদিত্যের গল্প মনে পড়ল। ছেলেবেলায় পড়া প্রিয় গল্প। বল্লভীপুরে একটি সুন্দর মন্দির ছিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একা সেই মন্দিরে সূর্যের পূজার্চনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে একজন বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা এসে এই মন্দিরের ভার নিলেন। নিঃসঙ্গ জীবন। কিন্তু সূর্যের বরে সেই কন্যা একটি পুত্র ও কন্যা লাভ করলেন। ছেলেটি যেমন সুন্দর তেমনি সাহসী। অন্যান্য ছেলেরা তাকে তাদের খেলার রাজা বলে মেনে নিল। কিন্তু একজন তাকে তার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করল। সে তার পিতাকে জানে না। মাও প্রমাদ গণলেন। তাঁর মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা, যেদিন তিনি ব্রাহ্মণ-দত্ত সূর্য মন্ত্র উচ্চারণ করে সূর্যের দর্শন পেয়েছিলেন। আর একবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ করলেই তাঁর অনিবার্য মৃত্যু। সেই মন্ত্রের নিয়মই এই। কিন্তু কলঙ্ক মোচনের জন্য আবার তাঁকে সূর্যকে আহ্বান করে আত্মবলি দিতে হল।

সূর্য তাঁর বরপুত্রকে আদিত্য শিলা দিলেন। মারণাস্ত্র। যার উপর পড়বে, তার মৃত্যু নিশ্চিত। আর দিলেন সপ্তাশ্বরথ। মন্দিরের নিকটে যে সূর্যকুণ্ড, সেই কুণ্ডে রথ থাকবে। প্রয়োজনের সময় ডাকলেই সেই অজেয় রথ উঠে আসবে। আদিত্য শিলা পেয়ে তার নাম হল শিলাদিত্য।

শিলাদিত্য দিগ্বিজয় করে বল্লভীপুরের রাজা হলেন। বিয়ে করলেন। কিন্তু বিয়ের রাত্রে শুনতে পেলেন বোনের কান্না। বোন ছিল মায়ের সূর্য মন্দিরে।

শিলাদিত্য আর দেরি করলেন না। প্রত্যুষেই রথে চড়ে সূর্য মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখলেন সেই বিরাট সূর্য মূর্তির সঙ্গে মন্দিরের আধখানা অংশ মাটির নিচে বসে গেছে। তাঁর বোনের কোন চিহ্ন নেই। দরজা খুলতেই এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে পালিয়ে গেল।

আজ আমরাও সূর্য মন্দিরের অন্য কিছু দেখতে পেলুম না।

গল্প শুনে স্বাতি বলল : শিলাদিত্যের কী হল ?

বললুম : ভারতের সর্বত্র যা হয়েছে, এখানেও তাই হল। বিশ্বাস-ঘাতকতা। পারদ নামে এক বিদেশী যবন দল এসেছিল শিলাদিত্যের রাজ্যলোভে। তাঁর এক মন্ত্রী রাজার শক্তির উৎস জানত। সামান্য লাভের লোভে সেই সূর্য কুণ্ডের জল গোরক্তে অপবিত্র করে দিল। সেদিন আর শিলাদিত্যের ডাকে সপ্তাশ্বরথ উঠল না। সূর্যের আশীর্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন চিরদিনের মতো। যুদ্ধে শিলাদিত্যের মৃত্যু হল।

স্বাতি বলল : এ কি রূপকথা, না সত্যি গল্প ?

বললুম : সে কথা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু জানি যে শিলাদিত্যের ছেলের নাম গোহ। তিনিই মেবারের গুহিলোট বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

টাঙ্গায় উঠবার সময় মামা বললেন : টড সাহেবের ইতিহাসে রূপকথার মতো অনেক গল্প আছে।

আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

৩৩

পথে আমরা একটা পুরনো গড়ের ভাঙা প্রাচীর দেখেছিলুম। অনেকটা জায়গা ঘিরে এই প্রাচীর, কিন্তু ভিতরে কিছু দ্রষ্টব্য নেই। ইতিহাসে আমি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পড়ি নি। স্বাতি পাশে থাকলে বিপদে পড়তুম। কিন্তু হালদারকে নিয়ে অন্য বিপদ। বললেন : ভায়া, এই যুগটা কিসের জানেন তো ?

আমি উত্তর দিলুম না। হালদারের তাতে কোন অসুবিধে হয় না। বললেন : জোচ্চুরির যুগ। যে যত লোক ঠকিয়ে লুটেপুটে খেতে পারে, সে তত কৃতী লোক। ভালমানুষ মানেই তো বোকা।

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন ?

হালদার বললেন : এই জন্যেই লোকে বলে, ভালমানুষ মানেই বোকা। আরে মশাই, আমি আপনার কথাই বলছি।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : আমি কাকে ঠকিয়ে লুটেপুটে খাব ?

হালদার একটা ভেংচি কেটে বললেন : তা কি আর পারবেন ! আপনার হাতের মোয়া অন্যে কেড়ে খাবে।

ভদ্রলোকের ইঙ্গিত এবারে স্পষ্ট হয়েছে। বললুম : মোয়াটা যে আমার হাতের নয় হালদার মশাই, হলে এত দিনে খেয়ে ফেলতুম।

হু।

বলে হালদার একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বললেন : নীতি-বাগীশ আমার বাবা ছিলেন, আর আপনাকে দেখছি।

আমার কৌতুক বোধ হল। বললুম : সে ভদ্রলোক কী অপরাধ করেছিলেন ?

হালদার বললেন : তিনি তাঁর নামের মর্যাদা রেখেছিলেন।

গাড়ির একটা কোণায় হেলান দিয়ে রামখেলাওন এতক্ষণ ঢুলছিল। এবারে দেখলুম জেগে উঠে বড় বড় চোখ মেলে আছে। হালদারের ভেংচির শব্দে বোধ হয় তার তন্দ্রা ছুটে গেছে।

এবারে হালদার তাঁর ভ্রূ কোঁচকালেন, বোধ হয় ভাবলেন কিছু। তারপর বললেন : তিনি আমার বিয়ে দেবেন। একটা কচি মেয়ে ঠিক করে এসেছেন। খবর পেয়ে আমি গিয়েছিলুম লুকিয়ে সেই মেয়ে দেখতে। আর বুড়ো সেই খবর পেয়ে আমার হাড় ভাঙতে বাকি রেখেছিলেন।

একটু থেমে বললেন : কিন্তু যা করে এসেছিলুম, তার তুলনায় মারটা এমন বেশি কিছু নয়।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে বললুম : কী করেছিলেন ?

হা হা করে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। গাড়িটা এমন বেয়াড়া ভাবে ঝেঁকে উঠল যে মনে হল, বুঝিবা ভেঙেই পড়বে। হাসি থামলে বললেন : বুড়ো সে খবর পেলে প্রাণেই মেরে ফেলতেন।

ঘটনাটা শোনবার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলুম।

হালদার বললেন : মেয়েটা বয়সে কচি হলে হবে কি, দেখতে ভালই ছিল।

বলেই থেমে গেলেন।

বললুম : আপনি কী করলেন ?

বেশ গম্ভীর গলায় হালদার বললেন : গাল দুটো টিপে দিয়েছিলুম।

বলে আবার সেই হাসি। হাসি থামলে বললেন : এ যুগে তো আপনারা অনেক বেশি এগিয়েছেন। পারবেন এমন সাহস দেখাতে ?

বললুম : যাদের সাহস আছে তারা ঢের বেশি দেখায়। যা আপনি এখনও পারবেন না। বাঙলা বই পড়েন না বুঝি !

হালদার এবারে বোকার মতো তাকালেন। বললেন: বলেন কী!

জোর পেয়ে আমি বললুম: এ যুগে আপনি সাহসের গর্ব করবেন না। এ যুগের মেয়েদের সাহসও আপনার চেয়ে অনেক বেশি।

চট করে হালদার এ কথা মেনে নিয়ে বললেন: তা বটে। আপনাদের দেখে বেলেল্লাপনার ব্যাপারটা আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

হালদারের মুখে এমন উত্তর আমি আশা করি নি। কিন্তু তিনি আমাকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে বললেন: দেখি, আপনাদের কী করতে পারি!

আর কিছু প্রশ্ন করবার আমি সময় পেলুম না। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে টাঙ্গাওয়ালা আমাদের নামতে বলল। পথে নেমে হালদার বললেন: এ কোথায় থামাল!

মামা মামীও নেমেছিলেন। মামা বললেন: বলছে, এই হল সোমনাথের পুরনো মন্দিরের পথ।

স্বাতি বলল: ভাঙা মন্দির তো!

টাঙ্গাওয়ালা বলল: ভাঙা মন্দির আর নেই। যেখানে নতুন মন্দির উঠছে, আমরা টাঙ্গা নিয়ে তারই সামনে অপেক্ষা করব।

মামা একটু চিন্তিত হয়ে বললেন: সেখানে পৌঁছতে পারবে তো গোপাল!

ভরসা দিয়ে হালদার বললেন: তা পারা যাবে।

টাঙ্গাওয়ালা বলল: এই মন্দিরের ব্রাহ্মণেরাই আপনাদের পৌঁছে দেবে।

সামনে কোন মন্দির দেখতে পেলুম না। আশেপাশেও না। তবু আমরা এগিয়ে গেলুম।

একজন টাঙ্গাওয়ালা বলে দিল: বাঁ হাতে মন্দিরের পথ।

সেই পথ ধরেই আমরা মন্দিরে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু এ কেমন সোমনাথের মন্দির! দেশজোড়া যাঁর নাম, তিনি থাকেন এইটুকু

একটা মন্দিরের ভিতর! একেবারে সাদাসিধে সাধারণ ব্যাপার। প্রাঙ্গণটিও সাধারণ। দেশের সর্বত্র যে এমন মন্দির অনেক আছে তাতে সন্দেহ নেই। সবাই যেন হতাশ হয়ে গেলুম।

হালদারই প্রথম কথা কইলেন। বললেন: বিশেষ সুবিধে মনে হচ্ছে না।

এটি আমারও মনের কথা। বললুম: কেন মনে হচ্ছে না বলুন তো!

হালদার বললেন: এত বড় একটা তীর্থস্থানে পাণ্ডা এসে এঁটুলির মতো ছেঁকে ধরল না, কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে!

তবু তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

আমি স্বাতিকে বললুম: ছবি নেবে না?

ছবি তোলবার উৎসাহ স্বাতির দেখলুম না। বলল, চল, আগে ঠাকুর দেখি।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আমরা মন্দিরের চত্বরে উঠলুম। শূন্য ঘর। বারান্দা দিয়ে ঘুরে অন্য ধারে আর একটি দরজা দেখা গেল। সেখান থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। মামী দাঁড়িয়েছিলেন দরজার বাহিরে। জিজ্ঞাসা করলুম: আপনি নামবেন না?

তিনি বললেন: আমি অন্য দিন নামব।

স্বাতি ডাকল: এস গোপালদা।

নিচে নেমে চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। ছোট্ট একটুখানি গর্ভগৃহের ভিতর বিশাল শিবলিঙ্গ। চারিধারের দেওয়ালে অন্য দেবদেবী। মেঝের উপরে পাথরের নন্দী। একজন তরুণ ব্রাহ্মণ পূজায় বসেছেন। আর হালদার দাঁড়িয়ে আছেন মামার পাশে। ভিতরে আর কোন লোক নেই।

ব্রাহ্মণ শিবের স্নান করালেন। তারপর পুজো করলেন। এরই মধ্যে দু একজন বয়স্কা মহিলা এলেন ও গেলেন। শিবের মাথায় একটু জল আর বেলপাতা দিয়ে গেলেন।

নিজের পূজা সমাপ্ত হলে সেই ব্রাহ্মণ মামাকে বললেন : বসুন।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম যে মন্ত্রচালিতের মতো মামা এসে তাঁর পাশে বসলেন। হালদারও এসে পাশে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ আচমনের জল দিলেন, ফুল বেলপাতা দিলেন। পূজা করাতে হল না, মামা নিজেই সেটুকু করলেন। স্বাতির সঙ্গে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিলুম। শিবের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে মন আমার কূলে কূলে ভরে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় দেখলুম যে হালদার বসে পড়েছেন। তিনি আরও খানিকক্ষণ সময় নিলেন।

বাইরের বারান্দায় মামী ব্রাহ্মণকে বললেন ভোগের ব্যবস্থা করতে।

ব্রাহ্মণ বললেন : সে আপনার ইচ্ছে।

মামা কত দিলেন জানি না। ব্রাহ্মণের পাশে মাটিতে বসলেন মন্ত্র পড়ে দক্ষিণা দিলেন তাঁর হাতে।

মামী বললেন : ভোগের প্রসাদ পাব না?

ব্রাহ্মণ মাথা নেড়ে বললেন : না। একটুখানি মিছরির প্রসাদ পেতে পারেন।

বলে খানিকটা মিছরি এনে দিলেন।

স্বাতি তখন মন্দিরের ছবি নিচ্ছে। এ হল ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ-এর তৈরি সোমনাথের মন্দির। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এরই নাম ছিল নূতন মন্দির। এখন এটা পুরাতন মন্দির। সমুদ্রের ধারে নূতন মন্দির তৈরি হচ্ছে। নূতন শিবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখান থেকে আমরা সেই নূতন মন্দির দেখতে যাব।

ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল যে পাশুপত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের সেবক। দ্বিতীয় শতাব্দে লকুলীশ ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। নর্মদা তীরে তাঁর জন্ম। কিন্তু পাশুপত দর্শনের প্রচার করেছেন প্রভাসে। এখানে তাঁর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পাশুপত সূত্রের সংখ্যা হল একশো আটষট্টি। পাঁচ ভাগে

বিভক্ত। ভগবানের আরাধনার প্রণালী ও তাঁর সাযুজ্যলাভের উপায় এই সব সূত্রে বলা হয়েছে।

নূতন মন্দিরে পৌঁছতে আমাদের কষ্ট হল না। একটা গলিপথে খানিকটা এগিয়ে প্রশস্ত মাঠ পাওয়া গেল। খানিকটা দূরেই নির্মীয়মাণ মন্দির। একতলা তৈরি শেষ হয়ে দোতলা উঠছে। বাঁশ ও খুঁটিতে জর্জরিত হয়ে আছে চারিদিকটা। স্বাতি আর এগোল না। বলল: আগে একখানা ছবি তুলে নিই।

ছবি তোলবার মতই দৃশ্য। সমুদ্র থেকেই যেন মন্দিরটা উঠছে। মন্দিরের পিছনে এবং দুধারে অনন্ত নীল জল। একটার পর আর একটা ঢেউ এসে মন্দিরের গায়ে আছড়ে পড়ছে কিনা, এখান থেকে তা দেখা যাচ্ছে না। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

মাটি ছেড়ে স্বাতি একটা বাঁধানো জায়গার উপরে উঠেছিল। বললুম: হল?

গম্ভীর ভাবে স্বাতি উত্তর দিল: দাঁড়াও।

মামা মামী এগিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে হালদার। পাণ্ডা নেই। যাত্রীও বিশেষ নেই। যাতায়াত করতে যাঁদের দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা হয়তো আমাদেরই মতো মন্দির দর্শনে এসেছেন।

স্বাতির ছবি তোলা হলে আমরাও মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। চলতে চলতে স্বাতি বলল: এবারের যাত্রা আমাদের বোধ হয় এইখানেই শেষ হল।

বললুম: আমাদের গল্পের শেষ হল কি?

গল্পের কি শেষ আছে!

তাহলে গল্প হল না। গল্প বলতে হলে একটা শেষ চাই।

শেষ না হলেও?

তা না হলে তোমার শ্রোতারা মানবে কেন!

স্বাতি বলল : বেশ, তাহলে গল্পের নায়িকাকেই মেরে ফেল।

সে তো গল্পের দুর্বলতা। যখন আর কোন উপায় থাকে না, তখন একজনকে মারতে হয়।

তবে নিরুদ্দেশে পাঠাও।

হেসে বললুম : শ্রোতারা তাহলে মারতে উঠবে।

সেই তো তোমার প্রাপ্য।

আর কিছু কি প্রাপ্য নেই ?

সবাই দূরে ছিলেন। তবু স্বাতি উত্তর দিল না। কটমট করে চাইল আমার মুখের দিকে।

গম্ভীর ভাবে বললুম : তার চেয়ে মিলন করিয়ে দিই, কী বল ?

ভৎর্সনার সুরে স্বাতি বলল : কেন মিথ্যে কথা বলবে ?

বললুম : তুমি যা বলেছ, তাও তো মিথ্যে।

উত্তর না দিয়ে স্বাতি অনেকখানি এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ থেকেই আমি হালদারকে বড় ব্যস্ত দেখছিলুম। একদল যাত্রীর সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে গল্প জমিয়েছেন। দলটি যে বাঙালী তাতে সন্দেহ নেই। মেয়ে পুরুষ দু দলেরই বেশবাস পরিচিত ধরনের। তার উপর হালদার যখন গল্প জমিয়েছেন, তখন ভাষা যে বাঙলা তা ধরে নেওয়া চলে।

আমরা আরও খানিকটা এগোতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। একেবারে নাটকীয় অভ্যর্থনা। একজন মহিলা যে রকম উচ্ছ্বসিত ভাবে আমাকে অভিনন্দন জানালেন তাতে হালদারের কৃতিত্বই প্রকাশ পায়। মামা মামী কাছে আছেন কিনা ভদ্রলোক ফিরে ফিরে দেখছিলেন এবং নিকটে মামীকে দেখে খুবই আশ্বস্ত হলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন : আজ আমাদের কী সৌভাগ্য—

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : কিসের সৌভাগ্য বলুন তো।

মহিলা বললেন : সৌভাগ্য না হলে কি আপনার দেখা পাই !

আমি হেসে ফেললুম তাঁর কথা শুনে।

কিন্তু মহিলাটি অপ্রতিভ হলেন না। বললেন : এ আপনার একটি বড় গুণ। অহংকার-মুক্ত হবার জন্যেও সাধনার প্রয়োজন।

পাশের এক ভদ্রলোক বললেন : Really so. It is difficult to remain dry when praises are showered.

খ্যাতির বর্ষণ শুরু হলে নিজেকে শুকনো রাখা কঠিনই বটে। কথাটি আমার ভাল লাগল। তবু উত্তর দিলুম : আপনারা ভুল করছেন।

মামী যে কিছুই বুঝতে পারছেন না তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম। খানিকক্ষণ বোঝবার চেষ্টা করে বললেন : ব্যাপারটা কী ?

উত্তর সেই মহিলাই দিলেন। বললেন : দেখুন তো, এঁর দেখা পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা নয় ! ইনি কিছুতেই তা স্বীকার করবেন না।

মামী আশ্চর্য হয়ে বললেন : ভাগ্যের কথা কেন ?

গোপালবাবুর দেখা পেয়ে গেলাম, এ ভাগ্যের কথা নয় ! কী অদ্ভুত সুন্দর এঁর লেখা !

আর একজন মহিলা বললেন : হাত থেকে বই নামাতে ইচ্ছে করে না !

মামী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন : গোপালের লেখা !

কেন, পড়েন নি আপনি ? প্রান্তিক, চাবুক—

গোপাল লেখে !

মামীর যেন বিস্ময়ের সীমা নেই।

বললুম : উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। আমার ভেতর কবিত্ব একেবারেই নেই।

হালদার এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবারে বাধা দিয়ে বললেন :

আপনি কেন এমন করেন বলুন তো! যোগ্য লোকের সমাদর মানুষ করেই থাকে।

কেন জানি নে আমার মনে হল যে এ সমস্তই হালদারের কারসাজি। তিনিই এই যাত্রীদের কাছে এই সব সংবাদ পরিবেশন করেছেন। বললেন: আপনিই বলুন!

বলে তাকালেন সেই ভদ্রলোকের দিকে। ইনি মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না। বললেন: আমাকে বিপদে ফেললেন। বাঙলা সাহিত্যের রসে আমি বঞ্চিত তবে গোপালবাবুর খ্যাতির কথা শুনেছি।

সে বোধ হয় এইখানে এবং হালদারের মুখে শুনেছেন। স্বাতি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প হাসছিল। সে হাসি যে মামীর দিকে তাকিয়ে, আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। কিন্তু চমকে উঠলুম সেই মহিলার তিরস্কারে। বললেন: তুমি কী গো! তোমাকে এত বই দিলাম, এত আলোচনা করলাম, সে সমস্তই সময় মতো ভুলে গেলে!

এত বই, এত আলোচনা! হাসবার মতোই কথা বটে! কিন্তু মহিলার স্বামী বেচারী হাসতে সাহস পেলেন না। জড়োসড়ো ভাবে বললেন: তাই বুঝি! আমি একেবারে ভুলে গেছি।

মহিলাটি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন: কোথায় উঠেছেন আপনি?

বললুম: ডাকবাংলোয়।

চমৎকার! আজ বিকেলে আমরা এক সঙ্গে চা খাব। আমরাও সেখানে আছি।

একটি দশ বারো বছরের বালক পাশে দাঁড়িয়ে গভীর ভাবে সমস্ত শুনছিল। উৎফুল্ল হয়ে বলল: আমি আপনার কাছে গল্প লেখা শিখব।

তুমি বুঝি গল্প লেখ?

বালকটি লজ্জা পেয়ে বলল: মা বলেন, গল্প হয় না।

আমি হেসে বললুম: মা কিছু জানেন না কিনা, তাই অমন কথা বলেন। এই দেখ না, আমি কিছুই লিখতে পারি নে, অথচ আমার সম্বন্ধে কত কী বলছেন!

আপনার বই আমাকে পড়তে দেবেন?

মা তাড়া দিয়ে বললেন: এখানে কেন, বাড়ি গিয়ে আমি তোমাকে দেব।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে বললেন: বিকেলে আবার দেখা হবে।

মহিলাটি বললেন: বিকেলে কেন. একটু পরেই দেখা হবে।

আমাদের মন্দির দেখা হয় নি বলে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। মামা ফিরেছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে টাঙ্গার দিকে গেলেন। সঙ্গে হালদার।

স্বাতি একটা কটাক্ষ করে বলল: ছাতিটা মাপব?

বললুম: ও আমার এমনিতেই ফুলো কিনা, তফাৎটা বুঝতে পারবে না।

তা সত্যি।

কিন্তু একটা কথা সত্যি নয়।

কী বল তো?

দৃঢ় স্বরে বললুম: ঐ মহিলা আমার কোনও লেখা পড়েন নি:

কী করে জানলে?

ওঁর স্বামী পুত্রের কথায়।

তবে বইএর নাম জানলেন কী করে?

হেসে বললুম: তার জন্যে সাময়িক পত্র আছে। আমার কথাই ধর না, নতুন বই কী বেরল তা জানবার জন্যে আমি একখানা সাময়িক পত্র রাখি। শুধুই বিজ্ঞাপনের জন্যে। বিষয়বস্তুর ওপর কিছুমাত্র লোভ নেই।

মাথা নেড়ে স্বাতি বলল: বিচিত্র নয়।

বিচিত্র মামীর আচরণ। বললুম: মামীমা কি আমার লেখার কথা জানেন না?

না।

একটু থেমে বলল: তোমার বই আমি কাউকে দেখাই নে।

কেন বল তো?

লেখক সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা ভাল নয়। ওঁরা ভাবেন যে যারা কোন কাজেরই যোগ্য নয় তারাই বসে বসে লেখে। একটা মাস্টার বা কেরানী হতে পারলেও তারা বর্তে যেত। বই লিখছ শুনলে মার ধারণা হত যে তোমার অধঃপতন হয়েছে। চাকরি ছাড়লে ভাববেন যে তুমি খেতে পাচ্ছ না।

বললুম: এ মামীমার কেন, বাঙলা দেশের অনেকেরই ধারণা। কিন্তু এখন আমি তোমার আচরণেই আশ্চর্য হচ্ছি। সত্য বলার সাহস কবে হারালে?

যেদিন থেকে—

কথাটা স্বাতি শেষ করল না। একটু অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলুম: যেদিন থেকে কী?

স্বাতি উত্তর দিল না।

যেদিন থেকে আপন ভাবছ?

স্বাতি এ কথারও উত্তর দিল না। কিন্তু আমি জানি যে এ তার দুর্বলতা। তার দুর্বল মনের পরিচয়। গরিব আত্মীয়ের পরিচয় দিতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে, বড় লোক হলে ফলাও করে অনেক কথা বলে। লেখক হিসেবে আমার প্রতিষ্ঠা থাকলে স্বাতি হয়তো তার বাপ মার কাছে আমার কথা লুকোত না। কিংবা সেই প্রতিষ্ঠার দিনের অপেক্ষা করে আছে। সেদিন কি আসবে!

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে বড় আশ্চর্য লাগল। মন্দির যেন ঠিক মন্দিরের মতো নয়। এ একটা সুন্দর ঘরের ভিতর ঠাকুর ঠাকুর খেলা। মন্দির এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। দোতলার সমান উঁচু

হয়েছে। উপরে ওঠা যায়। মাঝখানে প্রশস্ত জায়গা। সেই জায়গাটুকু পেরিয়ে সোমনাথের বিরাট লিঙ্গমূর্তি। দক্ষিণ ভারতের মতো কায়দা করে যাত্রীদের পথ রোধ করা হয়েছে। মূর্তির কাছে যাবার উপায় নেই। সেখানে শুধু পুরোহিত ব্রাহ্মণদেরই একচ্ছত্র অধিকার।

দূরে দাঁড়িয়ে আমরা ঠাকুর দেখছিলুম। হঠাৎ স্বাতি বলল: ঠাকুর বলে মনে হচ্ছে না।

একটু আগে সোমনাথের পুরাতন মন্দির দেখে এসেছি। কী অদ্ভুত সৌম্য পরিবেশ! কী গভীর আবেগ! চকচকে কালো পাথরখানা জড়িয়ে মনে হয়েছিল যে দেবতার স্পর্শ পাচ্ছি। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল যে জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। সত্যিই তো সার্থক। জীবনের পরম উপলব্ধিতেই তো দেবতার আবির্ভাব। বললুম: আমরা ঠাকুর করে নেব।

মানে?

মানে সোমনাথ স্বয়ম্ভু হতে পারেন, কিন্তু আমরা ঠাকুর বলে স্বীকার না করলে কি তিনি ঠাকুর হতে পারেন! শুনেছি এই শিবলিঙ্গটি এসেছে কাশী থেকে। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আমরা এঁকে জাপটে জড়িয়ে চোখের জলে মাথা ঠুকে এখনও ঠাকুর করি নি। এই শিবলিঙ্গটির ঠাকুর হতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

স্বাতি মেনে নিয়ে বলল: বোধ হয় তাই।

এক পাশে দানের বাক্স নিয়ে মন্দির ট্রাস্টের খাজাঞ্চি বসেছেন। মন্দির নির্মাণের চাঁদা এখনও উঠছে। ভদ্রলোক রসিদ কেটে পয়সা নিচ্ছেন। আমি একটি আধুলি দিয়ে রসিদ পেলুম।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: এ আবার কী?

বললুম: এ একটা সুযোগ। বলব, আমার পয়সায় সোমনাথের মন্দির হয়েছে। পার তুমি অস্বীকার করতে?

স্বাতি হেসে বলল : তোমার পয়সা এখনও ঐ বাক্সে রয়েছে।

বললুম : এক দিন ঐ বাক্স থেকে ছাদে উঠবে। নিচেটা তো অন্য লোকের পয়সায় হল, আমার পয়সায় চূড়ো হবে।

তবে আর কী! কিন্তু সাবধান, সকলের আগে কিন্তু চূড়োই ভাঙে।

ছি ছি, এমন অলক্ষুণে কথা বোলো না। গড়ার আগেই ভাঙার কথা কেন মনে আসছে!

ভাঙা গড়া এক সঙ্গে চলে কিনা!

ভাঙা গড়া এক সঙ্গে চলে, কিন্তু গড়া ভাঙা নয়। গড়া জিনিস দেখে ভেঙে পড়ার কথা আমরা ভাবি না, কিন্তু ভাঙা জিনিস দেখে নতুন করে গড়বার স্বপ্ন দেখি। যেমন আজ এখানে দেখছি। কদিন আগেই তো এখানে ভাঙা মন্দির ছিল, কদিন পরেই সে কথা সবাই ভুলে যাবে।

এবারে আমরা মন্দিরের কারুকার্য দেখতে লাগলুম। খুব সূক্ষ্ম কাজ কোথাও নেই। দক্ষিণ ভারতে বা আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরে শিল্পকর্মের যে নিদর্শন, এখানে তার পরিচয় নেই। তবে ভাবে গম্ভীর হবে, এমন আশা করা সঙ্গত।

বাম দিকের দরজা দিয়ে বাহিরে বেরিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। দূর থেকে সমুদ্র দেখেছিলুম দূরে। এবারে একেবারে চোখের সামনে উথলে উঠল। কী বিশাল জলরাশি, কী গভীর কলোচ্ছ্বাস! ঢেউএর পরে ঢেউ এসে পায়ের উপর আছড়ে পড়ছে। ফেনায় সাদা হয়ে যাচ্ছে সমস্ত বেলাভূমি। উচ্ছ্বসিত ভাবে স্বাতি বলল : ঠিক ধনুষ্কোডির মতো, তাই না গোপালদা?

চাঁদের আলোয় জলের ধারে গিয়ে বসলে ঠিক কন্যাকুমারী বলে মনে হবে।

অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : একটুও ভুল বলছি না।

সন্ধ্যেবেলায় কি এখানে একবার আসা যায় না গোপালদা ?

জানি নে।

কেন জান না ?

আমি একা আসতে পারি।

আমিও পারি।

একা পার না।

কেন ?

মামীমা রাজী হবেন না।

কন্যাকুমারীতে কি আমি বেরিয়ে আসি নি !

তখন ছেলেমানুষ ছিলে।

এখন কি বুড়ি হয়ে গেছি !

আজ সন্ধ্যেবেলায় তার বিচার হবে।

বেশ।

স্বাতি ফিরে দাঁড়াল। আমিও ফিরলুম। অনেকক্ষণ থেকে সবাই আমাদের অপেক্ষা করে আছেন।

নানা রকম অসুবিধার মধ্যেও সেই ভদ্রমহিলা চায়ের প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। তাঁর নাম মালতী সান্যাল। কলকাতায় মিস্টার সান্যালের লোহার কারবার। কাবুল ক্লাস সিক্সে পড়ে। আমাকে নিয়ে তাঁরা এমন মাতামাতি করলেন যে লজ্জাই করছিল। বড় বড় লেখকেরা কী রকম সম্মান পান জানি না। কাউকেই আমি চিনি নে। আমি যে সম্মান পেলুম, তার পরিমাণ নিশ্চয়ই প্রাপ্যের অতিরিক্ত। সেই কথাটি বলতে গিয়ে আরও লজ্জা পেলুম।

মামীর মুখের দিকে চেয়ে আমার কষ্ট হয়েছে। তিনি এই অপব্যয়ের অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শুধু আয়োজনের অপব্যয় নয়, পরিশ্রমের অপব্যয়ও বটে। নানা ভাবে মনোরঞ্জনের জন্য মালতী সান্যাল সত্যিই প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন।

হালদার এই পরিস্থিতিটি প্রাণ ভরে উপভোগ করেছিলেন। এক সময় বললেন: গোপালবাবু, এর পর কী করবেন?

বললুম: সোমনাথের আরতি দেখতে যাব।

মামীর পাশ থেকে স্বাতি বলে উঠল: চমৎকার প্রস্তাব। আমাকেও সঙ্গে নিও।

এক গাল হেসে হালদার বললেন: টাঙ্গা আমি বলে রেখেছি। সূর্যাস্তের আগেই আমাদের সমুদ্রের তীর পৌঁছে দেবে।

ক্লান্ত ভাবে মামা বললেন: আবার আমাদের বেরতে হবে!

মামী বললেন: নাইবা বেরলে।

মনে হল যে স্বাতির সম্বন্ধে মামীর যেন আর ভাবনা নেই। হালদার সঙ্গে আছেন, কিংবা গোপালকে আর ভয় নেই। এই দূর

দেশে গোপাল যখন আদর পাচ্ছে, তখন দেশে নিশ্চয়ই লোকে তাকে ছি ছি করবে না। গোপালের সম্বন্ধে এইটুকুই তো তাঁর ভয়!

হালদার বললেন: আমি যতক্ষণ সঙ্গে আছি, আপনাদের কিছু ভাবনা নেই।

কথাটা বোধ হয় মামীকেই শোনালেন। হয়তো ভেবেছিলেন যে এই আশ্বাসটুকু দেবার প্রয়োজন আছে।

মালতী সান্যাল বললেন: আমাদেরও আপনার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে।

বেশ তো চলুন না।

মিস্টার সান্যাল বললেন: ওঁদের আর জ্বালাতন কোরো না। একটু একা বেরতে দাও।

আমি বুঝি জ্বালাতন করছি!

আমি উত্তর দিলুম: জ্বালাতন কিসের! এই আদর যত্নকে কি জ্বালাতন বলে!

মালতী সান্যাল তাঁর স্বামীকে বললেন: শুনলে তো! সবাই তো তোমার মতো নয় যে সারাক্ষণ ভুল বুঝবে!

ভুল বোঝাবুঝির অভিযোগ সমস্ত স্বামী-স্ত্রীর। এ না হলে দাম্পত্য কলহ হয় না। আর কলহ না হলে জীবনটাই পানসে। মামা মামী উঠে পড়েছিলেন। এবারে হাসতে হাসতে আমরাও উঠে পড়লুম।

মামা মামী আমাদের সঙ্গে বেরলেন না। হালদার বেরলেন আমাদের অভিভাবক হয়ে। খাঁচার মতো গাড়ির ভিতর আমরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছি। চাকার ঘর্ঘর শব্দে আর ঝাঁকানিতে বিরক্তি বোধ হবার কথা। সেটুকু অনুমান করে হালদার তাঁর দাঁতের পাটি আকর্ণ বিস্তার করে হাসলেন। কী নোংরা দাঁত, কিন্তু আজ তাঁর হাসিটি নোংরা বলে মনে হল না। বললুম: হাসছেন যে!

হালদার গম্ভীর ভাবে বললেন: এই রকমই হয়।

কী রকম ?

এবার আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন : বুড়ির মন গলেছে।

অজগরের মতো ফিস্‌ফিসানি। আমি নিশ্চয়ই জানি যে সে কথা স্বাতির কানেও স্পষ্ট হয়ে পৌঁছেছে। বললুম : খুলে বলুন।

হালদার বললেন : এ কি খুলে বলবার জিনিস!

তা বটে।

টাঙ্গা থেকে নেমে হালদার আমাদের সঙ্গে এলেন না। বললেন : আপনারা এ কালের মানুষ, নতুন মানুষ। আপনারা এই নতুন মন্দির দেখুন।

আর আপনি ?

আমি যাই পুরনো মন্দিরে।

হালদার রসিক লোক তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করে পুরনো মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে তখন বিলম্ব অল্প। আর একটু পরেই আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠবে। তখন হয়তো সমুদ্রের তীরে আর মন টিকবে না। স্বাতি বলল : চল এই বেলা সমুদ্রের ধারে একটু বসি।

কথার উত্তর না দিয়ে আমি তার সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

সূর্যাস্ত হচ্ছে। তাই পশ্চিমের আকাশ এখন রঞ্জিত। প্রকৃতির বেশবিন্যাসের স্বাক্ষর নিঃশব্দে বহন করছে। স্বাতি বলল : সমুদ্রের ওপর সূর্যাস্ত মনে আর রঙ ধরায় না।

বললুম : মানুষের বেলাতেও তাই। পরিচয় যত নিবিড় হয়, প্রথম দেখার রঙ হয় তত ফিকে। শেষ পর্যন্ত—

আমি থেমে গিয়েছিলুম। কিন্তু স্বাতি বলল : শেষ পর্যন্ত কী!

হেসে বললুম : বিরক্তি।

ঠিক বলেছ। যেমন তোমার মুখ দেখলে আমার আজকাল রাগ হয়।

এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ হল না। পিছনে বড় রাস্তার উপর কোলাহল খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোলাহল ঠিক নয়, নারীর কলধ্বনি। সেদিকে তাকিয়ে স্বাতিও আশ্চর্য হল। বলল: এত মেয়ে কেন গোপালদা?

বলতে পারতুম যে এত চট্ করে রাগ ভুলে গেলে! কিন্তু আমিও কম বিস্মিত হই নি। তাই উত্তরটা আমার অন্য রকম হল। বললুম: খবর নাও না।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। ছোট বড নানা বয়সের মেয়ে ছড়িয়ে গোল হয়ে দাঁড়াতেই আমার গরবা নাচের কথা মনে পড়ল। পূর্বের দিগন্তে আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। নবরাত্রির গরবা দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। আজ বোধ হয় পূর্ণিমার গরবা দেখতে পাব। উল্লাসে মন আমার ময়ূরের মতো নেচে উঠল।

স্বাতি এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তার হাত ধরে পিছনে টেনে আনলুম। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

আমি তার এই হাসির অর্থ বুঝেছিলুম। তাই লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় বললুম: হাসলে যে!

উত্তরটা স্বাতি এড়িয়ে গেল। বলল: তবে কি কাঁদব!

এ দুয়ের মাঝে বুঝি কিছু নেই?

যা ছিল তা হারিয়ে গেছে।

বলে স্বাতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসি শুনে আমি চমকাই নি। চমকালুম হাততালির শব্দে। স্বাতিও চমকে চাইল রাস্তার দিকে। সমস্ত মেয়েরা এক সঙ্গে হাতে তালি দিয়ে উঠল। স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল, আর আমি তাকালুম তার মুখের দিকে। কিন্তু মেয়েরা থামল না, তারা তালি দিয়ে ঘুরতে লাগল অবিরত। তারই সঙ্গে গান:

তালিউঁ না তালে গোরি
গরবে ঘুমি গায় রে।
পূর্ণমণি রাত উগি
পূর্ণমণি রাত।

পূর্বের আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হচ্ছে। মেয়েরা নাচছে ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকারে। পায়ে পায়ে তারা পাশে ঝুঁকছে, কখনও এ পাশে, কখনও ও পাশে, তালি দিচ্ছে হাত তুলে, হাত নামিয়েও। নবরাত্রিতে নাকি গরবি পাত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ঘরে ঘরে। নানা চিত্র অঙ্কিত সেই গরবির ভিতর প্রদীপ জেলে মেয়েরা মাথায় নেয়। তারপর গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে নাচে, মিষ্টি খায়। এতগুলি মেয়েকে এক সঙ্গে আমরা গাইতে দেখি নি। সদর রাস্তার উপর নাচতেও দেখি নি। গভীর বিস্ময়ে আমরা হতবাক হয়ে গেলুম।

কিন্তু একই সুর, একই ভঙ্গি। খানিকক্ষণ দেখবার পর স্বাতি বলল: চল আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি।

বললুম: চল।

ধীরে ধীরে সমুদ্রের তীরে আমরা এগিয়ে গেলুম। বসলুম সাদা শুকনো বালির উপরে। এখান থেকে মেয়েদের গান আর শোনা যাচ্ছে না। সমুদ্রের দুরন্ত গর্জনে আর সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে। সবই যেন এখানে অবান্তর। পৃথিবীটারই বুঝি প্রয়োজন নেই। শুধু সমুদ্র আছে, আর আছি আমরা দুজনে।

অনেকক্ষণ আমরা কথা কইতে পারলুম না। জোরে জোরে বাতাস বইছে। আর চাঁদ উঠছে ধীরে ধীরে। পোড়া মাটির মতো লাল চাঁদ সূর্যের মতো উজ্জ্বল হচ্ছে। আমাদের মনও ভরে উঠছে।

এক সময় স্বাতি বলল: আর এক দিনের কথা মনে পড়ে?

কন্যাকুমারীর কথা?

কী করে বুঝলে বল তো?

হেসে বললুম : মন যে তোমার মেলে ধরেছ। বুকের ভেতর আর কিছু লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

স্বাতি তার বড় বড় চোখ আমার মুখের উপর তুলে ধরল। কিন্তু আমি আর কথা বলতে পারলুম না।

চোখ নামিয়ে স্বাতি বলল : তুমি বলেছিলে এই দিনগুলো তোমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে। বলেছিলে—

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।

বললুম : তুমি বলেছিলে ভুল। ও হল দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক্ ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা।

স্বাতি বলল : আজ আমার কী মনে হচ্ছে জান? আজ মনে হচ্ছে যে সেও আমি ভুল বলেছি। আঙুরও টক আছে। কিন্তু নারী তো আঙুর নয় যে খাবার প্রশ্ন উঠবে! সেও মানুষ, জীবনে তারও দাবী আছে।

একটু থেমে বলল : আমি তোমাকে রবার্ট ব্রাউনিঙের পরফিরিয়ার কথা বলেছিলাম পরম পাওয়ার মুহূর্তকে ধরে রাখবার জন্যে তার লাভার তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারত! পরফিরিয়া তার লাভারকে হত্যা করেছে ঐ একই কারণে!

আমি চমকে উঠলুম। অন্ধকার বুঝি গভীর হয় নি। কিংবা প্রখর হয়েছে চন্দ্রকিরণ। স্বাতি সেই চমকানি দেখে হেসে বলল : ভয় পেলে?

ভয় পাব কেন!

পেলেই তো!

বললুম : ও ভয় নয়, ও আমার আনন্দ! বেশি সুখেও তো মানুষ শিউরে ওঠে।

স্বাতির বুঝি এ কথা বিশ্বাস হল না। বলল : সত্যি বলছ?

হাতের উপর ভর দিয়ে হাত কয়েক পিছিয়ে এসে বললুম : সত্যি।

স্বাতিও ঠিক অমনি করে পিছিয়ে এসে বালির উপরেই শুয়ে পড়ল। হাসি যেন তার আর ধরে না। একটা বড় ঢেউ আসছিল। আমরা দেখতে পাই নি। একেবারে চোখের সামনে এসে আছড়ে ভাঙল। সর সর্ করে জল আর ফেনা এল পায়ের কাছে। খানিকটা ভিজিয়েও দিল।

হাসি সামলে স্বাতি বলল : কী দুষ্টু দেখলে তো, তোমার সঙ্গে তামাসা করে গেল।

আপত্তি জানিয়ে আমি বললুম : আমার সঙ্গে নয়, ও তোমারই সঙ্গে। তুমিই তো সাহস দেখাতে চেয়েছিলে। মেয়েদের সাহস দেখলে বোকা সমুদ্রও হাসে।

সমুদ্রকে তুমি বোকা বলছ!

বোকা নয়! রাত দিন বোকামির কথা শুনে শুনেও কি সে বোকা হয়ে যায় নি!

স্বাতি বলল : তা যাক। কিন্তু এবারে তার নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

হলে ভাল। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে।

ইতিহাসের কথা আর শুনব না।

বললুম : ইতিহাস নয়, গল্পের কথা। আবার ইতিহাসও হতে পারে। ছেলেবেলায় একটা ঐতিহাসিক গল্প পড়েছিলুম।

স্বাতি আর বাধা দিল না। বোধ হয় গল্প শুনতে তার আপত্তি ছিল না। বললুম : একদিন এই সমুদ্রের ধারে তোমারই মতো একটি মেয়ে তার সাহস দেখাতে চেয়েছিল। সমুদ্র সেদিনও হেসেছিল। কিন্তু কেঁদেছিল পরে, যখন দেখা গেল যে দেশের সব মানুষ গেল, তারই সঙ্গে এই অভিশপ্ত মন্দির।

গুর্জর-রাজকন্যা কমলাবতী। অমন সুন্দর মেয়ে নাকি ভারতে তখন আর একটিও নেই। সে কথা শুধু ভারতে নয়, ভারতের

বাহিরেও ব্যাপ্ত হয়েছে। এ দিকে গুর্জররাজ বৃদ্ধ। তাঁর পুত্র নেই। কমলাবতীকেই তিনি রাজ্যশাসনের শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো পুরুষ করতে পারেন নি। কুমার সিংহ গুর্জর রাজ্যের তরুণ সেনাপতি। তার বীরত্বের খ্যাতি দিকে দিকে ঘোষিত হয়েছে। সুলতান মামুদের দুর্মদ সেনাপতি রোস্তমের দেহেও তার অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। রাজকন্যা কমলাবতী এই বীর সেনাপতিকেই বিবাহ করবেন।

এমনি এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে সোমনাথের সন্ধ্যারতির পর কমলাবতী তাঁর প্রাসাদে ফিরছেন একাকী। পরিধানে সন্ন্যাসীর বেশ, হৃদয়ে অদম্য সাহস, কিন্তু দৃষ্টি সতর্ক। খানিকটা দূরে কাশ্মীরী হিন্দুর বেশে দুজন বিদেশীকে দেখতে পেলেন। কিছু কথোপকথনও শুনলেন। বুঝতে পারলেন যে তাঁরা হিন্দু নন। একজন সুলতান মামুদের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ জামাল, অন্যজন তাঁর সেনাপতি রোস্তম। শাহ জামাল এই সুন্দর দেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এ দেশ তিনি ধ্বংস করতে পারবেন না। সেনাপতি রোস্তম তাঁকে সুলতানের আদেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, নিষেধ করলেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে। শাহ জামাল এই মন্তব্যে অপমানিত বোধ করলেন। রোস্তমকে হত্যাই করে ফেলতেন, কিন্তু পিছন থেকে কমলাবতী শাহ জামালকে বাধা দিয়ে রোস্তমকে রক্ষা করলেন। এ একটা সংস্কারের কথা। এ দেশে মানুষ মানুষকে হত্যা করে না। রোস্তমকে রক্ষা করে কমলাবতী সেই সংস্কারকে শ্রদ্ধা দেখালেন। কিন্তু দেশের কল্যাণের চিন্তা করলেন না।

শত্রুদ্বয়কে রাজকন্যা অতিথি হবার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাঁরা অসম্মত হলেন। কমলাবতীর বুকের ভিতর এক শঙ্খ ছিল, সেই শঙ্খের শব্দে সোমনাথের সন্ন্যাসী রক্ষীদের আহ্বান করলেন ও শত্রুদের বাধ্য করলেন আতিথ্য স্বীকারে। প্রভাতে তাদের নিরাপদে নৌকায় তুলে দিলেন।

এক দিন যে শাহ জামাল এই সুন্দর দেশ রক্ষার জন্য সুলতান মামুদের আদেশ অমান্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, রাজকন্যার রূপমুগ্ধ হয়ে সেই শাহ জামালই আর এক দিন অসংখ্য সৈন্য নিয়ে গুর্জর আক্রমণ করলেন। সোমনাথের ঐশ্বর্য তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তাঁকে উন্মত্ত করেছিল কামনা। কিন্তু তাঁর উপর অভিশাপ ছিল। সুলতান মামুদের অভিশাপ। সুলতান তখন ভারত লুণ্ঠনের নেশায় করাচীর নিকট মামুদাবাদে তাঁর ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। কমলাবতীর রূপের খ্যাতি তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে আদেশ দিয়েছিলেন কমলাবতীকে আহরণ করে আনতে। তিনি তাকে বেগম করবেন।

শাহ জামাল সমস্ত গুর্জরকে শ্মশানে পরিণত করেন। কিন্তু কমলাবতীকে পান নি। সায়াহ্নের অন্ধকারে রাজকন্যা যখন মশাল হাতে কুমার সিংহের মৃতদেহ অন্বেষণ করছিলেন, শাহ জামাল এসেছিলেন তাঁকে প্রণয় নিবেদন করতে। ছদ্মবেশে সুলতান মামুদ নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন।

মশাল নিবিয়ে রাজকন্যা পালাতে পেরেছিলেন। কুমার সিংহও মারা যান নি। শত্রুশিবিরে তিনি বন্দী ছিলেন। শাহ জামালের মুখে এই সংবাদ পেয়ে রাজকন্যা তাঁকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ তো নিতান্তই গল্প। সত্যটুকু বড় করুণ। ম্লেচ্ছরা শুধু মন্দিরই ধ্বংস করে নি, সোমনাথের লিঙ্গমূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আকাশের দেবতা সোম যে মূর্তি স্থাপন করেছিলেন, সে মূর্তি আজ নেই। আজকের মন্দিরে যে মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা এসেছে বারাণসীর বাজার থেকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্বাতি এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। এইবারে গম্ভীর ভাবে বলল: গোপালদা, এই সোমনাথ কি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন না?

কেন দেবেন না! দেবতা কি শুধু পাথরের ভেতর লুকিয়ে থাকেন! দেবতা আছেন আমাদের মনে। তেমন করে ডাকতে পারলে সাড়া তাঁকে দিতেই হবে।

ছেলেমানুষের মতো স্বাতি বলল: তবে আমি সাড়া পাই নে কেন! আমি কি তেমন করে ডাকতে পারি না!

মন্দিরে তখন আরতি শুরু হয়েছে। তার শঙ্খঘন্টার ধ্বনি আসছে বাতাসে ভেসে। বললুম: চল এইবারে, মন্দিরের আরতি দেখি।

স্বাতি উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু তার আগেই পিছনে আমি পায়ের শব্দ পেলুম। তার পরেই শুনলুম মামার কণ্ঠস্বর। বললেন: তোমরা এখানে!

ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলুম। পিছনে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম। সঙ্গে মামীও আছেন। আর সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কালীঘাটের হালদার। স্বল্প আলোয় তাঁর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু নোংরা দাঁতের হাসিটি নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। সসম্ভ্রমে উঠে আমি হালদারের কাছে এলুম। ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস্ করে বললেন: এখানে বসেও শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে!

ফিস্‌ফিসানি বটে। গভীর বনে অজগরের নিশ্বাসও বুঝি এর চেয়ে মিষ্টি হয়। স্বাতি চমকে উঠল। মামা হাসলেন নিঃশব্দে, আর মামীর মুখ দেখলুম অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমি লজ্জা পেলুম।

স্বাতি কোন কথা কইল না। গম্ভীর মুখে মন্দিরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। মামা মামীও এগোলেন তারই সঙ্গে।

আগের মতো ফিস্‌ফিস্ করে হালদার বললেন: কী খাওয়াচ্ছেন বলুন।

দুরন্ত সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনে শ্রবণ আমাদের বধির হয়ে আছে। এলোমেলো বাতাস আসছে ঝড়ের মতো। কাছে একটা ঢেউ ভেঙে পড়ল। কুলকুল করে জল আর ফেনা উঠে এল পায়ের কাছ পর্যন্ত। হালদার লাফিয়ে সরে গেলেন। তাঁর কথার উত্তর আমাকে আর দিতে হল না।

খানিকটা এগিয়ে আবার আমরা গরবার গান শুনতে পেলুম। এবারে অন্য গান। কানে অন্য রকম লাগছে। কিন্তু মনে একই কথা। মন পেতে সেই পুরনো গানই শুনতে পেলুম:

তালিঙ্ঁ না তাজে গোরি
গরবে গুমি গায়রে।
পূর্ণমূর্ণি রাত উগি
পূর্ণমূর্ণি রাত।

আরতি দেখে বাড়ি ফেরার পথে মামী আমাকে ডাকলেন। বললেন: গোপাল, তুমি বাবা এই গাড়িতে এস।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো স্বাতি আগে ভাগেই এই গাড়িতে উঠেছিল। মামা গেলেন হালদারের গাড়িতে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে প্রশস্ত পথ প্রসারিত, জ্যোৎস্নালোকে মাতাল হয়ে আছে। বন্ধ গাড়ির ভিতরেও বুঝি নেশা লাগছে। কারও মুখে আজ কথা নেই।

আমার মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। রাজকোট পৌঁছবার আগে অতি প্রত্যুষে স্বাতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। গাড়ির ভিতর গভীর অন্ধকার। আমার ঘুম ভাঙিয়ে সে তার স্বপ্নের কথা বলেছিল। সমুদ্রের ধারে সোমনাথের ভাঙা মন্দির সে দেখতে পেয়েছে। তারই সঙ্গে দেখেছে আর একজনকে। আমার মতোই দেখতে, কিন্তু বয়সে অনেক বুড়ো। বলেছিল: তোমাকে অমন বুড়ো দেখলাম কেন গোপালদা?

সে কথার উত্তর আমার জানা ছিল না। তাই তাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছি। আজ অনেক দিন পরে তার স্বপ্নের মানে ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ স্বাতি বলল: সোমনাথে আমরা আবার আসব মা!

মামী 'আসব' বললেন না, বললেন: এস।

মুখে তাঁর প্রসন্নতা এখনও লেগে রয়েছে। এ তাঁর প্রসন্ন মনেরই প্রতিচ্ছবি।

স্বাতি গুনগুন করে সুর ধরল। শুধু সুর, কথা নয়। কিন্তু কথাগুলি আমার জানা:

পূর্ণমূর্ণি রাত উগি
পূর্ণমূর্ণি রাত।

॥ সৌরাষ্ট্র পর্ব সমাপ্ত ॥

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন, তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্র-পুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাঙলার ভ্রমণ-সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত-দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণ-রসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসসিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্ল্যাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা-মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ

জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াডা ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বেও তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম্ ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিচিন্নপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্ণকুলম-কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরি পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে **কর্ণাটক** রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল হায়দ্রাবাদে। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জির সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জো রায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সজলাভে সমুৎসুক,

সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে দেখল মধ্য-ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়িনী, সাঁচী ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীরে গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউস্ বোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। এক দিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাঙলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র, নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতং হৃদয়ং তব…

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভুটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

তারপর ?

অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের পর যেমন খিলপর্ব হরিবংশ, তেমনি রম্যাণি বীক্ষ্যর ঊনবিংশ পর্ব **মরুভারত**। ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপর আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। মরুভারত পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়; কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্ত এখনও দেখা হয় নি বলে, অনুযোগ আসছে। **প্রাচী পর্বে** কি অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড মণিপুর মিজোরাম ও ত্রিপুরার কথা পাওয়া যাবে ?

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক